দীপ্তি।

(বিবিধ প্রবন্ধ)

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

"What is best in literature is the affirming, prophesying, spermatic words of men-making poets Only that is poetry which cleanses and mans me"

"Itself is the dictator, the mind itself the awfull oracle All our power, all our happiness, consists in our reception of its hints, which ever become clearer and grander as they are obeyed."

R. W. Emerson.

কলিকাতা,

৩০/৫ মদনমিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ—১৩০৯।

[মূল্য ১৷০ আনা।

উৎসর্গ।

প্রিয়বর শ্রীযুক্ত ডাক্তার হরিচরণ সেন।

হরিচরণ বাবু,

আমি যেখানে যাই, দেখি, দেব-শিশুগণ, মায়ের এই অধম সন্তানকে অযাচিতভাবে কোলে তুলিয়া লইতে প্রস্তুত। কত, কত জন আদর করিয়া কথা বলেন, ভালবাসেন, আলিঙ্গন করেন। দেখিয়া, দেখিয়া আমি আত্মহারা হই,—কৃতজ্ঞতায় এই অধমের মস্তক নত হইয়া পড়ে। বাল্যকালে একটু একটু আপনাকে চিনিতাম, কিন্তু তখনকার স্মৃতি তত উজ্জ্বল নহে, তত মধুর নহে। কিন্তু বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভে দেবগৃহে আপনার যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। আপনার প্রশান্ত এবং প্রসন্ন মূর্ত্তি, পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, সেই জন্য কি ভুলিতে পারিতেছি না? আমি পাপী নরাধম, পবিত্রতার কি ধার ধারি? আপনার কর্ম্মময় জীবন পরহিতকল্পে উৎসৃষ্ট, সেই জন্য কি আপনাকে ভুলিতে পারিতেছি না? তাহা নয়; যে আপনা লইয়া সদা ব্যস্ত, সে পরার্থপরতার তত্ত্ব কি বুঝিবে? আপনি আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ বন্ধু, এই জন্য কি ভুলিতে পারিতেছি না?—তাহাও নয়; যে কোন আদর্শের গভীর তত্ত্ব রাখে না, সে কোন্ আদর্শে মজিবে? আমি সর্ব্বদাই ভাবি,—আপনি কি জন্য আমাকে এত ভালবাসেন, কি জন্য ছুটিয়া ছুটিয়া দ্বারে আসেন, কি জন্য আমার কথা শুনিতে চান্। এই এক কথা ভাবিতে ভাবিতেই আমি "আপনাময়" হইয়া আছি। কিসে আকর্ষণ, কিসে নিমজ্জন, কিসে অপাত্রে আপনার আত্মত্যাগ, আমি এই এককথা লইয়াই ভুলিয়া রহিয়াছি।

আমার মা অধিক লোককে শুনাইবার জন্য আমাকে আদেশ করেন না। তিনি বলেন, "যে শুনিতে চায়, তাহাকেই শোনা।" তিনি বলেন, "সে যদি একজনও হয়, তবুও ভাল।" তিনি বলেন, "যে শুনিয়া পরমুহূর্ত্তে তাহা

ভুলিয়া যায়, তাহাকে শোনাইয়া কাজ কি ? যে শুনিয়া তাহা হৃদয়ে গাথিয়া রাখিতে চায়, তাহাকে শোনা।" আজি সেই জন্ত এই অধম আপনার দ্বারে। ভাল ভাব নয়, ভাল কথা নয়,—ভাল রচনা নয়—তবুও আপনাকে শোনাইতে আসিয়াছি! ইহা আমার মায়ের আদেশ। আজ মায়ের আদেশ প্রতিপালিত হইল, মায়ের জিনিস মায়ের সুসন্তানকে দিয়া আমি চলিলাম। প্রার্থনা, জীবনে এবং মরণে কেবল মায়ের ইচ্ছা এই অধমের জীবনে পূর্ণ হউক।

আনন্দ-আশ্রম,
১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯। } শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

সূচীপত্র।

দীপ্তি।

আশা-শিশু—নিরাশার মন্দিরে।

আশা ধরিয়া মানুষ বাঁচে, আশা অবলম্বনে জাতি সজীব হয়, আশা-কুহকে মাতিয়া দেশ উন্নত হয়। আশা না থাকিলে মানুষ মৃত, জাতি নির্ব্বাণ, দেশ ভস্মীভূত। বাঙ্গালীর, ভারতীয় জাতির, বা ভারতের কি আশা আছে যে, তাহাকে জীবন্ত বা উন্নত বলিব?

ব্যক্তিগত জীবনে দেখিয়াছি, বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত হৃদয়ে কত আশা-শিশু জন্মিয়াছিল, কিন্তু দু দশদিন পরেই তাহা ঢলিয়া পড়িয়াছে, সফল হয় নাই। যত্ন করি, চেষ্টা করি, আশা কিছুতেই বাঁচে না। সকল উদ্যম পন্ডাস্ত, সকল সাধ অপূর্ণ।—আশা-শিশু এ জীবন-সরসিতে মাথা তুলিল কই? মায়ার ঘোরে ডুবিয়া, অজপা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, অশেষ সুখ-বিলাসে মাতিয়া তুমি ভাই বড মানুষী চালে চলিয়া, গাড়ী ঘোড়া হাকাইয়া কতই আশা-স্বপ্ন দেখিয়া চমকিত হইতেছে, ভাবিতেছ, কি যেন পাইলে আর কি! কিন্তু আমি ঐ সকলের মধ্যে কেবল মরীচিকাই দেখিতেছি। চতুর্দ্দিকে মহা মরুভূমি, অজানিত, অকথিত, অব্যক্ত; পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ পথিক হাহাকার করিতেছে, প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, আশা-মরীচিকা দেখিয়া যতই ছুটিতেছে, ততই বঞ্চিত হইতেছে। জল মিলিল না, তৃষ্ণা মিটিল না, পথিকের জীবন যায় যায় হইয়াছে। আমি সংসার-মরুতে দগ্ধ পথিক, কই জল পাইলাম, কেবল পুড়িলামই, কই আশা মিটিল? কেবল ছুটিলামই, কেবল খাটিলামই, কই জল মিলিল? বাল্যকাল হইতে কর্ম্মকাণ্ড ধরিয়া ছুটিতেছি, কই ভাই শান্তিবারি মিলিল বলত? বাল্যকাল হইতে আশা করিতেছি, নিঃস্বার্থ প্রেম নামক যে একটা জিনিস আছে শুনিয়াছি, তাহা ধরিয়া এ জাতি বিশ্ব-প্রেম-ধামে পৌছিবে,—এক কথায় বাঙ্গালী মানুষ হইবে। যত লেখা, যত চর্চ্চা, যত কথা—সব ইহারই জন্য। যত বয়স বাড়িতেছে, ততই প্রত্যক্ষ করিতেছি, নিঃস্বার্থ কথাটা অলীক স্বপ্নবৎ উপেক্ষিত

হইতেছে প্রায় সর্ব্বত্র ; সকলেই, না হয়, অনেকেই, বৃথা মায়ায় মজিয়া, যাহা লক্ষ্য নয়, যাহা কর্ত্তব্য নয়, তাহা ধরিয়াই মহা তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে ; —দিবারাত্রি শুনিতেছি, কেবল স্বার্থ, স্বার্থ, কেবল স্বার্থ। ভালবাসা মিথ্যা, স্ত্রী-পুত্র মিথ্যা, পিতামাতা মিথ্যা, আত্মীয় পরিজন মিথ্যা, দেশ মিথ্যা, জাতি মিথ্যা, সত্য কেবল স্বার্থ,—অমিশ্রিত, অনাবিল, স্ব এবং অর্থ। আপনার নাম, আপনার কাম, আপনার বিদ্যা, আপনার বুদ্ধি, আপনার ঐশ্বর্য্য, আপনার সম্পদ, যা কিছু সবই কেবল আপনার জন্য! একান্নবর্ত্তী পরিবার-সংরক্ষণ, এক জাতীয়ত্ব-গঠন, ধর্ম্ম-সংস্থাপন এবং ভাষা-সংস্করণ,—এ সকলই বাতুলের প্রলাপ! বড় হইতে চাও, ঐ সকল কথা ভুলিয়া কেবল "আপন," কেবল "অহং" কেবল "স্ব" লইয়া ডুবিয়া থাক। আপন যশ, আপন প্রশংসা, আপন গুণ-কথন, আপন গুণ-শ্রবণ, আপন কথা প্রচার, দিবারাত্রি সেই সকল লইয়া মাতিয়া থাক, "পরার্থ" কথাটা অভিধান হইতে তুলিয়া দিয়া, কেবল "স্বার্থ" কথার জয় ঘোষণায় ব্যাপৃত রহ! বড় কঠিন সমস্যায় পড়িয়াছি। আমার আশা-শিশু এই নিরাশার মরুভূমিতে প্রেম-জল বিনা, এত দিন পর, শুষ্ক হইতে চলিয়াছে। এতদিন যে আশা-শিশু ধরিয়া বাঁচিয়াছিলাম, সে আশা-শিশু মরিলে আর বাঁচিয়া কাজ কি? বৃথা লেখা-লেখী, বৃথা বকাবকী, বৃথা জল্পনা, বৃথা কল্পনা করিয়া লাভ কি? মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়াই কি তবে শ্রেয়? ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে যে কথা, প্রতি জাতি সম্বন্ধেই সেই কথা, প্রতি দেশ সম্বন্ধেই সেই কথা। ব্যক্তিত্বটুকু বাদ দিলে, কথাটা এই দাঁড়ায়, বাঙ্গালীর, ভারতবাসীর এবং এই ভারতের কি আশা আছে যে, তাহা লইয়া জীবন ধারণ করিবে? মৃত্যু শ্রেয় নয় কি? অথবা মরণের গাঢ় অন্ধকারে সকল নিমগ্ন নয় কি? হায়, প্রকৃত জীবনের পরিচয় কোথায় পাওয়া যায়।

পশুপক্ষীরা নিজ নিজ লইয়া দিবানিশি কেবল ব্যস্ত। মানুষও যদি কেবল তাহাই করিবে, তবে মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যার এত গরিমা কেন? মানুষ তবে পশুর দলে মিলিয়া স্বেচ্ছা-বিহার, স্বেচ্ছাগতিবিধি করিয়া স্ব-সুখ-সাধনে ব্যস্ত থাকুক। এতকাল পরে পশুর ধর্ম্ম যদি শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বিবেচিত হইয়া থাকে, তবে আর কেন? স্বাধীনতার বিজয় নিশান গগনে তুলিয়া, নির্ভয়ে স্বেচ্ছাচারিতার ভুবন বিজয়ী সঙ্গীতে তান ধরিয়া দেও, সকল আন্দোলন নির্ব্বাণ হউক, বল, পশুপক্ষীই জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। জন্ম মরণই পশু-

পক্ষীর জীবনের লক্ষ্য, আমরণ নিজসুখ অন্বেষণই উদ্দেশ্য, যতটুকু বুঝি আর শ্রেষ্ঠগুণ ত বড় দেখিতে পাই না। সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন বিবর্ত্তন-বাদীই পশুপক্ষী সমাজের উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। চিরকাল তাহারা একই ভাবে আছে, নড়ে চড়ে, খায় শোয়, কয়েক বৎসর পর মরিয়া যায়। মানুষের অত্যাচারে কোন কোন জন্তু আরো অব-নতির রাজ্যে যাইতেছে, কিন্তু উন্নতি কোথাও দেখি নাই। কিম্বা উন্নতির কথা ত কোন পুস্তকেও পড়ি নাই। গো, মহিষ, ছাগল, কুকুর, হরিণ, ব্যাঘ্র হইতে শ্রেষ্ঠতর জীবের অভ্যুত্থানের কথা পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডারবিন-প্রমুখ ব্যক্তিগণও বলিতে পারেন নাই। ইহারা আদিতে যেমন ছিল, আজও তেম-নই আছে, চিরদিনই একই রূপ খায়, একই রূপ বেড়ায়, একই রূপ থাকে। বৈচিত্র্য নাই, রূপান্তর নাই, আদিতে যেমন, আজও তেমনি। আহার, নিদ্রা, রিপু সেবা, ইহাই জীবনের লক্ষ্য এবং জীবনের পরিণতি। কোন আশা নাই, কোন উন্নতির পিপাসা নাই। মানুষ যদি আশা-বঞ্চিত, উন্নতির কামনা-রহিত, পরভাবনা-বর্জ্জিত, স্বার্থপরিচালিত হয়, তবে পশুতে আর মানুষে পার্থক্য কোথায়? কোনই পার্থক্য নাই।

বাঙ্গালী জাতির, কেবল বাঙ্গালী কেন, সমস্ত ভারতীয় জাতির মনের উপর দিয়া এমন একটা বিষাদ-কালিমা রেখা অঙ্কিত হইতেছে যে, দিনদিন সকলে সকল উদ্যম, সকল আশাভরসা-হীন হইয়া পড়িতেছে। দাঁড়াইয়া নীরবে অপ-মান বা প্রহার সহ্য করিতে ভারতবাসীর মত এমন আর কেহই পারে না। স্ফূর্ত্তি নাই, উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, চেষ্টা নাই, যেন কলের পুতুল আর কি! কোন একজন বিদেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালী এমন এক-জাতি, যাহারা শুইতে পাইলে বসে না, বসিতে পারিলে দাঁড়ায় না, দাঁড়াইতে পাইলে হাটে না এবং হাটিতে পাইলে দৌড়ায় না।" বাস্তবিক, ভারতের সমস্ত জাতি সমূহই যেন দিনদিন এই কথার জীবন্ত সাক্ষী রূপে দেদীপ্যমান হইতেছে। পরাধীনতার তীব্র আঘাতে, দারিদ্র্যের ঘোর পীড়নে, ম্যালে-রিয়ার দারুণ আক্রমণে এবং চরিত্রহীনতার অসহ্য দংশনে জাতি সাধারণের শরীরের তেজ নাই, মনের স্ফূর্ত্তি নাই;—মনুষ্যের যাহা থাকা প্রয়োজনীয়, তাহা যেন কিছুই নাই। ইংরাজ, ভারতের তেজ ও বীর্য্যে, শক্তি ও সামর্থ্যে, চিরদিনের জন্য, এমন তরল অহিফেন ঢালিয়া দিয়াছে যে, সমস্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল, নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। ইচ্ছা মাত্র ইংরাজ আয়র্লণ্ডের রাজাকে

পথের ভিখারী সাজাইতেছেন, ইচ্ছামাত্র গলায় ফাঁসি দিয়া তেকেন্দ্রজিৎকে অমরধামে প্রেরণ করিতেছেন, ইচ্ছামাত্র, বড় বড় মহামহোপাধ্যায়দিগকে অসৎকাজের সং সাজাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া তামাসা দেখিতেছেন, তুরী ভেরী বাজাইয়া বড় বড় হিতৈষীদিগকে খেতাবের মোহিনী মায়ায়,সাপুড়িয়ার বংশী-মুগ্ধ সর্পের ন্যায় বশ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। আর তোমাকে, আমাকে, তাহাকে,নিত্য ইংরাজ অপমান নির্যাতনের উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া বিকট হাস্ত হাসিতেছেন। তুমি জাতীয় মহাসমিতির ক্ষণিক উৎসাহে ভুলিতেছ,ভাই,দেখিতেছ না কি দিন দিন এজাতি কেমন মৃতবৎ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে? পরনিন্দা শিক্ষিতদিগের দিন দিন কণ্ঠের ভূষণ হইতেছে, পরশ্রী-কাতরতা দিন দিন শিক্ষিতদিগের অঙ্গাভরণ হইতেছে। হিংসা বিদ্বেষ, যাহা নীচ জন-যোগ্য, তাহা এখন ষোল আনা শিক্ষিতদিগের হৃদয়ে রাজ্যাধিকার বিস্তার করিতেছে; সহানুভূতি,সমবেদনা,পরদুঃখকাতরতা,সব গঙ্গায় ভাসিয়া গিয়াছে। তুমি ভাই, কি অর্থে বল যে,এজাতির উন্নতি-সূর্য্য অদূরে? বাঙ্গালীর,ভারতবাসীর আছে কি? কেবল চিৎকার, কেবল বক্তৃতা, কেবল কাগজে কালীর আঁচড় কাটা, আর কি? জীবন থাকিলে এত অত্যাচার, এত অবিচার, এত দুর্নীতি, এত ব্যভিচার, এ সোণার ভারতে ধর্ম্মের নামে, রাজনীতির নামে বিকাইত না। বৃথা ভাই আশা-মরীচিকার স্বপ্ন দেখিতেছ, আজ এ ভারত আশা-হারা, তেজ-হারা, বীর্য্য-হারা, সম্মান-হারা, সর্ব্বস্ব-হারা। এ ভারত আজ ঘোর স্বার্থ-পরতায় নিমগ্ন।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলনীতি, যে দিন হইতে সেই ধর্ম্মের দুর্জ্জয় প্রভাব মন্দীভূত হইয়াছে, যে দিন হইতে ব্যাস বাল্মীকির ধর্ম্মাদর্শময় উজ্জ্বল সাহিত্যের স্থলে স্বেচ্ছা-প্রেম-লীলাময় নাটকাদির আদর বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে দিন হইতে শ্রীচৈতন্তের প্রেম ভক্তির নামে ব্যভিচারের কদর্য্য লীলা-স্রোতে দেশ ভাসিতেছে, সেই দিন বুঝিয়াছি, এ দেশের আর আশা ভরসা নাই। যে দিন ষোড়শবর্ষীয় বালক সিরাজকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া, খাল কাটিয়া ইংরাজ-লোনা-জল আনয়ন করার জন্ত কৃতঘ্নদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা-সভা বসিয়াছিল, সেই দিন এদেশের আশা-সূর্য্য ডুবিয়াছে? এখন আছে, দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া কেবল নিরাশা, নিরানন্দ, নিরুদ্যম, স্ফূর্ত্তিহীন পরাধীনতা, আত্মমর্য্যাদা-হীন তোষামোদ, আর স্বার্থ-চালিত দাসদিগের বিকট চিৎকার। নিন্দা পরে করিও, ভাই, একবার ভাবিয়া দেখ, কথাটা সত্য কি না?

জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রথম কথা প্রেম, মধ্য কথা পবিত্রতা, শেষ কথা দয়া। কেবল প্রেম, কেবল পবিত্রতা, কেবল দয়া। মহাত্মা বুদ্ধ বলেন, তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র কেবল এই কয়টী কথায় "Love" নিবদ্ধ। তিনি বলেন, প্রেমে অসাধ্য সাধিত হয়। আমরা দেখিতেছি, বাস্তবিকই প্রেমের দুর্জ্জয় তেজে দুর্ব্বল, অসহায়, ক্ষীণ বুথ অসাধ্য সাধন করিয়া জগৎকে মোহিত এবং স্তম্ভিত করিতেছেন। সহস্র সহস্র প্রতিনিধি জাতীয় মহাসমিতিতে একত্রিত হইয়া যাহা করিতে পারিতেছেন না, একা বুথ অঙ্গুলীনির্দ্দেশে তাহা সাধন করিতেছেন। কথা—কেবল প্রেম, শাস্ত্র কেবল প্রেম, অস্ত্র কেবল প্রেম!, আমরা মিলিতে চাই, এই প্রেমটাকে দূরে ফেলিয়া দিয়া। গঙ্গায় প্রেম-মণি ভাসাইয়া, মন্ত্রণা-সভা বসাইয়া, আমরা ভারত উদ্ধার করিতে চাই !! সিরাজের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, সিরাজকে মারিবার জন্তই মন্ত্রণা-সভা বসাইতে এদেশের লোকেরা চায়। পিতৃ-মাতৃ বিচ্ছেদ ঘরে ঘরে, ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ঘরে ঘরে, একান্নবর্ত্তী-পরিবার-প্রথা, পাশ্চাত্য পরিশ্রম-সমতা-সাধনের শিক্ষা-কুহকে ভাঙ্গিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, ঘোরতর দারিদ্র্য ভারতের গ্রাম, দেশ, রাজ্য সমূহকে গ্রাস করিতেছে, আর আমরা নিজ সুখ লইয়া, নিজ গৌরবে স্ফীত হইয়া, গাড়ী চড়িয়া, হ্যাট-কোট পরিয়া, রাশি রাশি অর্থ ঢালিয়া, মন্ত্রণা-সভা করিতেছি। ধিক, ধিক, শতধিক! দশ বৎসরে যে সভা একটা কাজ হাতে লইতে পারিল না, সে জাতীয় সভার আবার নাম কর? ধিক, ধিক, শতধিক॥ ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যার মীমাংসা আজও হয় নাই, আজও নিরন্নদিগের টেক্সের ভয় যায় নাই, আজও জমীদারের অত্যাচার কমে নাই, আজও দরিদ্রের ঘরের সুন্দরী স্ত্রী-কন্যা ধনীর অত্যাচারের অতীত হয় নাই, বলিব কি, বরং দিন দিন আরো অত্যাচার বাড়িতেছে, টাকার বলে দরিদ্রদিগের নির্ব্বাসন কথাও ঢাকা পড়িতেছে। সমবেদনা কোথায়? কোন্ মুখে নির্লজ্জের ন্যায় বল, জাতীয় মহা সভা দেশের আশার স্বপ্ন জাগাইতেছে? অশিক্ষার ঘোরান্ধকারে ভারত নিমজ্জিত, অধীনতার তীব্র অত্যাচারে নিষ্পেষিত, দেখ দেখ, চাহিয়া দেখ, চক্ষু থাকে ত চাহিয়া দেখ,বৃথা চীৎকার ভিন্ন, সতী নারীকে উদ্ধার করিতে, বিপন্ন নির্ব্বাসিত রাজার সহায় হইতে, অত্যাচারিত ও নির্ব্বাসিত মূক প্রজাকে রক্ষা করিতে এদেশে কোন-হিতৈষণা নাই!! হিতৈষণা জিনিসটা লাটসভায় বসিবার এবং রায় বাহাদুর খেতাব প্রাপ্তির পূর্ব্বের আয়োজন মাত্র।

না খাটিয়া,না জীবন দিয়া,না পরের জন্ত ভাবিয়া,না পরের জন্ত সর্ব্বস্ব ঢালিয়া, আর কোন দেশে হিতৈষী নাম বিকায় নাই! আবেদন করার পরামর্শ দিবার জন্ত, আবেদনের আয়োজনের জন্ত বা ভিক্ষাবৃত্তি শিকার জন্ত কোন সভার প্রয়োজন আছে কি না, তুমি জান, এজগতের কোন বিখ্যাত হিতৈষী জানিলে না। রবার্ট এমেট জানিতেন না, পার্কার জানিতেন না, ম্যাট্‌সিনি জানিতেন না, গ্যারিবল্ডি জানিতেন না। প্রেম কই, ভালবাসা কই, স্বার্থত্যাগ কই, জীবন ত্যাগ কই? বৃথা হুজুক, বৃথা আয়োজন, বৃথা আশা-মরীচিকা॥

আমি চাই একটু সুশীতল প্রেম-বারি। ভারত, মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, ভারত চায় একটু সুশীতল প্রেম-বারি। বক্তৃতাময় যুদ্ধ নয়, ভাবময় লেখালেখি নয়, ভারতের জাতিসমূহ চায় একটু সহানুভূতি মাত্র। কাট কাট, মার মার করিয়া এ জাতির কখনও উদ্ধার হইবে না;—নরশোণিত-ধারা-প্লাবনে এদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবে না। সকল অসাধ্য সাধিত হইবে, কেবল প্রেমে। ফরাশী-বিপ্লব কি প্রেম-মন্ত্রে ফ্রান্সকে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছে? আজও সেখানে নব-বিপ্লবের সম্ভাবনা আছে—স্বাধীনতার প্রশান্ত ধ্বজার নিম্নেই পরাধীনতার বিষময় কাল-ভুজঙ্গ লুক্কায়িত আছে। প্রকৃত স্বাধীনতা মনে,—বাহিরে নহে। বাহিরের স্বাধীনতা, পরাধীনতার বিকৃত খোলস মাত্র। প্রকৃত স্বাধীনতা, স্বার্থ-ত্যাগে, জিতেন্দ্রিয়তায়, রিপু-সংগ্রাম-জয়ে, অজেয় আত্ম-মর্য্যাদা ও জাতীয়ত্ব-বোধে। প্রকৃত স্বাধীনতা, দয়া, প্রেম ও পুণ্যসঞ্চয়ে। বাহিরের স্বাধীনতা, দেশকে, সমাজকে, কেবল শ্রীহীন এবং উচ্ছৃঙ্খল করে। তাহা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। যাহাতে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, বংশের শ্রীবৃদ্ধি, তাহাই বাঞ্ছনীয়। তাহা কেবল প্রেমপুণ্যে অর্জ্জন করা যায়। সকল ভাই এক মায়ের সন্তান, সকল ভাই এক মাতৃ-ক্রোড়ে লালিত পালিত, অথচ থাকে দূরে দূরে, আরো দূরে, আরো দূরে! ছি, এমন করিয়া কি একতা হয়? এমন করিয়া কি মহাবল লাভ করা যায়? দাঁড়াও ভাই, আমার পার্শ্বে ভাই হইয়া একবার দাঁড়াও, আমি, তুমি, সে—সকলে মিলিয়া যাই, সকলের স্বার্থ ভুলিয়া একাত্মক হই, তোমাকে আমি তুলি, তুমি আমাকে তোল,—মহাবলে সকলে বলীয়ান হই। তবে ত হইবে। দূর দূর দূর—অপ্রেম, অপ্রেম, অপ্রেম—স্ব, স্ব, স্ব—হায়, এরূপ করিয়া একতার ঘর বাঁধা যায় না। ভাঙ্গিল, আর যোড়া লাগিল না! লাগিল কই? মিলন কই? কংগ্রেস কোথায়? অপ্রেম-আগুনে ঘর

বাড়ী সব পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, দুর্ভিক্ষে নরনারী মরিয়া দেশ শূন্য করে, তর্পণ করিবেন, বৎসরান্তে কংগ্রেস।—অথবা মৌখিকপ্রেম, অথবা, গলাবাজি, অথবা উপাধির কুহক! হায়রে মহামেলার অপার আশা-ছাউনি!!

অশ্রুতে সিক্ত হইয়া মহাত্মা বিদ্যাসাগর বলিতেন, "এদেশের নিম্নশ্রেণীর গতি ফিরিবে না, এদেশের আর আশা নাই।" বলিতেন, "যে দেশে মাতৃজাতির হতাদর, সে দেশের মঙ্গল নাই। যে দেশে পুরুষে রমণী বধ করিয়া সুখ পায়, সে দেশের মঙ্গল নাই।" এ সকল কথা জীবন্ত সত্য। পরের জন্য কাঁদিয়া, পরের জন্য ভাবিয়া, পরের জন্য সর্ব্বস্ব ঢালিয়া বিদ্যাসাগর চলিয়া গেলেন, তাঁহার বংশধর, তাঁহার প্রত্যক্ষ-মূর্ত্তি, আজ ধনীর আসনে উপবিষ্ট, পিতৃ কীর্ত্তি ডুবাইয়া, ভৃত্যের তৈলসেবায় পুলকিত। কি দেখিয়া বলিব যে, এদেশের মঙ্গল-আশা আছে? আর যাঁহারা এদেশের হিতৈষী, তাঁহারা নিজের গাড়ী সানন্দে মনুষ্য-ঘোড়ার দ্বারা চালিত হইতে দিয়া ধন্য এবং কৃতার্থ হইতেছেন!! যে শোক ক্রন্দনে পরিণত, তাহা গভীর নহে, যে আনন্দ বাহ্য-উৎসবে পর্য্যবসিত, তাহা কদাচ বিমল আনন্দ নহে। দেখিয়াছি, এক সময়ে যাহারা মনের আবেগে সানন্দে হিতৈষীর গাড়ী টানে, অন্য সময়ে তাহারাই গলাধাক্কা দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করে। উহাতে আত্মহারা হইয়া হিতৈষী নামে যাঁহারা কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা যতদিন এদেশে হইবে, ততদিন নিশ্চয় বলিতে পারি, এদেশের কোন আশা নাই। যাঁহারা দান-খাতায় টাকা লিখিয়া তাহা প্রদান করাকে অধর্ম্ম মনে করেন,—খাটাইয়া ভৃত্যের বেতন দেওয়া যাঁহারা অধর্ম্ম মনে করেন, বিদ্যাসাগর বলিতেন, যাঁহারা পিতা মাতার পরিচর্য্যাকেও অধর্ম্ম, অসভ্যতা বা অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, মনে করেন, তাঁহারা যে দেশের হিতৈষী, যে দেশের নেতা, হায় হায়, সে দেশের আশা কোথায়? তুমি ভাই অপূর্ব্ব যুগল মূর্ত্তি দেখিয়া ভুলিতে পার, আমি দেখিতেছি, সকলই আশা-মরীচিকা! বিদ্যাসাগরের ন্যায় প্যুণ্যশ্লোক ক্ষণজন্মা লোকের সম্মান-কীর্ত্তি যে দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল না, সে দেশের সকলই আশা-মরীচিকা।

সত্য কথা বলিলে নির্য্যাতন কর, সহিব, জেলে পাঠাও যাইব, হত্যা কর, রক্ত ঢালিয়া দিব। তোমার ভয়ে আমি সত্য চাপা দিতে পারিব না। এমন করিয়া কখনও এদেশ উদ্ধার হইবে না। স্বার্থ নামক পদার্থটাকে বিসর্জ্জন দিতে এবং প্রেম-পুণ্যে ভূষিত হইতেই হইবে; আমি না পারি,

সরিয়া দাঁড়াই, তুমি না পার অম্লান চিত্তে সাধু মহাজনদিগের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া সরিয়া দাঁড়াও। পুণ্যবান মহাত্মাদিগের অভ্যুত্থানের আশা-পলিতা ধরিয়া এস, নয় ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকি; তবুও যেন মনুষ্যত্বের নামে কলঙ্ক না আনয়ন করি। যদি তুমি আর আমি কাহাকেও ভালবাসিতে না পারিলাম, কেবল প্রেমের নামে কলঙ্কই আনিলাম, তবে এস ভাই, আর অপেক্ষা না করিয়া, মৃত্যুর পথ দিয়া চলিয়া দেশকে ও সমাজকে পবিত্র করি। পুণ্যময় দেশ পুণ্যময়ই থাকুক, আমাদের ন্যায় অধার্ম্মিকদিগের দ্বারা যেন কখনও তাহা কলঙ্কিত না হয়। আমাদের নাম ডুবুক, কার্য্য ডুবুক, সব ডুবুক, কিছুই যেন না থাকে। আমাদের কথা ডুবুক, বক্তৃতা ডুবুক—সব ডুবুক। স্বার্থ যখন বলি দিতে পারি নাই, প্রেম-সাধনে যখন অসিদ্ধ, তখন আর কাজ কি ভাই? এস তুমি আর আমি, সকল হুজুগ ছাড়িয়া মৃত্যুর পথ দিয়া চলিয়া যাই। যাহা হওয়ার ঢের হইয়াছে—কলঙ্কের উপর কলঙ্ক, অধর্ম্মের উপর অধর্ম্ম, পাপের উপর পাপ; বোঝা যারপরনাই গুরুতর হইয়াছে। আশা ভরসা নাই যখন, তখন আর কেন, এস, চলিয়া যাই। এস, পলায়ন করি। এস, নিবিয়া যাই।

দেশের আশা কোথায়? বলিয়াছি আশা, প্রেম, পবিত্রতা ও দয়ায়। আশা,—জাতীয় ধর্ম্ম এবং জাতীয় ভাষায়। এ সকল ছাড়িয়া, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই দাঁড়াইয়া, কেহই, এই ঘোর নাস্তিকতা ও অবিশ্বাস-বাদ প্রচারের দিনে, চরিত্র ও ধর্ম্মজীবনের পার্থক্য-সংস্থাপনের দিনে, অথবা ভিতর-বাহিরের একীকরণ-বিনাশের যুগে, অথবা চরিত্রহীন, বিশ্বাসহীন পুনরুত্থানের দিনে আশা করিতে পারেন না যে, এই ভারতে আবার জাতীয় ধর্ম্ম নামে একতার একটা সাধারণ ভূমি সৃজিত হইবে। আশা করিবার কিছু নাই, যদি কখনও হয়, তবে তাহা বিধাতার বিশেষ কৃপা মনে করিব। ধর্ম্মের অবস্থা ভারতে এখন কেমন, সকলেই জানেন। জৈনদিগের নিকট বুদ্ধদেবের নাম কর, কাণে অঙ্গুলি দিয়া বলিবে, "বাবু, এমন কথা মুখে আনিবেন না।" যেন কি ভয়ানক অপরাধের কথা! কবিরপন্থীদিগের নিকট নানকপন্থী-দিগের নাম কর, তাহারা চটিয়া লাল হইবে! শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদ চির-প্রসিদ্ধ কথা। খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দুর বিবাদ চির-পরিজ্ঞাত! এখন নব্যদলের মধ্যে বাকী রহিলেন, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী দল। তাঁহাদের ভিতরের গৃহ-বিবাদ, বিশ্বাসহীনতা ও চরিত্র-হীনতার কথা মনে হইলে, অথবা

চাকচিক্যময় বিলাসিতা, রিপু-পরায়ণতা বা সাংসারিকতার কথা ভাবিলে, পরোপকার ও স্বার্থনাশের প্রতি অবহেলা ও ভ্রূ-কুঞ্চনের কথা স্মরণ হইলে, আশা হয় না, বিশ্বাস হয় না যে, এই ধর্ম্মসমাজ বিধাতার পবিত্র নামকে দীর্ঘকাল পবিত্র রাখিয়া, সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা পূর্ব্বক প্রেম, পবিত্রতা ও দয়ারূপ সম্মিলনের পবিত্র সূত্রে ভারতীয় অসংখ্য জাতি-সমূহকে বাঁধিতে পারিবে। বোধ হয় যেন, এ সমাজ দিন দিন কিছু আদর্শ-হীন হইতেছে। বোধ হয় যেন, এ সমাজ দিন দিন কিছু কিছু ধর্ম্মহীনও হইতেছে। পবিত্রতার আদর্শ খর্ব্ব হইলে, প্রেমের আদর্শ বিসর্জ্জিত হইলে, চরিত্রের আদর্শ ডুবিলে, কেবল ধর্ম্মের খোলস লইয়া কেহ বৈকুণ্ঠ, স্বর্গ বা মুক্তিধামে পৌঁছিতে পারে না। চরিত্র-হীনতা ও রিপু-পরতন্ত্রতার পথ দিয়া, স্বার্থপরতা, বিলাসিতার পথ দিয়া, ব্রাহ্মসমাজ যেন ক্রমে ক্রমে প্রেম-হীন রাজ্যে উপনীত হইতেছে। প্রেম, পুণ্য ও দয়া সাধন এখন কথায় ও বক্তৃতায়। দিন দিন এ সকল সংগুণ কথার কথা হইয়া উঠিতেছে। প্রচা-রকদিগের মৌখিক প্রেমের কথায় বিশ্বাস করিয়া তুমি একথা বলিতে না চাও, না বলিও, আমি কিন্তু আশার কোন চিহ্ন দেখি না। শ্রাদ্ধের গামছা বা ভোজনদক্ষিণার সিকি দুয়ানি পর্য্যন্ত প্রচারকগণ নামিয়াছেন, বলিতেছি না। তবে এ কথা ঠিক যে, তাঁহারা নীতি ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ঠিক রাখিয়া, পবিত্রতার উচ্চ আদর্শ ধরিয়া, ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষের আদর্শ ঠিক রাখিয়া চলিতে পারিতেছেন, মনে করিতে পারি না। দুপয়সা, দশ পয়সার মায়ায় না হউক, পাঁচশত বা দশ সহস্রওয়ালা লোকের মমতায় তাঁহারা প্রেমপুণ্যের কেনা বেচা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এ কথা বলিতে পারি। এহেন লোকদিগের দ্বারা ভারতে একতা সাধিত হইবে, ভাই, তুমি আশা করিতেছ? করিয়া বাঁচিয়া থাক, আমি কিন্তু ভাই আশা-মরীচিকায় পুড়িয়া মরিতেছি। ছাই, ছাই, চতুর্দ্দিকে সকল আশায় কেবলই ছাই !!

আর আশা কোথায়? রাজনীতির সুবৃহৎ ক্ষেত্র গেল, ধর্ম্মের প্রাঙ্গণ গেল, বাকী রহিল কি? নিরাশা-মন্দিরের একটুকু ক্ষুদ্র, একবিন্দু পরিমাণ স্থানে এখন আশাশিশু খেলা করিতেছে,—একটু একটু শ্বাস টানিতেছে। এখন এই ক্ষীণ শ্বাসটুকু গেলেই প্রাণটা যায়, দেশটাও রক্ষা পায়। সে স্থানটুকু—জাতীয় ভাষা। জাতীয় ভাষা একটা হওয়া চাই—নিশ্চয়ই চাই, নচেৎ জাতির উদ্ধার নাই। কিন্তু আশা-শিশু এখানেই বা বাঁচে কই? ছোট

গাছটীকে বাঁচাইতেছিলেন যে সকল মহারথীগণ, আজ তাঁহারা কোথায়? কোথায় রামমোহন, কোথায় বিদ্যাসাগর, কোথায় অক্ষয়কুমার, কোথায় মাইকেল, কোথায় কেশবচন্দ্র, কোথায় প্যারিচাঁদ, কোথায় বিহারীলাল, কোথায় দীনবন্ধু, কোথায় রাজকৃষ্ণ, এবং আজ কোথায় বাঙ্গালা ভাষার রাজাধিরাজ বঙ্কিমচন্দ্র। এই আশা-শিশু বড় হইতে না হইতে আজ তাঁহারা কোথায়? হায় হায় হায়, প্রাণ ফাটিয়া যায়, আজ সুকুমার সাহিত্য শিশু পরনিন্দায়, পর-হেলায়, বিদ্বেষ ও ঘৃণার উষ্ণ নিঃশ্বাসে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, কে রাখে, কে দেখে, কে বাঁচায়? সোণার বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসনে কে বসিবে, সে চিন্তায় সকলে আত্মহারা, কেহ বঙ্কিমের ভাষার দোষ কীর্ত্তনে ও কেহ কালীপ্রসন্নের গুণকীর্ত্তনে ব্যস্ত, কেহ নবীনচন্দ্রের স্ফুট প্রতিভার মহিমা কীর্ত্তনে ও মাইকেলের প্রতিভার খর্ব্বীকরণে ব্যস্ত—কেহবা সকলের নিন্দা ঘোষণা করিয়া আপনি বড় সাহিত্যিক-ধুরন্ধর বলিয়া সর্ব্বত্র মহিমান্বিত হইবার জন্য লালায়িত!! হায়রে হিংসাবিদ্বেষ-কীট, তুই কোন্ প্রাণে এই সুকুমার আশা-শিশুর নব মুকুলিত অঙ্কুর বিনাশে লালায়িত? হায় হায় হায়, শেষ আশা ঢলিয়া পড়িলে এদেশ, এজাতি বাঁচিবে কেমনে? সাহিত্যের আদর্শ আজ কাল বড়ই পরিম্লান হইতেছে। পরনিন্দা, পরচর্চ্চায় সাহিত্য পরিপূর্ণ, কবি এখন অনুকরণের বাজারে বা অপহরণের বাজারে মৌলিকতার বিনিময়ে বাহ্য-চটক-ময় প্রাণহীন শিল্প-সৌন্দর্য্য খুজিতেছেন, প্রবন্ধ-লেখক এখন ঐ বাজারে বিজ্ঞতা ক্রয়ের ফিকিরে ঘুরিতেছেন, অথবা টাকার বাজারে এপ্রেন্টিসের চেষ্টায় আছেন, সমালোচক খোষামুদী বা নিন্দার বিষ উদ্গীরণের চেষ্টায় আছেন, ইতিহাস লেখক এখন খোষামুদীর তৈল পাত্র হাতে লইয়া, স্কুলের বালকদিগের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছেন। সাহিত্যের জন্য সাহিত্য-সেবা, মৌলিক সাহিত্যের সেবা করিতেছেন—অতি অল্প লোক!! ঋণ করিয়াও, নিন্দা-ভাজন হইয়াও আদর্শ সাহিত্যের সেবা করিতে হইবে, এদেশের ভাবী উন্নতির বীজ ইহারই মধ্যে নিহিত—না করিলে চলে না, এরূপ ভাব সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ না হইলেও, এরূপ ভাবেই বা সাহিত্যের চর্চ্চা করে কয় জন? সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ—সৌন্দর্য্য-পিপাসা ও ধর্ম্ম-নীতি-পিপাসা চরিতার্থ করা। সে আদর্শ আজ কাল বড় একটা দেখি না। সাহিত্যেও ব্যবসাদারী ঢুকিয়াছে! সাহিত্যে বিজ্ঞাপন কুহক প্রবেশ করিয়াছে। সাহিত্যিকগণও আজ প্রশংসা ও সম্মা-

নের কাঙ্গাল। তাঁহারা দেশ চালাইবেন কি, বিবিধ প্রকারে দেশ আজ তাঁহাদিগকে চালাইতেছে। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় যে, মানুষ পুস্তক লিখিয়া আবার প্রশংসার জন্ত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়? কেন বাপু, যদি তোমার এতই দুর্দ্দশা হইয়া থাকে, যদি তুমি এতই গৌরবের কাঙ্গাল হইয়া থাক, স্কুল-পাঠ্য পুস্তক লেখ, ক্ষমতা না থাকে, দশ জনের পুস্তক হইতে দশটা গল্প তুলিয়া কীর্ত্তি রাখ—একটু তোষামোদ করিতে পারিলেই বা কিছু দিতে পারিলেই তোমার নামের কীর্ত্তিটা থাকিবে, দশটা টাকাও পাইবে। আদর্শ সাহিত্য-সেবকেরা কি চান? লোকের প্রশংসাও না, নিন্দাও না, তাঁহারা প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপাসক, নীতির উপাসক—প্রশংসা-নিন্দা-নিরপেক্ষ। সাহিত্য-সেবক; প্রশংসা-নিন্দা-নিরপেক্ষ হইলে তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যের উদয় হয়। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণ দাস, মুকুন্দরাম এক দিনের জন্তও প্রশংসা-লালায়িত হন নাই। প্রশংসা-লালায়িত হন নাই, রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিহারীলাল ও বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহাদের বিমল সাহিত্যের ঔজ্জ্বল্যে আজ চতুর্দ্দিক পূর্ণ। আজ সাহিত্যের নেতৃত্ব পদের আশায় বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ বঙ্গবাসীর প্রশংসার জন্তও লালায়িত॥ পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিক জীবন মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িলেও আমরা ইহাপেক্ষা অধিকতর দুঃখিত হইতাম না। আর বলিব কি? বলিতে লেখনী লজ্জায় অভিভূত হয়, মহা প্রতিভাশালী, পূর্ব্ব গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র নবীনচন্দ্র, পুস্তকের সমালোচনার জন্ত আজ দ্বারে দ্বারে কৃপা-ভিখারী। আমরা তাঁহার নাকি কি নিন্দা ঘোষণা করিয়াছি, এজন্ত তিনি আমাদের প্রতি বিরক্ত! এই বিরক্তি, অনুকূল বন্ধুদিগের ভালবাসা ও অনুরাগসিংহাসন টলাইতে পত্রের মস্তকে চড়িয়া চতুর্দ্দিকে নাকি ঘুরিতেছে॥ ইহাতে নবীনচন্দ্রের প্রতিভা বাড়িতেছে, না কমিতেছে, না বুঝিয়া আমরা অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি, এদেশের হইল কি? নবীনচন্দ্রের প্রতিভার জয় ঘোষণা করিবার জন্ত অথবা প্রতিভা প্রতিষ্ঠার জন্ত এদেশে আসরে নামিলেন শেষে একজন বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতের নবজাত শিশু। এইরূপ আত্মমর্য্যাদাহীন প্রশংসা-ব্যাকুলতা দেখিয়া আমরা ভাবিতেছি, নবীনচন্দ্র তবে কি প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি নহেন? যদি তাহা না হন, তবে এদেশের সাহিত্যের আশা কোথায়?

হেমচন্দ্র এক প্রকার সাহিত্য-জগত হইতে বিদায় লইয়াছেন। চন্দ্রনাথ

এখন স্কুলের পাঠ্য লিখিতেছেন, অক্ষয়চন্দ্র নির্জ্জন সাধন করিতেছেন, এবং যোগেন্দ্রনাথ গবর্ণমেণ্টের দাসত্বে বিব্রত। যাঁহাদের নিকট অনেক আশা, এইরূপ এক এক করিয়া দেখি, সকলেই দূরে দূরে যাইতেছেন। পূর্ব্ব যুগের সমস্ত পত্রিকা গিয়াছে, গত বৎসর নবযুগের অতি গৌরবের "সাধনা" উঠিয়া গিয়াছে, জন্মভূমি দারুণ ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছেন। ভারতীর ভাব কন্যাদ্বয়ের উপর ন্যস্ত করিয়া আদর্শ মহিলা দেবী স্বর্ণকুমারী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন ! প্রেম, পবিত্রতা ও দয়া এ বঙ্গে জাগাইবে কে, ভাবিয়া ঠিক পাই না।

আদর্শ সাহিত্যের জন্য সাহিত্য-সেবা আমরা দেখিতে চাই। নীতি-মূলক মৌলিক সুকুমার সাহিত্য দেখিতে চাই। সেই আশা লইয়া নব্যভারতের জন্ম। সেই আশা এখনও ইহাকে সজীব রাখিয়াছে। কিন্তু আশা-শিশু নিরাশার মন্দিরে এখন যারপরনাই মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে, শিশু বাঁচিবে কি না কে জানে !! যদি না বাঁচে, তবে আমরা বলিতে পারি, নব্যভারতও সহানুভূতি ও সাহায্য অভাবে মৃত্যু-মুখে ছুটিবে ! অথবা নব্যভারত যে অধীনতার ঘোর তিমিরে, সেই তিমিরেই পড়িয়া থাকিবে !! বিধাতার বিধানে কি আছে, তিনিই জানেন। আমরা নিরাশার মন্দিরে আশা-শিশুকে মৃতপ্রায় দেখিয়া কেবল বিধাতাকে স্মরণ করিতেছি। তাঁহার কৃপা বর্ষিত হউক, নচেৎ রক্ষা নাই, নচেৎ আর রক্ষা নাই।

বৈশাখ, ১৩০৩।

ধনগৌরব-স্পৃহা।

পৃথিবীর প্রধান রব,—টাকা, টাকা, টাকা। চরিত্রের আদর, ধর্ম্মের আদর, পুণ্যের আদর, নীতির আদর এখন কল্পনা-গঙ্গায় বিসর্জ্জিত, এখন উঠিতে বসিতে, যাইতে শুইতে, মানুষ কেবল টাকা টাকা করিয়া অস্থির। টাকার জন্য দোকানদারী করিয়া মানুষ অন্যকে ভুলায়, টাকার জন্য কত প্রকার অত্যাচার করে। টাকার জন্য মানুষ অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে, প্রতিশ্রুতি অবহেলা করে, পরস্ত্রী হরণ করে, পাপকে প্রশ্রয় দেয়, দুর্নীতির সমাদর করে,—অথবা কি কুকার্য্য যে না করে, জানি না। টাকা মানুষের জপ তপ, যোগ তপস্যা—মানুষের সকলই। পৃথিবীতে ধনীর আদর সর্ব্বত্র, সকলের উপরে। খুব বড় বড় ধার্ম্মিক দেখিয়াছি—তাঁহারাও ধনীর সাত

খুন মাপ করিয়া তাঁহার দ্বারের ভিখারী; যোগী সাধক অনেক দেখিয়াছি, তুমি দরিদ্র, তুমি মরিলেও তোমার খোঁজ লইবেন না, কিন্তু তাঁহারা সদা ধনীর গৃহে, মধু-আকৃষ্ট পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায়, আসিতেছেন, যাইতেছেন। ধার্ম্মিকগণের নিকটই যখন সাম্য, নীতি, ধর্ম্ম উপেক্ষিত, তখন আর কোথায় তাহার আদর দেখিতে পাইবে? পৃথিবীর অগণ্য নরনারী তোষামোদ, স্তুতি, বন্দনা লইয়া, দিবা রাত্রি, জয়োল্লাসে গৃহপূর্ণ করিয়া, ধনীর উপাসনা করিতেছেন। টাকার মায়ায়, টাকার ছায়ায়, টাকার মোহে, টাকার স্বপ্নে জগৎ আত্মহারা, দয়ামায়া-হারা, প্রেম-পুণ্য-হারা। টাকা, টাকা, টাকা—দিবা রাত্রি অবিশ্রান্ত মানুষ টাকার অন্বেষণে ব্যস্ত। কি নিদারুণ টাকার প্রলোভন!

জগতের সাম্যাবতারগণ,—বুদ্ধ এবং শ্রীচৈতন্য, খ্রীষ্ট এবং পার্কার, রুসো এবং ম্যাট্‌সিনি, পৃথিবীর ধন-গৌরব-স্পৃহাকে খর্ব্ব করিবার জন্য আজীবন কঠোর সাধন এবং আজীবন তীব্র আন্দোলন ও তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করা সত্বেও, পৃথিবী চিরদিন ধন-মদে মত্ত, আত্মহারা, অসংযত, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কলুষপঙ্কে নিমজ্জিত। ধন যার, রাজ্য তার, মান তার, যশ তার, বুদ্ধি তার, বিদ্যা তার, সবই যেন তার,—পৃথিবী তাহার করতলস্থ। তার কথায় চন্দ্র সূর্য্য না উঠিলেও, রাজ্যের উত্থান ও পতন হয়; বায়ুর গতি প্রবাহিত না হইলেও, অগণিত লোকের মনের গতি প্রবাহিত হয়, নদীতে উজান না বহিলেও, পুণ্যের স্থলে পাপ, ধর্ম্মের স্থলে অধর্ম্ম সমাজে প্রশ্রয় পায়, আদর পায়। সহস্র চেষ্টাতেও কোন যুগে, স্থায়ীরূপে, ধন-গৌরবের স্থলে পৃথিবীতে চরিত্র-গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; সহস্র চেষ্টাতেও, মানুষ নীতিজ্ঞের আদর পুণ্যবানের আদর, ধার্ম্মিকের সম্মান সংরক্ষণের জন্য ধনীকে ভুলিতে বা উপেক্ষা করিতে পারে নাই। টাকায় যাহার ভাণ্ডার পূর্ণ, শত সহস্র পাপে নিমগ্ন হইলেও তাহার অপরাধ গণ্য নয়,—ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, বিশ্বাসঘাতকও টাকার সাহায্যে সমাজে ধার্ম্মিক চূড়ামণি, বিচক্ষণতার শিরোমণি বলিয়া পূজিত। তুমি বড় শক্ত মানুষ, একদিন অপরাধীর অপরাধ লইয়া সমাজে খুব তোলপাড় করিতে তোমাকে দেখিয়াছিলাম, আজ দেখিতেছি, তুমিও বিশ্বাসঘাতকের পদলেহন করিতে ছুটিতেছ ও তাহাতেই আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছ। এইরূপে দেখিতেছি, শক্ত শক্ত মানুষকেও টাকায় ক্রয় করিয়া ধন-গৌরবের বিজয় ডঙ্কা বাজাইবার জন্য দিন দিন দল পুষ্ট হইতেছে। সম্পাদক বল, লেখক বল, টাকায় এ জগতে

সকলকেই ক্রয় করা যায়। যোগী বল, ঋষি বল, টাকার আকর্ষণে এ জগতে সকলেই প্রলুব্ধ। টাকার ঝন্ ঝন্ শব্দের ন্যায় মধুর শব্দ বুঝি এ জগতে আর নাই! টাকায় অনুকূল সমালোচনা মিলে, টাকায় ধার্ম্মিক নাম ক্রয় হয়। টাকায় মানুষ বিবেকের পবিত্রধ্বনি উপেক্ষা করিয়া মত-বিরুদ্ধ প্রস্তাবের পোষকতা করে। পৃথিবীর প্রধান রব,—টাকা, টাকা, টাকা!

ধনগত বৈষম্য পৃথিবীর মহা অনিষ্টের মূল, একথা অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করেন, কিন্তু ঘটনাস্থলে কেহই এই মহা অনিষ্টকর বৈষম্যের হাত এড়াইতে পারেন না। বর্ণগত বা জ্ঞানগত বৈষম্যেও পৃথিবীর অপকার না হইতেছে, তাহা নহে; কিন্তু ধনগত বৈষম্য সর্ব্বনাশের মূল। এই জন্যই বুঝি বা শ্রীচৈতন্য এবং খ্রীষ্ট, ধনীদিগের সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

মহাত্মা ঈশা বলিয়াছেন—

"Then said Jesus unto his disciples, Verily, I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven" Matt chap xix, 23.

"And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God" Matt. chap xix. 24.

"And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall, they that have riches enter into the kingdom of God" St. Luke, chap xviii 24

"For it is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God" St Luke, chap xviii 25

ভাবার্থ এই, "ধনী ব্যক্তিরা কখনও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে অধিকারী নহে। সূচীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া (কেহ কেহ বলেন, পার্শ্ব দ্বার দিয়া) উষ্ট্রের গমন করাও সম্ভব হইলে হইতে পারে, কিন্তু ধনীর স্বর্গরাজ্যে গমন তদপেক্ষাও কঠিন।" কি তীব্র মন্তব্য। কেহ খ্রীষ্টের শিষ্যত্ব গ্রহণে অভিলাষী হইলে, অগ্রে ধন ঐশ্বর্য্য বিক্রয় বা বিতরণ করিয়া আসিতে বলিতেন।

"And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?" Matt. chap xix, 16

* * * * *

"The young man saith unto him, all these things have I kept from my youth up what lack I yet?" Matt chap xix 20

"Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go *and* sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven and come and follow me" Matt chap xix 21

ভাবার্থ এই— "এক ব্যক্তি খ্রীষ্টকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি

করিলে আমি অনন্ত জীবন পাইতে পারি? অনেক উপদেশ প্রদানের পর খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, স্বর্গের ঐশ্বর্য্য পাইতে হইলে তোমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমার সঙ্গে আসিতে হইবে।"

মহাত্মা শ্রীচৈতন্যের মধ্যেও এভাব দেখা যায়। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র রায় শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ধনীর সহিত কথোপকথনেও ধর্ম্মের ব্যত্যয় হয়, তিনি এই কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম ও শ্রীচৈতন্যের কথোপকথন আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভু স্থানে,
'অভয় দান দেহ যদি করি নিবেদনে।'
প্রভু কহে 'কহ' তুমি নাহি কিছু ভয়,
যোগ্য হৈলে করিব অযোগ্য হৈলে নয়'
সার্ব্বভৌম কহে 'এই প্রতাপ রুদ্র রায়,
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়।'
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ,
'সার্ব্বভৌম। কহ কেন অযোগ্য বচন?
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ দরশন,
স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ।'
সার্ব্বভৌম কহে 'সত্য তোমার বচন,
জগন্নাথ সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম।'
প্রভু কহে 'তথাপি রাজা কালসর্পাকার,
কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে উপরে বিকার।
ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে,
কহ যদি তবে আমায় এথা না দেখিবে।'

জগদীশ্বর বাবুর সংস্করণ—মধ্যলীলা, ১১শ পরিচ্ছেদ, ২৪৪—২৪৫ পৃষ্ঠা।

খ্রীষ্ট যেমন শিষ্যদিগকে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বলিতেন, শ্রীচৈতন্যও তদ্রূপ করিতেন। সনাতন সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, একখানি ভোট কম্বলের মায়া ছাড়িতে পারিয়াছিলেন না; সেজন্য শ্রীচৈতন্য কত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যথা—

"সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার,
ভোট কম্বল পানে প্রভু চাহে বারেবার।"

ঐ মধ্যলীলা, ৪৬৪ পৃষ্ঠা।

*　　　*　　　*　　　*

এত বলি কাঁথা লৈল ভোট তারে দিয়া,
গোঁসাইর ঠাঁই আইলা কাঁথা গলায় দিয়া।
প্রভু কহে 'তোমার ভোট কম্বল কোথা গেল?'
প্রভুপদে সব কথা গোঁসাঞি কহিল।
প্রভু কহে 'উহা আমি করিয়াছি বিচার,
বিষয় রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার,
সে কেন রাখিবে তোমায় শেষ বিষয় ভোগ?
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ।" ৪৬৫ পৃষ্ঠা।

মহাত্মা বুদ্ধদেবের কথা সকলেই জানেন। তিনি সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য, অতুল ঐশ্বর্য্যমায়া তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। "অহিংসা পরমধর্ম্ম," এই উদার মত তিনিই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য-দিগের (শ্রমণ) তদানীন্তন কালের জীবন তাঁহার মতের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। *

যে ধন ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি সাধকগণ এক বাক্যে এত ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই টাকা না হইলে মানুষের একদিনও চলে না। বিনিময়ের মূল—অর্থ। বিনিময় ভিন্ন রাজ্য, সমাজ, পরিবার কিছুই সংরক্ষিত হয় না, কিছুরই শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় না। অথচ ধার্ম্মিকগণ ধনৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন। কেন পরিত্যাগ বলিতেছেন, ইহার মীমাংসা কোথায়?

এই গুরুতর প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে, সমাজের অবস্থা বুঝাইবার জন্য, মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্য নামক পুস্তকের প্রথম হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই সংসারে একটী শব্দ সর্ব্বদা শুনিতে পাই—"অমুক বড় লোক—অমুক ছোট লোক' এটি কেবল শব্দ নহে। লোকের পরস্পর বৈষম্যজ্ঞান মনুষ্যমণ্ডলীর কার্য্যের একটি প্রধান প্রবৃত্তির মূল। অমুক বড় লোক, পৃথিবীর যত ক্ষীর সর নবনীত সকলই তাঁহাকে উপহার

---

* "তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ অনন্তকালস্থায়ী মহিমা বিস্তার পূর্ব্বক, ভারতাকাশে উদিত হইয়া, দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন,—"আমি এ উদ্ধার করিব। আমি তোমাদিগকে উদ্ধারের বীজমন্ত্র বলিয়া দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণ বৈষম্য মিথ্যা। যাগ যজ্ঞ মিথ্যা। বেদ মিথ্যা, সূত্র মিথ্যা, ঐহিক সুখ মিথ্যা। কে রাজা, কে প্রজা, সব মিথ্যা। ধর্ম্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই সত্যধর্ম্ম পালন কর।' বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্য, ৮ পৃষ্ঠা।

দাও। ভাষার সাগর হইতে শব্দরত্নগুলি বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া হার গাঁথিয়া তাঁহাকে পরাও, কেননা তিনি বড় লোক। যেখানে ক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় কণ্টকটি পথে পড়িয়া আছে, উহা যত্ন সহকারে উঠাইয়া সরাইয়া রাখ—ঐ বড় লোক আসিতেছেন, কি জানি যদি তাঁহার পায়ে ফুটে। এই জীবন পথের ছায়া স্নিগ্ধ পার্শ্ব ছাড়িয়া রৌদ্রে দাঁড়াও, বড় লোক যাইতেছেন। সংসারের আনন্দ-কুসুম সকল, সকলে মিলিয়া চয়ন করিয়া শয্যা রচনা করিয়া রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন করুন। আর তুমি—তুমি বড় লোক নহ—তুমি সরিয়া দাঁড়াও, এ পৃথিবীর ভাল সামগ্রী কিছুই তোমার জন্য নয়। কেবল এই তীব্রঘাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্য—বড়লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলাপ হইবে।

"বড় লোকে ছোট লোকে এ প্রভেদ কিসে? রাম বড় লোক, যদু ছোট লোক কিসে? তাহা নিন্দুক লোকে এক প্রকার বুঝাইয়া দেয়। যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্ব্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোট লোক? রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড় লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্য্য বঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন, মুনিবের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র, সুতরাং সে বড় লোক। অথবা রাম কোন বঞ্চকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে বড় লোক। রামের মাহাত্ম্যের উপর পুষ্পবৃষ্টি কর।

"অথবা রাম সেলাম করিয়া, গালি খাইয়া, কদাচিৎ পদাঘাত সহ্য করিয়া, অথবা ততোধিক কোন মহৎ কার্য্য করিয়া, কোন রাজপুরুষের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। রাম চাপরাস গলায় বাঁধিয়াছে—চাপরাসের বলে বড় লোক হইয়াছে। আমরা কেবল বাঙ্গালির কথা বলিতেছি না—পৃথিবীর সকল দেশেই চাপরাস বাহকের একই চরিত্র—প্রভুর নিকট কীটানুকীট, কিন্তু অন্যের কাছে?—ধর্ম্মাবতার। তুমি যে হও, দুইহাতে সেলাম কর, ইনি ধর্ম্মাবতার। ইহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, অধর্ম্মেই আসক্তি,—তাহাতে ক্ষতি কি? রাজকটাক্ষে ইনি ধর্ম্মাবতার। ইনি গণ্ডমূর্খ, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ—সে কথা এখন মনে করিও না, ইনি বড় লোক, ইহাকে প্রণাম কর।'

* * * *

"সর্ব্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও দুই এক জন লোক টাকার খরচ খুঁজিয়া পায়েন না—কিন্তু লক্ষ লোক অন্নাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতেছে।"

অর্থগত বৈষম্যের দরুণই আমেরিকার দাসত্বের উচ্ছেদ সাধন, ইহারই জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসিস বিপ্লব। ইহারই বিনাশের জন্য শাক্যসিংহের উদ্ভব। কিন্তু সে সকল কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনার এ সময় নয়। এই অর্থগত বৈষম্য দূর করিবার জন্য, ধনীর ধনগৌরব ধ্বংসের জন্যই ইউরোপে কমুনিজম, সোসিয়ালিজম ও নিহিলিজমের সৃষ্টি। ধরা যেন ধনীদিগের গৌরব

কিছুতেই সহিতে পারেন না। তাই মধ্যে মধ্যে জগতে সাম্যাবতারগণের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু সে সকল কথারও বিস্তৃত বিবরণের এ স্থল নহে।

ধন-স্পৃহা মানুষের বড় সর্ব্বনেশে বৃত্তি। দুই মুষ্টি অন্ন হইলে যে মানুষের দিনপাত হয় এবং দশ মণ কাষ্ঠ হইলেই যাহার দেহের পরিণাম চিতাতে সমাহিত হয়, তাঁহার এত ধন-স্পৃহা কেন? বুঝিবা কেবল গরীবের প্রতি অদম্য অত্যাচারের দুর্জ্জয়প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য! এত ধন-স্পৃহা কেন যে, তাব জন্য ধর্ম্ম ডুবাইতে হইবে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অন্যথা করিতে হইবে, প্রেমের বন্ধন কাটিয়া পরিবার, আত্মীয় বান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে,—পাপের পশরা মাথায় বহিতে হইবে—ঘৃণা নিন্দাকে তুচ্ছ করিয়াও অকথ্য কথন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অকার্য্য করণ, অ-রূপ দর্শন করিতে হইবে? দু'মুষ্টিব জন্য কেন গালাগালি তিরস্কার মাথায় বহিয়া, পুষ্প-বর্ষণ-ধারণের ন্যায়, পাদুকার আঘাত পৃষ্ঠে বহিয়া পরের দাসত্ব করিতে হইবে? কেন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কেন জাল জুয়াচুরি করিতে হইবে? কেবল দু'মুষ্টির সংস্থান!! তার জন্য কখনও মানুষ এত কলঙ্কের বোঝা বহিত না!! না—কখনই দু'মুষ্টির জন্য নহে। ধন-স্পৃহা মানুষকে আক্রমণ করিলে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান ভুলে, দস্যুবৃত্তি, চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিন কাটায়। যাহারা পেটের দায়ে অন্যের ধন চুরি করে, তাহাদের বরং কেহ মার্জ্জনা করিলেও করিতে পারে, কিন্তু ধন-স্পৃহাতে মানুষ যখন বন্ধুর বুকে ছুরি বসাইয়া ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হয়, পিতৃহন্তারূপে সমাজে ভক্তির বিজয় নিশান উড়ায়, অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আত্মীয়ের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, তখন আর মার্জ্জনা নাই। ধনস্পৃহাতে মানুষের সৎগুণ রাশি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়, কেবল টাকা, কেবল টাকা, এই চিন্তা জীবনের জপমালা হয়। দিবারাত্রি মানুষ ইহারই অন্বেষণে ফিরিতে থাকে; আর কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, কেবল টাকার অন্বেষণ। ৯৯র ধাক্কায় সমস্ত সৎ-কার্য্যের ইচ্ছা অন্তর্হিত হয়। দারুণ ধন-পিপাসার কিছুতেই নিবৃত্তি নাই। এক টাকা পাইলে আর ৯৯৲ হইলেই শত পূরিবে, অথবা ১৲পাইলে আর ৯৯৯৲ হইলেই সহস্র পূরিবে, এই চিন্তায় সদা বিভোর থাকে। আত্মীয় বন্ধু সকলই পর, আপন কেবল টাকা। টাকা জপ, টাকা তপ। একটী টাকা দান করিতে বা দুইটী টাকা দেনাশোধ করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়, দারুণ চিন্তা হয়, হায়, যদি ঐ একটী না যাইত, আব ৯৯টী হইলেই শত পূরিত!

দানের সময় হৃদকম্প, দেনা শোধের সময় দারুণ বজ্রাঘাত!। টাকা পাইলে গাড়ী ঘোড়ায় চড়িব, নৃত্য গীতে মাতিব, বিলাসের উপর বিলাস চালিয়া ইন্দ্রিয় সুখের চরিতার্থ করিব, ধনস্পৃহার পরিণতি ইহাই! ধনের কথা ভাবিতে ভাবিতে মানুষ স্বর্গের কথা, পরলোকের কথা বিস্মৃত হয়, সংসারের সুখকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করে—ঈশ্বরের স্থলে আত্ম-সম্মান ও আত্মপূজা প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হয়। টাকায় আসক্তি বৃদ্ধি, আসক্তিতে মোহ বৃদ্ধি, মোহ বৃদ্ধিতে ধর্ম্ম বুদ্ধির নাশ, ধর্ম্ম-বুদ্ধির নাশে অহঙ্কারের অভ্যুদয়। অহঙ্কার মানুষকে আক্রমণ করিলেই মানুষ অন্ধ হয়, সদসৎ বৃত্তি ভুলিয়া যায়, বিবেককে বলি দেয়।॰ অহঙ্কারের ন্যায় এমন অন্ধত্ব জন্মাইবার জিনিস এই পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। অহঙ্কারের অভ্যুদয়ে যখন মানুষ বিবেককে বলি দেয়,—তখন মানুষ স্বপ্ন দেখে—"আমার স্থায় কেহ নাহি ত্রিভুবনে।" অহঙ্কারী অন্ধ মানুষের ক্ষমতা স্বীকার করে না, অন্যকে বড় দেখিতে পারে না, অন্যের দর্প খর্ব্ব করিতে সে সদা লালায়িত। সুতরাং অহঙ্কারের পরই পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, বিদ্বেষে মানুষ পুড়িতে থাকে, পরনিন্দা তাহার শ্রীমুখের ভূষণ হয়, ক্রোধ তাহার নিত্য সহচর। ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা মানুষকে আক্রমণ করিলে মানুষের মঙ্গলের পথ, কল্যাণের সোপান রুদ্ধ হয়। তখন মানুষ মহামোহে পড়ে, বুদ্ধিভ্রংশ হয়। * তখন মানুষ ঘোর তর অত্যাচারী হয়, নৃশংস হয়,—নরহত্যা করে, ব্যভিচার করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে। তখন মানুষ এতই নীচগামী হয় যে, অন্যের প্রতি অত্যাচার করিয়া উল্লাসে নৃত্য করে। কথিত আছে, নীরো নগরে অগ্নি লাগাইয়া বীণাবাদন পূর্ব্বক রঙ্গ দেখিতেন। কিন্তু দর্পহারী ভগবান্ মানুষের এ দর্পও চূর্ণ করেন। মৃত্যু তাহার সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য হরণ করে, রোগ শোক তাহাকেও আশ্রয় করে,—কাল তাহার অহঙ্কারকেও চূর্ণ করে। এ হেন লোক নেপোলিয়ন হইলে সেণ্টহেলেনায় বন্দী হয়, † সিজর হইলে

* ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥
গীতা, ২য় অধ্যায়, ৬৩।

† "Bonaparte was singularly destitute of generous sentiments The highest placed individual in the most cultivated age and population of the world,—he has not the merit of common truth and honesty. * * He is a boundless liar" * * "All passed away, like the smoke of his

ব্রুটাসের তীক্ষ্ণ অসিতে জীবন বলি দেয়, সিরাজউদ্দৌলা হইলে মিরণের হস্তে নিহত হয়, ষোড়শ লুই হইলে সিংহাসনচ্যুত হইয়া প্রাণে মরে। এই রূপ কত শতসহস্র অহঙ্কারী, পরস্বাপহারী, অত্যাচারী মানবের পতন হইয়াছে, মানব তাহা ধারণা করিতেও পারে না। তবুও মানবের শিক্ষা হয় না, তবুও মানুষ অহঙ্কারে আত্মহারা, অত্যাচারে দিক্‌ভ্রান্ত, পরধন-লুণ্ঠনে ক্ষিপ্র-হস্ত। সাধারণতঃ চৌদ্দ আনা লোকেরই এই দশা। যাঁহাদের এরূপ হয় না, তাঁহারা নরদেবতা; তাঁহারা আধুনিক বঙ্গভূমির বিদ্যাসাগর, তারক প্রামাণিক, মহারাণী স্বর্ণময়ী, প্রাচীন ভারতের দাতাকর্ণ, জনক ঋষি এবং রামচন্দ্র। সেরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। বিরল বলিয়াই খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধদেব বুঝিবা বড়ই তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ধন যদি এতই অপকারী, তবে বিধাতা মানুষকে ধনের অধিকারী করেন কেন? কেহ কেহ এইরূপ কথা বলেন। পৃথিবীর অত্যাচারের বিষয় একদিকে চিন্তা করিলে এবং একজন মানুষের কত সামান্য জিনিসে দিনপাত হয়, ভাবিলে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া আর উপায় নাই যে, বিধাতা মানুষকে ধনের অধিকারী করেন, কেবল দয়া বৃত্তি চরিতার্থ করিতে। তিনি কাহাকে দাতা করিয়া, কাহাকেও গ্রহীতা করিয়াছেন, কেবল প্রেম প্রতিষ্ঠার জন্য। কোন কোন দেশের বিশেষ জিনিস, অন্য দেশে সচরাচর দেখা যায় না। বিধাতার এরূপ বিধান, যেমন, বিনিময়ের ভিতর দিয়া মানবপরিবারে প্রেম-বিস্তারের জন্য, অথবা মানুষকে প্রেম-বন্ধনে বাঁধিবার জন্য, ব্যক্তি বিশেষের ভাণ্ডারপূর্ণ করিয়া কাহারও ভাণ্ডার শূন্য করিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ, প্রেমবিস্তারের জন্য তিনি কাহাকেও দাতা করিয়াছেন, কাহাকেও গ্রহীতা করিয়াছেন। লক্ষ্য সকলেরই এক। কে বড়, কেবা ছোট? এক প্রেম-সিংহাসন-তলে সকলে উপবিষ্ট। সকলেরই জীবনধারণ এক মুষ্টিতে, সকলেরই পরিণাম ঐ শ্মশানের মাটী বা ছাই, বড় ছোট এ ভেদ-বোধ-অনলে কেন ভাই দগ্ধ হও? কে মুনিব, কে বা ভৃত্য, কে রাজা কেবা প্রজা? সকলেরই পরিণাম এক, সকলেরই লক্ষ্য

---

artillery, and left no trace" * * "It was the nature of things, the eternal law of the man and the world, which balked and ruined him and the result, in a million experiment, would be the same. Every experiment by multitudes or by individuals that has a sensual and selfish aim, will fail" *Emerson.*

এক, বিভিন্নতা বোধ কেবল চক্ষের ধান্দা মাত্র। অথবা সকল বিভিন্নতা, অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া, পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্যে, সেই লক্ষ্য ধামে লইয়া যাইবার জন্য।

মানুষকে ধন দিয়াছেন যদি বিধাতা, তার্‌ধারে দয়াও দিয়াছেন; কিন্তু মানুষ ক্রমে-ক্রমে ধনস্পৃহাতে আত্মহারা হইয়া, দয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, অর্থের দাসানুদাস হইয়া পড়ে। অর্থের দাসত্বে যখন মানুষ আপনাকে বিক্রয় করে, তখন মানুষ পশু। পশু অপেক্ষাও পশু। এবম্বিধ বড় লোকের অত্যাচারে যখন জগৎ উচ্ছন্ন যাইতে বসে, তখন বিধাতা আবার তাহাদের পতন আনয়ন করিয়া জগতে সাম্য সংস্থাপন করেন। টাকা পাইয়া যে টাকার সদ্ব্যবহার করে না, দীর্ঘকাল কখনই তার ঘরে টাকা থাকে না। লক্ষ্মীর আসন সদা সঞ্চল। আজ এখানে, কাল সেখানে। বিধাতা অবসর অনেককেই দেন, কিন্তু যে অপব্যবহার করে, তাহার নিকট হইতে তাঁহার কৃপার দান প্রত্যাখ্যান করেন। উপকথায় বলে, ধনের মাইট ঘরে আসিলে, কদাচার করিলে, তাহার মুখ বন্ধ হইয়া যায় ও সে স্বস্থানে প্রস্থান করে। কথাটা উপকথার ব্যবহৃত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সদ্ব্যবহার না পাইলে ধনৈশ্বর্য্য এক স্থলে থাকে না। এখানকার ধন ওখানে, তথাকার ধন এখানে, ধন ও ঐশ্বর্য্য প্রতিনিয়তই যেন ছুটাছুটি করিতেছে। কত সহস্র রাজা পথের ভিখারী হইতেছে, কত সহস্র দরিদ্র রাজসিংহাসনে বসিতেছেন। সম্পদ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী অনেকেই, ভোগ দখল করিতে পারে, অতি অল্প লোক। মহা প্রতাপান্বিত রাজা রাজবল্লভের অতুল কীর্ত্তিকলাপপূর্ণ রাজভবন আজি কীর্ত্তিনাশার গর্ভে, তাঁহার বংশধরগণের দিনপাতেও এখন কষ্ট; ধনগৌরবে স্ফীত, তদানীন্তন কালের ধনকুবের জগৎ শেঠের ঐশ্বর্য্যসম্পদ-পূর্ণ ভবন এখন ভাগীরথীর ক্রোড়ে,—একটী প্রাচীন মসজিদ্ ভিন্ন সিরাজের ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন মাত্রও নাই; সকলই কালের ধ্বংস-কবলে। আধুনিক কালের কথাই বলিতেছি। প্রাচীন কালের কীর্ত্তিকলাপ ত সকলই কালের গর্ভে। আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, কত কত রাজা জমীদারের ধনগৌরব, প্রহেলিকাবৎ, বিদ্যুৎবৎ বিস্মৃতিতে ডুবিতেছে; তাঁহাদের বংশধরগণের দিনপাতেও এখন কষ্ট। তুমি ধনগৌরবে স্ফীত হইয়া অহঙ্কারে মেদিনীকে যে তৃণবৎ উপেক্ষা করিতেছ, তোমার এই গাড়ী ঘোড়া, হ্যাটকোট, মুষ্টিমেয় দশ বিশ হাজার টাকা, ধূলির

ন্তার সময়ের অদম্য ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া যাইবে, কে জানে ? তোমার ধন তোমার শ্মশানের সহায় নয়, তোমার ঐশ্বর্য্য-সম্পদ মৃত্যুময়, নশ্বর জগতে কিছুতেই তোমাকে মৃত্যু, ধ্বংস, শেষ দশা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে কিসের অহঙ্কার ভাই তোমার? তুমি দুগ্ধ-ফেননিভ সুখশয্যায় শয়ান থাকিয়া, কল্পনার চক্ষে দেখিতেছ, এবং ভাবিতেছ, তোমার সুখের শেষ নাই। মহামূর্খ তুমি! দুঃখীর হৃদয়ে বজ্র হানিয়া তুমি তাহার কুলবধূকে অপহরণ করিতেছ, ঘটী বাটী, ঘর বেচিয়া আপন ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছ; শত শত নিরন্ন ব্যক্তিকে নির্ব্বাসন করিতেছ বা হত্যা করিতেছ, এবং উল্লাসে, টাকার বলে ধর্ম্মাধিকরণকে, বিচারকে পরাস্ত করিয়া ভাবিতেছ, তোমার দুর্জ্জয় প্রভাব চিরদিনই সমান থাকিবে। তোমার ন্তায় মূর্খ আর কে? নীরোর ভীষণ অত্যাচার চিরদিন পৃথিবীতে সমান ভাবে থাকে নাই, সিরাজেরও পতন হইয়াছে,—কত সহস্র সহস্র ব্যক্তির অহঙ্কার বিধাতা চূর্ণ করিয়াছেন! তুমি আজ ঐশ্বর্য্য-অট্টালিকায় বসিয়া পোষাক পরিচ্ছদের গরিমায় মাতিয়া, মলিন বসনাবৃত দরিদ্র বন্ধুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ, রাজৈশ্বর্য্যের মায়ায় পড়িয়া বড় লোক সঙ্গী পাইয়া, উল্লাসে দিক্‌বিদিক, কাণ্ডাকাণ্ড শূন্য হইয়া ফিরিতেছ, দিনান্তে একবার মনে ভাবিও যে, এদিন চিরস্থায়ী নহে,—আবার ঘোর দুর্দ্দিন আসিবে, আবার মহা অন্ধকার আসিবে, আবার ভীষণ শোকসিন্ধু উথলিবে। বিধাতার রাজ্যে এ সকল ক্ষণস্থায়ী অভিনয় মাত্র। তাঁহার প্রদত্ত ধন জন, বিত্ত সম্পদ পাইয়া যে তাহার সদ্ব্যবহার না করে, কিছুদিন পর, নিশ্চয় সে সকল তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। সম্পদের বন্ধু, বসন্তের কোকিল, দুঃখ দুর্দ্দিনময় দারুণ শীতে তাহারা কাছেও ঘেসিবে না। কত শত উদাহরণ সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে,—কতশত প্রতিপালকের বক্ষে, অসময়ে, দুর্দ্দিনে, বন্ধুরূপী সয়তানেরা আঘাত করিয়া পিশাচের অভিনয় করিতেছে। স্থিরচিত্তে সকলেরই চিন্তা করা উচিত, কেন আছি, কোথায় চলিয়াছি, কেন এই সকল সুখ সম্পদ পাইয়াছি? চিন্তা করিয়া, ভক্তিভরে সকলেরই বিশ্বপতির চরণে প্রণিপাত করা উচিত, এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্য তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া, অকাতরে, অসহায় নরনারীর সেবার্থ অর্পণ করা উচিত।

উলঙ্গ অবস্থায় মানুষের পৃথিবীতে আগমন, শেষে আবার উলঙ্গ অবস্থাতেই গমন। মানুষের সঙ্গে ধন ঐশ্বর্য্য, বিষয় বিভব কিছুই যায় না।

যাঁহারা বিশ্বাসী, ভক্ত, প্রেমিক, তাঁহারা সকল অবস্থাতেই অটল, অচল, অপরিবর্ত্তিত। মহাত্মা ত্রৈলঙ্গস্বামী নির্ব্বিকারচিত্ত ছিলেন; সদা উলঙ্গ থাকিতেন, রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, তাঁহার নিকট সমান; রাজভোগ ও পুরীষ তাঁহার নিকট তুল্য ছিল। তৃণশয্যা ও রাজশয্যা, উভয়কে যে সমান চক্ষে দেখিতে পারে, সে-ই ধন্য! ঘোর দারিদ্র্যে ও মহা সম্পদ ঐশ্বর্য্যে সমভাবে যে ব্যক্তি বিধাতার চরণ-সেবা করিতে পারে, সে-ই ধন্য! নিরহঙ্কার, নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, অনাসক্তচিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি কাম্যবস্তু ভোগ করে, কোন অবস্থাতেই আত্মহারা হয় না, সেই ব্যক্তিই শান্তির অধিকারী। * সংযম যে ধর্ম্মপথের কি মহা সহায়, তাহা যে বুঝিয়াছে, তাহার পক্ষেই ধর্ম্মার্জ্জন সহজ হইয়াছে। যিনি রাগদ্বেষ বর্জ্জিত, যাঁহার মন সংযত, অথবা বশীভূত, তিনি বিষয়ভোগ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। + অতি সুন্দর অট্টালিকায় থাকিয়াও যিনি মনে করিতে পারেন যে, তৃণশয্যাও ইহারই তুল্য, তিনিই ধন্য; আর অন্যদিকে তৃণশয্যায় শুইয়াও যিনি বিধাতার কৃপা-শয্যায় শুইয়াছি, মনে কবিতে পারেন, তিনিই ধন্য। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, যাঁহার নিকট সমান, তিনিই ধন্য। সাধারণ মানবেরা অবস্থার দাস, কখনও দারিদ্র্যে নয়নজলে সিক্ত, কখনও সুখসম্পদে, বিলাসের অট্টহাস্যে পরিপূরিত। সাধারণ লোক সাধক হইলেও, দরিদ্রকে পরিত্যাগ করিয়া ধনীর অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে, কেন না, সেখানে সুখসম্ভোগের খুব প্রত্যাশা। সাধারণ লোক, দারিদ্র্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে দরিদ্রকে ঘৃণা করে, পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণে লজ্জিত হয়, পিতা মাতাকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করে, সম্পদ-শয্যায় শুইয়া বিশ্বপতিকেও ভুলিয়া যায়। সাধারণ লোক, যখন গরীব, তখন ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করে, যখন ঐশ্বর্য্যশালী, তখন শালের চোগা চাপকানে, মকমল কিমখাপে ও হীরা-মুক্তা-জড়িত স্বর্ণে দেহকে বিভূষিত করে! সাধারণ ধনীর গৃহ এবং বারাঙ্গনার গৃহে কোনই পার্থক্য নাই। আর যাঁহারা অসাধারণ ব্যক্তি, যাঁহারা মহাত্মা বিদ্যাসাগর তুল্য, তাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়াও সামান্য চটী পায়, উড়নী গায় দিয়া রাজ-ভবনে, লাট-প্রাসাদে বা দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সমভাবে বা রাস্তায় অপরিচিত ভাবে গমনাগমন করেন, এবং ঐশ্বর্য্য সম্পদ সকলই গরীব সেবার জন্য, ইহা মনে ভাবিয়া সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া দিয়া বিমল আনন্দ পান! যাঁহারা অসাধারণ ব্যক্তি, তাঁহারা সাংসারের কালীসিংহের ঠাট্টা বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া মহাত্মা তারক

প্রামাণিকের ন্যায়, নিজে নামাবলী গায়ে দিয়া, শাল বনাত অকাতরে শত সহস্র দুঃখীকে দিয়া তাহাদের শীত নিবারণ করেন। যাঁহারা অসাধারণ, তাঁহারা অন্নপূর্ণার রূপ ধারণ করিয়া, দীনজননী মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায়, সামান্য আতপ তণ্ডুলে উদর পূর্ণ করিয়া, মহানন্দে জগতকে অন্ন চিন্তার দায় হইতে রক্ষা করেন। সাধনার মাহাত্ম্য কোথায়? সংসার ছাড়িয়া যে বনে যায়, বনই তাহার আসক্তির বস্তু হইতে পারে; সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিত্যাগী সন্ন্যাসীর হরিণের মায়ার ন্যায়, তাহার মন বনের মায়ায় জড়িত হইতে পারে! সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও যিনি মনের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া ভাবিতে পারেন যে, আমার যেন কিছুই নাই, আমি কিছুই নই, সকলই বিধাতার, তিনিই প্রকৃত সাধক। গৈরিক পরিলে যদি বৈরাগ্যের উদয় সম্ভব হইত, এজগতে সকলেই বৈরাগ্য সাধন করিতে পারিত। বৈরাগ্য, অনাসক্তি, নিরহঙ্কার, মনে। মনের উপর যিনি জয়লাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সংযমী। বাসনাকে সংযত করিতে যিনি পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সাধক। সংযম, সাধন, বাহিরের আচার-ব্যবহারের সহিত মনের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিলে তবে সিদ্ধি লাভ হয়। সংযম, সাধন, সোজা জিনিস নয়। আত্ম বাসনার উপর যে জন জয়ী, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বীর। বিধাতা, হস্তস্থিত আমলকীবৎ, তাঁহার করতলস্থ। জটা বিভূতিতেও সাধন হয় না, ধনৈশ্বর্য্যেও সাধন যায় না। অবস্থার উপর, ঘটনার উপর জয়লাভ করিলেই মনুষ্যত্ব জন্মে। জনক রাজা হইয়াও ঋষি ছিলেন, পুণ্ডরীক ধনী হইয়াও ভক্তচূড়ামণি বলিয়া আদৃত হইতেন। * আত্ম-বাসনা-নিবৃত্তি যাঁহার হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই অবস্থা ও ঘটনা জয়ে সক্ষম। সকল অবস্থা ও সকল ঘটনায় যিনি অটল, অচল, বৈকুণ্ঠ এবং স্বর্গ, পুণ্য এবং শান্তি, পবিত্রতা এবং প্রেম তাঁহার হৃদয়ের দ্বারে। দুঃখ এবং সুখ, উভয়কে তিনি বিধাতার আশীর্ব্বাদ রূপে গ্রহণ করেন, দুঃখ পাইলেও তিনি বিষণ্ণ হন না, সুখ ঐশ্বর্য্য পাইলেও তাহাতে মত্ত হইয়া, উল্লাসে নৃত্য করিয়া, অত্যাচার-অনলে জগৎকে দগ্ধ করেন না। তিনি কামনা-বর্জ্জিত মহাবীর, তিনি অহঙ্কার নির্ব্বাণ মহাকর্ম্মী। তিনি অতীন্দ্রিয় চিন্ময় রাজ্যের দাসানুদাস।

এ সাধন বড় কঠোর সাধন। সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়াই সাধু

---

* শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের সংস্করণ, মধ্যখণ্ড, সপ্তম অধ্যায় দেখ। জগদীশ্বর বাবুর চৈতন্যলীলামৃত, পূর্ব্বভাগ, ত্রিংশ পরিচ্ছেদ এবং চৈতন্যভাগবত।

মহাজনেরা এ পথ পরিত্যাগ করিতে বলেন। অহঙ্কারকে, কামনাকে, ভোগ-স্পৃহাকে—ইন্দ্রিয়, রিপু ও বৃত্তিদিগকে জয় করার ন্যায় দুরূহ কার্য্য আর কিছুই নাই। অনেকেই এ স্থলে অকৃতকার্য্য। মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন,—সকল সাধনার বিঘ্ন ঘটায়, কামিনী ও কাঞ্চন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যও এই কথা বলিয়াছেন, খ্রীষ্টও এই কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, খ্রীষ্ট বিবাহের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই। সে কথা সত্য নহে। তিনি বাসনা ও ভোগস্পৃহা-নির্ব্বাণের পক্ষে যাহা প্রয়োজন, সে সকলই অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন। *

সুখ ও দুঃখ, সম্পদ ও বিপদ, ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র, উভয়ে সমজ্ঞান-সাধন বড়ই কঠিন। কিন্তু তাহা না হইলেও কিছুই হইল না। যাঁহারা ধার্ম্মিকতার ভাণ করেন, তাঁহাদের নিকট এতটুকু আশা করা অন্যায় নহে যে, তাঁহারা অন্তরে কতকটা সংযত হইবেন। কিন্তু যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, ধার্ম্মিকতার অর্থ সেখানে স্বতন্ত্র। খাও, দাও, বক্তৃতা করিয়া সুখে বেড়াও, ধর্ম্মের অর্থ সেখানে এইরূপ। "ঋণ করিয়া ঘি খাও" গোছের চার্ব্বকী মত এখন ষোল আনা সমাজকে অধিকার করিতেছে! ধার্ম্মিকতা এখন ঐশ্বর্য্যে, সম্পদে, ধনে। ধন-গৌরবে পৃথিবী এখন মাতোয়ারা! কাকেই বা সংযমের কথা বলি, কেই বা শুনে? বিধাতাই জানেন, পৃথিবীর উদ্ধার কবে হইবে!!

কার্ত্তিক, ১৩০২।

* "And Jesus answering said unto them, The children of this world marry, and are given in marriage " St Luke, chap xx, 34

"But they which shall be accounted worthy to obtain that world, and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in marriage " St Luke, chap xx, 35

"And He said unto his disciples, Therefore, I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat , neither for the body, what ye shall put on" St Luke, chap xii, 22

"The life is more than meat, and the body is more than raiment" The same 23

* * * * *

"But rather seek ye the kingdom of God , and all these things shall be added unto you. St. Luke, chap xii 31.

কি চাই, কি পাই ?

দেখিতে দেখিতে নব্যভারতের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। নব্যভারত বলিতে কেবল নব্যভারত পত্রিকার কথার উল্লেখ করিতেছি না, ভারতবর্ষের কথা বলিতেছি। মহামতি রিপনের শুভাগমন হইতে ভারতে নবযুগের আরম্ভ হইয়াছে,—দেশানুরাগের মহিয়সী শক্তিতে ভারত নবজীবন পাইয়াছে,—হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন, জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলন—সুলভ সংবাদপত্র প্রচারের আয়োজন ও আন্দোলন,—সকলই এই সময়ের ফল। এই পঞ্চদশ বৎসর দেখিতে দেখিতে চলিয়া গিয়াছে। উন্নতি যুগের কোলাহলে পড়িয়া, আমরা কি ছিলাম কি হইলাম? আমরা কি চাহিয়াছিলাম, কি পাইলাম?—আজ এক বার ভাবিতে ইচ্ছা হইতেছে! ভাবিতে ইচ্ছা হইতেছে, নব্যভারত ঠিক পথে চলিয়াছে কি না?

বঙ্গদেশের পক্ষে এই পঞ্চদশবর্ষ কি গভীর শোকের কাল গিয়াছে! এই সময়ে, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার, রামকৃষ্ণ, কৃষ্ণদাস, ভূদেব, বিদ্যাসাগর এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিই যে কোন দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবার শক্তি ধারণ করিতেন। আমরা ধন্য যে, ইঁহাদিগের সম-সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; বঙ্গদেশ ধন্য যে, এহেন লোকদিগকে ক্রোড়ে পাইয়াছিলেন। মহাজনেরা বলেন, এক এক জন মহৎ ব্যক্তি শত শত জীবন পরিবর্ত্তনের কারণ। এই সকল মহাজন এই হতভাগ্য দেশের কি কিছুই পরিবর্ত্তন করেন নাই? হতভাগ্য আমরা যে, এই সকল মহাজনদিগকে পাইয়াও বিশেষ কোন উন্নতি লাভ করিতে পারি নাই। কেন পারিলাম না?

অধিকাংশ গ্রাহক এবং বন্ধুদিগের দয়া, অনুগ্রহ, এবং আমাদিগের অপদার্থতার কথা ভাবিলে মনে হয়, আমরা এই পনর বৎসর কেবলই ভূতের ব্যাগার খাটিয়াছি। খাটিয়া খাটিয়া দেহপাত করিয়াও যদি কিছু না পাইলাম, তবে আর কি হইল? কোন মহাত্মা বলিয়াছেন, খাটিলে জীবনোন্নতি হয়। কিন্তু আমাদের খাটুনিতে কিছুই হয় নাই। যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, মনে হয়, আজও যেন সেই স্থানেই আছি। উন্নতি কই, উন্নতি কোথায়? সকল উন্নতির সার উন্নতি, চরিত্র লাভ, তাহা আমাদের

নিকট আকাশ-কুসুম, যেখানে ছিলাম, সেই খানেই আছি। সে দিন এক জন সম্পাদক বলিতেছিলেন, কি হিন্দু, "কি খ্রীষ্টান, কি ব্রাহ্ম—এই বঙ্গের সকলের জীবনেরই বিশেষত্ব এই—ভিতর এক রূপ, বাহির আর এক রূপ। ভাল মন্দ, সকল সমাজেই আছে, কোন সমাজ কোন সমাজকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই।" বাস্তবিক স্থির এবং ধীর ভাবে ভাবিয়া দেখিয়াছি, এদেশের পৌণে ষোল আনা লোকই আজ কাল আন্তরিকতা-শূন্য ও বাহির-সর্ব্বস্ব। আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক, আমাদের অহঙ্কার কিছু বেশী, এক সময়ে মনে করিতাম, আমরা চরিত্রে হিন্দু-সমাজকে পশ্চাতে ফেলিয়াছি। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে নানা ঘটনায় বুঝিতেছি, আমরা "যে তিমিরে, সেই তিমিরেই আছি।" এদেশের লোকেরা সচরাচর যে সকল অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, সময়ে অসময়ে, অবস্থার পীড়নে, আমরাও সে সকল করিতেছি, করিয়া থাকি। সংযমের অভাবে দেশের বৃদ্ধ বিপত্নীকেরা বিবাহ করে, আমাদের মধ্যেও সে দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। দেশের লোকেরা পরশ্রী-কাতর, হিংসা বিদ্বেষে পূর্ণ, আমরাও তাই। দেশের লোকেরা দেনা-পাওনার সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, আমরাও পারি না। দেশের লোকেরা পাশ্চাত্য বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, আমরাও চলিয়াছি। তাহাদেরও কোন কথা ঠিক থাকে না, আমাদের কথারও ঠিক নাই। সেখানে ধন এবং কুলের পূজা, এখানেও দিন দিন তাহার আদর বাড়িতেছে। আর ধর্ম্ম ?—সেখানেও ধর্ম্ম বাহ্য পোষাক, আমরা এখানেও ধর্ম্মকে পোষাকের ন্যায় অবলম্বন করিতেছি। পোষাক বলি এই জন্য, কই ধর্ম্ম অন্তর পরিশুদ্ধ করিতে পারিল ?—কই সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা ও তামসিকতাকে পরাজয় করিতে পারিল ? কই পশুত্ব হইতে আমাকে দেবত্বে উন্নীত করিল ? তুমি যদি নিরপেক্ষ, নির্লিপ্ত, নিশ্চিন্ত সাধক হও, আমাকে ক্ষমা করিও, ক্ষমা করিয়া তোমার পবিত্র পদধূলি আমার মস্তকে দিও। তুমি যদি সংযমে দৃঢ় হইয়া পুণ্য-যজ্ঞে সমস্ত পাপ-রাশিকে ভস্ম করিয়া চরিত্র-বলে বলিষ্ঠ হইয়া থাক, ভাই, এই অধমের প্রতি কৃপা করিয়া তোমার চরণ-ধূলি দিও। আমি পতিত, মলিন, পাপে তাপে জর্জ্জরিত, আমাকে কৃপা করিও। আমি যখন সাধু মহাজনদিগের চরিত্রের কথা ভাবি, তখন দুঃখ, বিষাদে ম্রিয়মাণ হই ;—হায় তাঁহারা বা কোথায় ?—আমি বা কোথায় ? আমি কোন কর্ত্তব্যই পালন করিতে

পারিলাম না, কেবল বাহিরের ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া লোক ঠকাইলাম!! আমার পরিত্রাণের, মুক্তির উপায় কি বলত ভাই? আমি বড় আশা করিয়া ভাই, তোমাদের দ্বারে আসিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, তোমাদের পূত চরিত্রের মাধুর্য্যে, আমি হতভাগ্য, উদ্ধার হইয়া যাইব; কিন্তু হায়, কি দেখিলাম, কি পাইলাম!! সকল কথা খুলিয়া বলিলে, তুমি রাগে অধীর হও, ঘৃণায় রক্ত-বদন হও, আমি বলিতে চাহিলেও পারি না, একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াই। সাত্ত্বিক জীবনাদর্শ তুমি ভাই কই দেখাইলে? দেখাইবে বলিয়া বক্তৃতা করিয়া ডাকিয়াছিলে, কিন্তু দেখাইলে কি? স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থ, নীচত্ব ভুলিয়া মহত্ব, পশুত্ব ভুলিয়া দেবত্ব, জড়ত্ব ভুলিয়া চিন্ময়ত্ব, রিপুর উত্তেজনা ভুলিয়া সংযম পাইব আশায়, তোমার আহ্বানে, আমি কাঙ্গাল, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের মুকুট মস্তকে বহিয়া, আত্মীয়দিগের মায়া মমতায় ছাই ঢালিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলাম। আমি যৌবন-বিষের তাড়নায় ছটফট করিতেছিলাম,—অহঙ্কারে দৃপ্ত, ক্রোধে উদ্দীপ্ত, ঘৃণা বিদ্বেষে যুক্ত, সংসার-সারজ্ঞানে তৃপ্ত, রিপু খেলায় লিপ্ত থাকিয়া মরিতেছিলাম, পুড়িতেছিলাম, জ্বলিতেছিলাম। আমি, অসারের অসারে মণ্ডিত,—ঘৃণিত, মলিন। পরিত্যক্ত, নির্ব্বিত, লাঞ্ছিত হওয়াই আমার পক্ষে সাজে ভাল। দয়া করিয়া কেন আমাকে ডাকিলে?—কেন আমাকে আশার কথা শুনাইলে? যদি ডাকিলে, যদি আশার কথা শুনাইলে, তবে আদর্শ কেন দেখাইলে না? তুমি আমাকে স্পর্শ করিবে, আলিঙ্গন করিবে, আমি অস্পৃশ্য চণ্ডাল সদৃশ, সে আস্পর্দ্ধার কথা বলি না। তুমি পবিত্র হইতেও পবিত্র হইয়া, লাজ-মুক্ত, বাস মুক্ত, অনাসক্ত, নির্লিপ্ত সাত্ত্বিক কর্ম্মী যোগীর ন্যায়, ঐ মুক্তি-মণ্ডপের বাতায়নপথে, আকাশের বিমল চন্দ্রের বিমল প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া, একবার আমাকে আদর্শ দেখাইলেই আমি চরিতার্থ হইতাম। পুস্তকে অনেক ভাল কথা পাঠ করিয়াছি, সাধু সজ্জনদিগের নিকট অনেক সৎ উপদেশ শুনিয়াছি, তাহা আমি জীবনে পালন করিতে অসমর্থ। একবার আদর্শ দেখিয়া আদর্শে মজিতে চাই, একবার আদর্শে আত্মসমর্পণ করিয়া আত্মবলিদান করিতে চাই। আমি উপদেশের, বক্তৃতার, উপাসনার কাঙ্গাল নহি, আমি কেবল আদর্শের কাঙ্গাল। খ্রীষ্টের আত্মত্যাগের কাহিনী, বুদ্ধের রিপু-জয়ের কাহিনী, চৈতন্যের প্রেমভক্তির কাহিনী, ম্যাটসিনীর দেশানুরাগ কাহিনী আমি অনেকবার পাঠ করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে আমার

জীবন লাভ হয় নাই। তাঁহারা মানুষ, না দেবতা, এই সন্দেহে জগৎ মজিয়াছে ; আমি মজিয়াছি, তাঁহাদের কাহিনী অতিরঞ্জিত কি না, এই সন্দেহে। ঐ সকল কাহিনীতে আমার উপকার অনেক হইয়াছে, হইতে পারে, কিন্তু নবজীবন লাভ হয় নাই। আমি চাই দেখিতে, মানুষ কেমন করিয়া পশুত্ব পরিহার করিয়া, ক্রমে ক্রমে, তিলে তিলে, অল্পে অল্পে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মুক্তির ন্যায়, দেবত্বের ঔজ্জ্বল্যে ভূষিত হয়। আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে চাই, কেমন করিয়া নিমাই চৈতন্য হন, শাক্যসিংহ বুদ্ধ হন, যিশু পরিত্রাতা হন। একজন শত জনকে, সহস্র জনকে, লক্ষ জনকে উদ্ধার করিতে পারেন, একথা কখনও অস্বীকার করি নাই। আমিও পূর্ণ আদর্শের পদছায়ায় বসিয়া, নরত্ব পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে চাই। কিন্তু কিছুতেই তাহা পারিলাম না। তুমি ইহার কথা, তাঁহার কথা বর্ণনা করিয়া আমাকে ভুলাইতে চাও। আমি এমনই অসার, তাঁহা শুনিতে শুনিতে আমার কর্ণ বধির হইল, কিন্তু আমার উদ্ধার সাধিত হইল না। আমার মনে সদা জাগিতেছে, যে অন্ধ, সে অন্ধকে কেমনে পথ দেখাইবে ? যে ঘরের অভাব দূর করিতে পারে না, সে জগতের অভাব কিরূপে দূর করিবে ? আন্তরিকতা-শূন্য কপট হিতৈষী কেমন করিয়া অন্যকে দেশানুরাগে অনুপ্রাণিত করিবে ? বুঝিবা, এই জন্যই বক্তৃতায় কিছুই হয় নাই। তোমার পায়ে ধরি, তুমি রাগ করিও না। আমি পঞ্চদশ বর্ষ ধরিয়া তোমাকে, ইঁহাকে, তাঁহাকে, কত জনকে ধরিয়াছি, কত জনের নিকট গিয়াছি, কিন্তু খাটী হৃদয়, খোলা হৃদয়, ভিতর-বাহির-সমান হৃদয়, প্রকৃত সাত্ত্বিক হৃদয় একটীও পাই নাই। সাধে কি আমি নৈরাশ্যের আগুন জ্বালিয়া ভস্ম হইতে বসিয়াছি ? পিতামাতার স্নেহের-বন্ধন যাহার ছিন্ন, সে যে ভালবাসার কত কাঙ্গাল, তাহা তুমি, ঐশ্বর্য্যের দাসানুদাস, কি বুঝিবে ? আমি ভালবাসার কাঙ্গাল, কিন্তু ভালবাসাকেও তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়াছি, দেবত্বের আকর্ষণে। বেশ্যা বাড়ী লোক যায়, সেখানেও ভালবাসা আছে, দশজন একত্র বসিয়া মদ খায়, সেখানেও মিলন আছে, বিশ জন মিলিয়া ডাকাতি করে, সেখানেও নাকি একতা আছে। আমি এরূপ ভালবাসা বা একতা চাই না। আদর্শ ভুলিয়া আমি জটিল, কুটিল, মলিন, অপবিত্র ভালবাসা বা একতা চাই না। যদি তাহারই কাঙ্গাল হইতাম, যাহাদের সহিত রক্তের সংস্রব ছিল, তাঁহাদের স্নেহ ভুলিতাম না। তাঁহাদের স্নেহ-ডোর ছিন্ন করিয়া, দূরে দূরে,

বিদেশে বিদেশে, নির্জ্জনে নির্জ্জনে, একাকীত্বের রাজ্যে কাঙ্গালের ন্যায় বেড়া- ইতাম না। আদর্শহীনতার জন্য বাল্যকাল হইতে কত জনের স্নেহ-ডোর ছিঁড়িয়াছি;—যত লোকের নিকট গিয়াছি, যখনই তাঁহাদের মধ্যে আদর্শ- হীনতা দেখিয়াছি, তখনই ছুটিয়া পলাইয়াছি। সে জন্য তাঁহারা আমার প্রতি আজ কত বিরক্ত! সে জন্য তাঁহারা কত ক্রোধান্বিত!! আমার কোন বন্ধু বলেন, "কেন ভাই, এত শক্রতা বৃদ্ধি কর? দেখিতেছি ক্রমে ক্রমে কত ধীর, শান্তচিত্ত ব্যক্তিও তোমার শক্র হইতেছেন।" আমি এ কথার উত্তরে কি আর বলিব? আমি আদর্শের কাঙ্গাল, আদর্শহীনতা দেখিলেই আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। এ সকল পাগলের খেয়াল শুনিবার লোক বড় অধিক নাই, তাহা আমি জানি। আমাকে পাগল ও নির্ব্বোধ বলিয়া লোকেরা গালাগালি দিতেছেন, তাহা জানি। কিন্তু ভাই, কি করিব, তুমি বল। তুমি কি কোন দিন আমাকে চরিত্রের আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছ? যদি দেখাইয়া থাক, বল, আমি অপরাধ স্বীকার করিয়া তোমার পদানত হইব।

পঞ্চদশ বর্ষ আমি কেবল আদর্শ খুঁজিতেছি। সাহিত্যের সেবা, আমার কেবল কথার কথা, উপলক্ষ মাত্র; আমি লোক খুঁজিয়া, লোক ধরিয়া কেবল অন্তর পরীক্ষা করিতেছি। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এমন লোক সম্মুখে পড়েন নাই, যিনি, পরের সেবা করিতে করিতে আপনার স্বার্থ ভুলিয়াছেন, যিনি অম্লানচিত্তে দেশের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারি- য়াছেন, যিনি চরিত্রে অটল, পুণ্য পবিত্রতায় উজ্জ্বল, যিনি দ্বেষহিংসা ও পরশ্রীকাতরতাহীন, যিনি পূর্ণাদর্শ। এ দেশের অনেক লোকই স্বার্থের দাস, বাহিরে দেশহিতৈষণা বা ধর্ম্মের পরিচ্ছদে ভূষিত, ভিতরে নরকের কীট,—অন্যের চক্ষে ধূলি দিতে, অন্যকে ঠকাইতে দিনরাত্রি ব্যতিব্যস্ত। একজন বন্ধু একদিন বলিতেছিলেন, "গবর্ণমেন্ট আজ কাল পরীক্ষা প্রণালীর ভিতর দিয়া যে সকল শিক্ষিত লোকদিগকে পুলিসে নিতেছেন, তাঁহারা আরো অধিক ঘুষখোর হইতেছেন। পূর্ব্বে দশ টাকায় কার্য্যোদ্ধার হইত, এখন সেই স্থলে ৫০ টাকাতেও কুলায় না।" এ কথা শুনিলে শিক্ষার প্রতি ধিক্কার জন্মে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যেন এ দেশে অসরলতা, চরিত্রহীনতা, বাহ্যাড়ম্বর প্রশ্রয় পাইতেছে। ইহাকে কেহ কেহ কঠোর জীবন-সমস্যার তীব্র দাহন বলিয়া অভিহিত করিতে

চাহেন। যাহা হয়, তাহা হউক, ইহাতে দেশের উপকার এবং উন্নতি হইতেছে, কিছুতেই মনে করিতে পারি না। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের আদর কমিতেছে, ধনের আদর বাড়িতেছে; শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস ভক্তি অন্তর্হিত হইতেছে, সংসার-জ্ঞান বাড়িতেছে। পঞ্চদশ বর্ষে এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। চাহিয়াছি সত্য, পাইয়াছি মিথ্যা; চাহিয়াছি পুণ্য, পাইয়াছি পাপ; চাহিয়াছি স্বর্গ, পাইয়াছি নরক; চাহিয়াছি আন্তরিকতা, পাইয়াছি, বাহ্যাড়ম্বর, চাহিয়াছি দেবত্ব, পাইয়াছি পশুত্ব; চাহিয়াছি সাত্ত্বিকতা, পাইয়াছি রাজসিকতা; চাহিয়াছি অমরত্ব, পাইয়াছি নশ্বরত্ব। কি তীব্র অভিজ্ঞতা!।

এরূপ হওয়ার কারণ কেবল আদর্শের অভাব। আমার নিজ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতেছিলাম, অল্পাধিক পরিমাণে, ঐ সকল কথা সকলের পক্ষে খাটে। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য, ঘরে আদর্শ নাই, স্কুলে আদর্শ নাই, ধর্ম্মমন্দিরে আদর্শ নাই, বক্তৃতা-মঞ্চেও আদর্শ নাই। কথা আছে, কার্য্য নাই; প্রেম আছে, সেবা নাই; শিক্ষা আছে, ভক্তি নাই; স্বার্থ-জ্ঞান আছে, পরার্থপরতা নাই;—এক কথায় আমরা মানুষ, কিন্তু চরিত্রহীন;—পশু অপেক্ষাও হীন! আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য—শয়নে স্বপনে আমরা কেবল চরিত্র-হীনতার কদর্য্য ছবিই দেখিতেছি। বিশাল ভারত ব্যাপিয়া কেবল মহা চরিত্রহীনতার শ্মশানের আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। ইহাকে যদি একতা ও দেশোদ্ধার মন্ত্র বল, নাচার, আনন্দিত হও, নৃত্য কর। আমরা নৈরাশ্যের গহন কাননে নির্ব্বাসিত হইয়া একাকীত্ব সাধনে তৎপর হই।

এ দেশের উদ্ধার হইবে কিসে?—বাহু বলে নহে, ধন বলে নহে, কেবল জ্ঞান বলে নহে, আমাদের বিশ্বাস, ধর্ম্ম ও চরিত্র বলে। প্রাচীন ভারতের বিশেষত্ব, কেবল ধর্ম্ম ও চরিত্র বলে। বাহুবল, ধনবল, জ্ঞানবল—পৃথিবীতে বহু দেশে আছে। বাহুবলে প্রাধান্য লাভ করা আর এ ভারতে সম্ভব কি না, জানি না; বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া ধন বলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি সকলের সমকক্ষ হওয়া ভারতীয়দিগের পক্ষে সম্ভব কি না, অর্থনীতিবিশারদ পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন। আর জ্ঞানবল? সংযম এবং সাধনার অভাবে কখনও প্রকৃত জ্ঞান উপার্জ্জিত হওয়া সম্ভব কি? জ্ঞান, চরিত্রের সহযাত্রী যোগ তপস্যার সহচর। তাহা, এ অবস্থায়, ভারতে অসম্ভবের সম্ভব। যদি কখনও প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, তৎসহ চরিত্রেরও অভ্যুত্থান

হইবে। চরিত্র-বল ও জ্ঞান-বল—দুই ভ্রাতার মিলন হইলে এ ভারতে আর কিছুরই অভাব থাকিবে না। আত্ম-জ্ঞানের উন্মেষ হইলে পর-জ্ঞানের উদয় হয়। আত্ম-পর-জ্ঞানের উদয় হইলে মানুষ সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, কৃষি-বাণিজ্যতত্ত্ব বুঝে। সমাজতত্ত্বে জ্ঞান হইলে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ফাঁকি দেওয়ার ব্যবসা উঠিয়া যায়। যখন প্রতারণা, প্রবঞ্চনা উঠিয়া যায়, তখন মহা প্রেমের আকর্ষণে পরস্পরকে ভাই বলিয়া মানুষ বুঝিতে পারে। তখন একতা-সাধন সহজ হয়। এক সুরে সকলের প্রাণ বাজিয়া উঠে—এক নীতি, এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক কর্ম্মে তখন সকলে প্রমত্ত হয়। তখন!—তখন সেখানে সত্যযুগের আবির্ভাব হয়। তখন মানুষ সত্য অস্ত্রে পাপ অসুরদিগকে বধ করিয়া সোণার পুণ্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। তখন ধন-গৌরব বিলুপ্ত হয়, তখন কেবল পুণ্য, পবিত্রতা, সুনীতি, সুধর্ম্মের কাহিনীতে মানুষ মজিতে থাকে। এখন যাহা অসম্ভব, তখন তাহা সম্ভব হয়। এ সকল, একদিন, এ ভারতে সম্ভব হইয়াছিল; এখন কল্পনা, এখন আকাশ-কুসুমবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। যদি সত্য যুগের আবির্ভাব কখনও হয়, তখন লোকেরা এ সকল কথা বুঝিবে। আমরা চাই, সেই সত্যযুগ দেখিতে। তাহার আশাতেই আছি। যত বয়স বাড়িতেছে, ততই নৈরাশ্য আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু বিধাতার কৃপা নাকি অপরাজিত, কোন্ সূত্রে কি করিবেন, কে জানে? কোন্ সূত্রে আবার কোন্ আদর্শ জাগিবে, কে বলিতে পারে? যত দিন পূর্ণাদর্শ দেখিতে না পাইব, যাহা চাই, তাহা পাইলাম, কিছুতেই মনে করিতে পারিব না। বর্ত্তমান উন্নতিতে তোমরা সুখী হও, আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না। আমি মৃত, নির্জ্জীব, অসার জীব, আমাকে পুণ্য ও পবিত্রতায় ভূষিত করিতে যদি কেহ পার, কাতরে পা ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, ঘৃণা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার সম্মুখে আদর্শ-রূপে দাঁড়াও। আমি দেখিয়া দেখিয়া আত্মহারা হইয়া মরত্ব হইতে অমরত্বে, পশুত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত হইয়া যাই। মা জগন্ময়ী নববর্ষে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

১লা বৈশাখ, ১৩০৫।

আসুর-যুদ্ধজয়ী বীরের কথা।

মানব-জীবন এবং সংসার-প্রাঙ্গণ মহা সংগ্রামময়। অন্তরে এবং বাহিরে অবিরত মহা সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে নর-নারী আকুল, ব্যাকুল এবং অস্থির। দুর্নিবার্য্য তাহার আক্রমণ, দুরতিক্রমণীয় তাহার পরাক্রম, সূচিভেদ্য তাহার তীব্রতা। মহাসংগ্রামে সকলে ত্রাহি ত্রাহি রবে ভুবন পূর্ণ করিতেছে। প্রজ্জলিত চুল্লির তীব্র দাহন, মহা শঙ্কট। মানুষ অবিরত তাহাতে পুড়িয়া মরিতেছে। বুঝিবা এ সংসার রসাতলে যায়।

অন্তরে মহাসমর—শ্রেয় এবং প্রেয়ে,—নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তিতে, বৈরাগ্য এবং আসক্তিতে। শ্রেয়ের, নিবৃত্তির এবং বৈরাগ্যের মহা অস্ত্র—সংযম। প্রেয়ের, প্রবৃত্তির এবং আসক্তির মহা অস্ত্র—মোহ এবং অহঙ্কার। সংযম, ক্রমাগত, তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রের কর্ণধারের ন্যায়, স্বর্গের সোজা পথ মানুষকে দেখাইতেছে,—এক গতি, এক লক্ষ্য, এক পরিণাম—একই মুক্তি। বলিতেছে—"চাঞ্চল্য বিনাশ কর, কঠোর হইতে কঠোর হও, রিপুকে সাধন-যূপ-কাষ্ঠে বলি দেও, তারপর সরল মনে, সরল পথে চল। না-ই বা পাইলে লোকের প্রশংসা, না-ই বা পাইলে জগতের সম্মান, না-ই বা পাইলে ধন-ঐশ্বর্য্য, তাতে কি? ঐ দেখ স্বর্গ, ঐ দেখ মুক্তি, ঐ দেখ ভক্তি, ঐ দেখ প্রেমময়ী মহাবিদ্যা—মা। কি ছার সংসার, উহা ক্ষণ-স্থায়ী, দুদিনের, এ শরীর অস্থায়ী, এ রিপু সকল অস্থায়ী, ইন্দ্রিয়গণ অস্থায়ী। সার এবং নিত্য-কালস্থায়ী যে অবিনশ্বর প্রেম পুণ্য, যোগ ভক্তি, তাহার জন্য লালায়িত হও,—দেখ, দেখ, চাহিয়া দেখ, ঐ বিশ্ব-বিমোহিনী, অরূপ-রূপ-ধারিণী, নিরাকারে সাকারা চিন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি। বল মাভৈঃ মাভৈঃ—কিসের ভয়? রিপুকুলকে বলি দেও, ইচ্ছা এবং বাসনা-দৈত্য সকলকে বিনাশ কর, নিবৃত্তি-নিরাঞ্জনা-তটে স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন দিয়া, দেব-বসন পরিধান করিয়া, নিষ্কাম যোগীবেশে মহামায়ার মহা পবিত্র মন্দিরে প্রবিষ্ট হও।" শ্রেয়ের এই সুমহান, সুপবিত্র, অমোঘ উপদেশ-নির্দ্দেশিত পথে চলিতে কাহার না সাধ হয়? মানুষ অন্তরে মহেশ্বরীর মহাবাণী শুনিয়া দলে দলে ছুটিতেছে। স্ত্রীপুরুষ, জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ, অবিভেদে সকলে দল বাঁধিয়া, মহাপ্রাঙ্গণে ছুটিতেছে। একটী নয়, দশটী নয়—কোটী কোটী নরনারী

সমবেত, কোটী কোটী সম্প্রদায় একত্রিত। মানুষ ভেদাভেদ ভুলিয়া যেন মহাপ্রাণতার বদ্ধ হইয়াছে। সকলে হুঙ্কারে বলিতেছে, মাভৈঃ মাভৈঃ। কিন্তু একি? আসিতে আসিতে সকলেই থামিয়া যাইতেছে কেন? কোটী কোটী লোক যাত্রা করিয়াছিল, লক্ষ্যে আসিল কয়টী—লক্ষ্য ধামে পৌঁছিল কয়টী? হায়, কে যেন সকলকে পথ হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে! সত্য সত্যই পথে মহাসংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে! মার-পিশুনের অত্যাচারে যাত্রিগণ অস্থির। প্রেয়ের মহা দূত মোহ এবং মায়া, পথিমধ্যে যাত্রিগণকে মধুস্বরে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কোথায় যাও? দুগ্ধ-ফেননিভ সুখশয্যা ভুলিয়া, সুখের নিকেতন যুবতী ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় মরিতে যাইতেছ? মানব-শাক্য ফের, ফের, ফের। ঐ পথে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, রিপু-বিচ্যুতি, শরীর-পাত, বিপদ, বিপদ—কেবল বিপদরাশি। ঐ পথে ক্ষুধার আহার নাই, পিপাসার জল নাই, শয়নের শয্যা নাই, ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি নাই—নাই নাই, কিছুই নাই। সুখ নাই, তৃপ্তি নাই, ধন নাই, সম্পদ নাই, গাড়ী নাই, বাড়ী নাই, যশ নাই, সম্মান নাই; আছে কেবল কষ্ট, দুঃখ, এবং বিপদ। কেন মত্ত মাতঙ্গের মত ধাইতেছ? ফের, ফের। এ রাজ্যে আমি তোমাকে রাজা করিয়া দিব। রিপুর পরিচর্য্যার জন্য দাস দাসী দিব, বিলাসের উপযোগী আতর দিব, গোলাপ দিব, আর কি চাও? যশ দিব, মান দিব, গাড়ী দিব, বাড়ী দিব। ফের ফের, দশের মধ্যে এক মহাজন হইয়া থাক।" মানুষ চাহিয়া দেখিল, কি একটা মনোমুগ্ধকর মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া মোহন সুরে এই সব কথা বলিতেছে। আর কি পা চলে! কুহক-মন্ত্রে সে যেন হতজ্ঞান, আসিতে আসিতে দাঁড়াইতেছে, কেহ পলাইতেছে, কেহ অগ্রসর হইতে হইতেও ভাবিতেছে। এই স্থলে সংযম এবং অহঙ্কার ও মোহের ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে। এই মহাসমরে—মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, সব লোপ পাইতেছে! শেষে অনেক মানুষই পরাজিত হইতেছে। আসিতে আসিতে ফিরিয়া যাইতেছে পৌণে ষোল আনা লোক। লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছে, এ জগতে কয় জন? —অঙ্গুলির কর গণিয়া তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই ত গেল ভিতরের যুদ্ধ। বাহিরের যুদ্ধ ইহারই প্রতিরূপ; কিন্তু আরো ভীষণতর। ভিতরে যাহার উপদেশ, বাহিরে তাহার কাজ। দলে দলে লোক ধর্ম্ম-মন্দিরে আসিতেছিল, পথে কাহাকেও সুন্দরী স্ত্রীর প্রলোভনে,

কাহাকেও অধর্ম্মের কুহক মন্ত্রে ভুলাইয়া নরকের পথে লইয়া যাইবার জন্য পাপ দস্যুগণ অবিরত চেষ্টা করিতেছে; টানাটানিতে সকলে অস্থির।· কেহ বায় আনা পথ আসিয়া বৃদ্ধ বয়সে শেষে যুবতীর প্রণয়ে পড়িয়া মারা গেল, কেহ বা টাকায় মায়ায় দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিয়া, নির্ম্মম রাস্তার গগনভেদী বড়মানুষী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ধনে মানে পূজিত হইতে লাগিল। ভিতরের যুদ্ধের আড়ম্বর নাই, শব্দ নাই—কিন্তু বাহিরের যুদ্ধের আড়ম্বরে ও হুজুগ-শব্দে জগৎ পরিপূর্ণ। ভীষণ সংগ্রাম। কেহ দেহে গৈরিক জামা আঁটিয়া, গৈরিক পাগড়ী মাথায় দিয়া ধর্ম্মমন্দিরে যাইতেছিলেন, অমনি আসক্তি-সিপাই ও চৌকিদার তাঁহাকে কাণে ধরিয়া গাড়ীতে চড়াইয়া, প্রশংসা-যশের মুকুট মস্তকে তুলিয়া, মহাবাদ্য সহ, আসক্তির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাইয়া বেড়াই-তেছে; এবং জগৎকে দেখাইতেছে, কার শক্তি কত? কেহ স্ত্রীপুত্র পরি-ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যে যাইতেছিলেন—প্রবৃত্তি তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া সহস্র নারীর এক পতি করিয়া বিলাসের মধ্যে শোওয়াইয়া দিতেছে! এবং দেখা-ইতেছে, কার শক্তি কত? কেহ ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া, চিরকৌমার-ব্রত লইয়া বক্তৃতার চোটে গগন ফাটাইত, আজ সংসার-যোগ-মন্দিরে তাহাকে রমণীর পদতলে লুণ্ঠিত করিতেছে। কেহ প্রতিবাদরূপ মহাঅস্ত্র হস্তে করিয়া পাপী দমনের জন্য ধর্ম্মের সহরে ঢুকিয়াছিলেন, আজ তিনি মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় পাপপঙ্কে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, এবং নিজ স্বভাব দোষে, তবুও, আজও, অন্যের নিন্দা করিয়াই স্বীয় স্বভাবের পরিচয় দিতেছেন! মহারাজ্যে মহাসমর—মহাসংসার-চক্র-ব্যূহে শত শত অভিমন্যু মহারথী প্রাণ হারাইতে-ছেন! সংসারটা যুড়িয়া এখন যেন কেবল দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে। জয় পরাজয় বিধাতা অন্তরীক্ষে থাকিয়া লিখিতেছেন। মহাচক্রীর মহালীলা!

পাঠক, ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখ—কথাগুলি সত্য কি না? তোমার অন্তরে বাহিরে মহা সংগ্রাম চলিয়াছে কি না? তুমি যাহা করিবে ভাবিতেছ, করিতে পারিতেছ কি? না, পদে পদে বাধা পাইতেছ? বলত, পদে পদে তোমাকে প্রবৃত্তি কুলের হস্তে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হইতে হইতেছে কি না? ভাবিয়া বলত, যাহা বলিতেছি, তাহা ঠিক কি না?

পৃথিবীর ধর্ম্ম-ইতিহাস একথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই যে, যুদ্ধে পুণ্যবলেরই জয় হইতেছে। অসংখ্য জাতি এবং সম্প্রদায় আসুর-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া মরণের পথে যাইলেও, এখনও পুণ্যবলের শক্তি অপরাজিত।

কিন্তু সে পুণ্যরাজ্য এবং সে পুণ্যজাতি আজ কোথায়, সেখানে কেবল সংযমের জয়, মোহ এবং অহঙ্কারের পরাজয়। আমি খুজিয়া খুজিয়া হয়রাণ হইলাম, সে রাজ্যের খোজ খবর পাই না। হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান, সব সম্প্রদায় খুজিয়া দেখিয়াছি, সেই অনাবিল, অপরাজিত, বিমল পুণ্যজ্যোতি অতি অল্পই দেখিয়াছি। নবোত্থিত ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের কথাই বল, এবং পুনরুত্থিত হিন্দু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কথাই বল, পুণ্য-জ্যোতিতে যাঁহার বদন উজ্জ্বল হইয়াছে, মহাসংযমে যাঁহার রিপুকুল ধ্বংশ হইয়াছে, চরিত্রের অজেয় সিংহাসনে যে দৃঢ় এবং অটল, নির্ব্বিকার এবং নিরলস, এমন লোকের সহিত অতি অল্পই সাক্ষাৎ হইয়াছে। গেরুয়া পরিয়া ধনের পুটুলি লইয়া বিলাস গাড়ী হাঁকায়, এমন যোগী দেখিয়াছি, যুবতীর চরণে চরিত্র উৎসর্গ করিয়া মহাজনত্ব পায়, এমন ধার্ম্মিকও (?) দেখিয়াছি,—দীর্ঘ তিলকধারী, নিরামিষ-ভোজী, পরধনলুণ্ঠনকারী বৈষ্ণব দেখিয়াছি, দীর্ঘ উপাসনা-সম্বল হিংসুক, নিন্দুক, কপট, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী ভণ্ড তপস্বী দেখিয়াছি, কিন্তু এমন লোক খুব কম দেখিয়াছি, পাপে পরাজিত হওয়া যাঁহার পক্ষে অসম্ভব, যিনি খ্রীষ্টের ন্যায় বিশুদ্ধ চরিত্রে চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া, কেবল পরসেবায় এবং পরচিন্তায় জীবন কাটাইতেছেন। ধর্ম্ম, কথায়, উপাসনায়, বক্তৃতায়, পোষাক পরিচ্ছদে, না চরিত্রে এবং জীবনে, তুমি ভাই বলিতে পার কি ?

সুদীর্ঘ জীবনপথ খুজিয়া খুজিয়া দুই দশ জন আড়ম্বরহীন, জীবন্ত, জয়ী সাধকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে মাত্র। আর যত দেখি, সব যেন সংসার-সংগ্রামের পরাজিত জীব। আজ এক বারের কথা বলিতেছি। একজন পবিত্র লোক—তিনি চিরকুমার,এখন তাঁহার কাল চুল দাড়ি শ্বেত হইয়াছে—এবার কলিকাতায় মাঘোৎসব দেখিতে আসিয়াছিলেন। যখন পূর্ণ উৎসাহে মাঘোৎসব চলিতেছে, এমন সময়ে তাঁহার একজন "বসুধৈব কুটুম্বকম্" আত্মীয়ের দারুণ জ্বর হয়। মাঘোৎসব কোথা দিয়া চলিয়া গেল, তিনি ঐ রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অহরহ কেবল শুশ্রূষা করিতেছেন। সভা হইল, সমিতি হইল, কত উপাসনায় কত জনের প্রাণ সরস হইল, কত বক্তৃতার স্রোত বহিল, কত ইভিনিং-পার্টিতে আমোদ চলিল, বৃদ্ধের উৎসবক্ষেত্র ঐ রোগীর শয্যা। আজ ফাল্গুন মাসের ১০ তারিখ, আজ তিনি "বসুধৈব কুটুম্বকম্" দেশে যাত্রা করিলেন।। উল্লাস নাই, নৃত্য নাই,

বক্তৃতা নাই, কথা নাই,—নীরব আড়ম্বরহীন একটী বৃদ্ধ কেবল দরিদ্রের সেবা, কেবল পরসেবা করিয়া ধন্য হইতেছেন। সাধন তাঁহার পরসেবা, যোগ তাঁহার পরসেবা, বক্তৃতা তাঁহার পরসেবা—জীবন তাঁহার পর-সেবা। খাটিয়া খাটিয়া, কেবল পরের জন্য খাটিয়া খাটিয়া জীবন প্রায় শেষ করিয়াছেন। তাঁহার নাম এদেশের বড় কেহ জানে না। তাঁহার কথা বড় কোন সংবাদ পত্রে উঠে না। তিনি যে দলে, তাঁহাকে লইয়া সে দলও বড় উচ্চবাচ্য করে না। গাড়ী নাই, বাড়ী নাই, সহায় নাই, সম্বল নাই, তিনি গরিব, তিনি অতি গরিব। তাঁহাব মান নাই, সম্মান নাই, তাঁহার আহার সামান্য—কেবল কতকগুলি শুধু ভাত বলিলেই হয়। পরিধান সামান্য—কেবল সামান্য থানের কাপড়। আকৃতি চেহারা, কিছুই ভাল নহে। তিনি বড় গরিব, সব বিষয়েই তিনি বড় গরিব। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, তিনি যেন জীবন সংগ্রামের মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আসিয়াছেন। আসুরসংগ্রামে কেহ কখনও তাঁহাকে পরাজিত হইতে দেখে নাই। তাঁহাকে দেখিলে, বোধ হয় যেন, তাঁহার শ্বেত শ্মশ্রু ভেদ করিয়া কি এক স্বর্গীয় পবিত্রতার জ্যোতি বাহির হইতেছে। মুখে কথা নাই, তবু যেন তাহাতে শাস্ত্র আছে; হাতে করতালি নাই, কিন্তু কাজে ভরা, সে জয়ী বীর মৃত্যুময় রাজ্য ছাড়িয়া এক অমৃত এবং অমর রাজ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। দেখিয়া দেখিয়া, আমি সে অপরূপ দেখিয়া দেখিয়া মজিয়াছি। তিনি দেশবিখ্যাত বিবেকানন্দ নহেন, তিনি অমর ভক্ত কেশবচন্দ্র নহেন, তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নহেন, তিনি নেতা শিবনাথ নহেন, তিনি যোগী বিজয়কৃষ্ণ নহেন, তিনি বড় গরিব, তিনি বড় গরিব। তিনি যেন রিপু জয় করিয়া অমূল্য সংযমব্রতে দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ। শুনিয়াছি, তিনি যে স্থানে থাকেন, সেখানকার লোকেরা ঋষি বলিয়া তাঁহাকে সম্মান করে। ব্রাহ্মসমাজের আর সব লোককে যাহারা নিন্দা করে, তাহারাও তাঁহার নাম শুনিলে মস্তক অবনত করে। তিনি চরিত্র-গুণে অমর ভুবনমোহনরূপে প্রতিষ্ঠিত। সেই গরিব, এই ধরায় যেন কি এক নিত্যানন্দ-ময় বস্তু লাভ করিয়া মহাবীর হইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, পরিবার নাই,—জগতের সবই যেন তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার। তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে কোটী কোটী প্রণাম।

আমি সংসারে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিই, যিনি অতীন্দ্রিয়ত্ব পাইয়াছেন,

যিনি অসার ছাড়িয়া সার ধরিয়াছেন, যিনি নিজ ইচ্ছা এবং নীচ বাসনাকে পরাজয় করিয়া দেব ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। তিনি রামকৃষ্ণই হউন, বা তিনি শাক্য-সিংহই হউন, তিনি মেরী-তনয় যিশুই হউন, বা তিনি ম্যাট্‌সিনিই হউন, তাঁহাকে কোটী কোটী প্রণাম। আর আমি, তুমি, সে, যাহারা কেবল স্রোত-তাড়িত শৈবালের ন্যায় প্রবৃত্তিতাড়নায় ভাসিয়া ভাসিয়া সংসারের ঘাটে ঘাটে, তটে তটে ফিরিতেছে, তাহারা নীচ হইতেও নীচ, দীন হইতেও দীন। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে সংসার-সংগ্রামে পরাজিত হইতেছি এবং অহঙ্কারে জগৎ কাঁপাইয়া নিজ নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতেছি। আমাদের টাকা কড়ি, যশ মান, বিদ্যাবুদ্ধিতে ছাই পড়ুক। যাহাতে আমাদিগকে অমর করিতে পারে না, তাহাকে আদর করিয়া বৃথা জীবন কাটাইলাম। প্রবৃত্তি-সাগরে ভাসিলাম, কিন্তু নিবৃত্তি হ্রদে ডুবিলাম না। মোহে মজিলাম, কিন্তু সংসারের অতীত হইতে পারিলাম না। পরাজিত হইতে জন্মিয়াছি, প্রবৃত্তিকুলের দ্বারা পরাজিত হইতেই লাগিলাম। আমাদের সাধন ভজন সবই ভণ্ডামী নহে কি? অটল ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া, প্রবৃত্তিকে পরাজয় করিয়া, সংযমকে এক মাত্র সহায় করিয়া যে ব্যক্তি যশ মানের অতীত ধামে নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত এবং নিরলস না হইতে পারিল, তাহার কার্য্য কি মহাছেলেমী নয়? কে বলিবে, নয়?

ফাল্গুন, ১৩০৩।

বিয়োগ ও যোগ।

১৩০৩ সাল অতীতের কোলে মাথা লুকাইয়া আজ জিজ্ঞাসা করিতেছে, "আমি ত চলিলাম, কিন্তু রাখিয়া গেলাম কি?" বিয়োগ এবং যোগের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া এ প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে?

শীতের তীব্রতা আর নাই, চতুর্দ্দিকে যেন অগ্নি ছুটিতেছে। গাছে গাছে নূতন পাতা,—ঠিক একই সময়ে, যেন কাহারও ইঙ্গিতে, বৃক্ষলতা অপরূপ সাজে সাজিয়াছে—কোকিলের সুর ফিরিয়াছে—মধুর, মধুরতর বসন্ত অন্তে সমগ্র প্রকৃতি আজ নূতন। প্রান্তরের শ্যামলতা দিন দিন নূতনতর হইতেছে—সবুজ-রং চতুর্দ্দিকে তরল হইতে ঘন, ঘন হইতে ঘনতর হইতেছে। এইরূপ সাজে প্রকৃতিকে সাজাইয়া বৎসরটা চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু দিয়া

গিয়াছে কি? সে ত যেমন যাইবার, বেশই গিয়াছে, অন্তরে বিষের জ্বালা ধারণ করিয়াও বিরহী যেমন হাসি-মুখে কথা বলে, ব্যস্ততার সহিত চলে ফেরে, সূক্ষ্মদর্শীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে না পারিলেও, যেমন, স্থূলদর্শীর নিকট পূর্ব্ববৎই প্রতীয়মান হয়, তেমনই, গত বৎসরটা হাসিমুখেই গিয়াছে,—জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলন তরঙ্গ-টুক বুকে করিয়া, বিবেকানন্দের মাতৃভূমির স্নেহালিঙ্গন-উল্লাস-টুকু হৃদয়ে পুরিয়া সে বেশই গিয়াছে। যেমন হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিল, তেমনি হাসিতে হাসিতে গিয়াছে। কিন্তু রাখিয়া গিয়াছে কি? যাহা ফেলিয়া গিয়াছে, তাহা শীতের তীব্রতা এবং গ্রীষ্মের প্রদাহ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, বিরহীর অন্তরের উত্তাপ অপেক্ষাও মর্ম্মপীড়ক, তাহা অত্যাচারীর প্রজ্জলিত অগ্নি-শিখার নির্ম্মম তাপ অপেক্ষাও হৃদয় বিদারক। তাহা তীব্র, তাহা অতি তীব্র। তাহা শোকের হা হুতাশ এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাসে পূর্ণ।

প্রকৃতি যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। বসন্ত সমাগমে নূতন পল্লবের উদ্গম, ইহাতে নূতনত্ব কি? সূর্য্য তেমনি উঠিতেছে, তেমনি অস্ত যাইতেছে। চন্দ্র পূর্ব্বেও যেমন, আজও তেমনি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারাশি জগতে ঢালিতেছে। নির্মেঘ আকাশে হাসিয়া হাসিয়া, ফুটিয়া ফুটিয়া, প্রতি রজনীতেই কোটী কোটী নক্ষত্র পূর্ব্ববৎ খেলিতেছে। মলয়ের কথা বল, সে ত প্রতি বৎসরই আগমন করে।—আগমন করে, শীতল করে, সুখী করে, আবার যায়, আবার যায়। তাহাতেই বা নূতনত্ব কি? সময়, বালককে যুবক করে, পিতা মাতার ভালবাসা ছিন্ন করিয়া প্রণয়িণীর জন্য যুবককে পাগল করে, মাতায়, তাহাই বা নূতন কি? চিরদিনই জগতে এরূপ হইয়া আসিতেছে। যোগ এবং বিয়োগ, অথবা বিয়োগের পর যোগ—এ জগতের প্রাত্যহিক ব্যাপার, তাহাতে নূতনত্ব কি? সখ্যপ্রেম এ জগতে কত মধুর। সখার মুখশ্রী দেখিয়া দেখিয়া মানুষ কত তৃপ্তি পায়। বন্ধুর ধারে বসিয়া, অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া, গলা ধরাধরি করিয়া সখা কত সুখ পায়। বন্ধুর কথা বন্ধুর নিকট কত মিষ্ট, কত মধুর। আর রূপ সে চায় না, আর কথা সে শুনিতে ভালবাসে না—দিবানিশি বিভোর। আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে সে তন্ময়। এক চিন্তা, এক ধ্যান, এক জ্ঞান, কিন্তু এ যোগও চিরস্থায়ী নয়। ইহাও সময়ে তিক্ত হয়,—আর—আর মোটেই ভাল লাগে না।

বন্ধুত্বের হাটেও নূতন এবং পুরাতনের সমাগম আছে। পুরাতনের আদর কমিতেছে, নূতনের আদর বাড়িতেছে।*

সময় মানুষকে এমনই করে, এক সময়ে যে বন্ধুর দর্শন ভিন্ন, সহবাস ভিন্ন, মুহূর্ত্ত প্রাণ ধারণ অসম্ভব, সেই বন্ধুকে আর এক সময়ে দেখিলেই বিরক্তি উপস্থিত হয়। ইহাও জগতের প্রাত্যহিক ব্যাপার। নবীন, তরল মধুর মিলনে কত বিহ্বলতায় মানুষকে মাতায়, কিন্তু হায়, আবার তাহা—তাহাও তিক্ত হইয়া যায়। যোগে সুখ, না বিয়োগে তৃপ্তি, আমি ভাবিয়া অবাক্ হইয়াছি, কিছুই স্থির নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। তবে একটা কথা ঠিক বুঝিয়াছি, অতীত এবং বর্ত্তমান, বিয়োগ এবং যোগ যুগলের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি—অবস্থার বিপর্য্যয়, ঘটনার বিবর্ত্তন, সুখ এবং তৃপ্তির হেতু না হইলেও, মনুষ্যত্ব লাভের সোপান বটে। পাপ, পুণ্যলাভের সোপান, মরণ, জীবন লাভের সোপান, দুঃখ, সুখ লাভের সোপান, শীত বসন্ত লাভের সোপান ; অন্ধকার জ্যোতি লাভের সোপান ; বিয়োগ, যোগ-ধাম লাভের সোপান। আমি হইলামই বা পাপী, রহিলামই বা মৃত্যুকোলে পড়িয়া দুঃখ সহিতে, কিন্তু আমার ভাগ্যে আর কি পুণ্য এবং নব-জীবনের অভ্যুত্থান সম্ভব হইবে না? আমি কেবল বিচ্ছেদই গণিতেছি—যায়, যায়, সবই যায়। যে কাছে আইসে, সে-ই দু দণ্ড না দাঁড়াইয়া, দূরে, অতি দূরে, নির্ম্মমতার বাজারে চলিয়া যায়—কেহ পরলোকে পলায়ন করে, কেহ অধর্ম্ম, অন্যায় এবং স্বেচ্ছা-অশাসনের রাজ্যে চলিয়া যায়। কি দারুণ বিচ্ছেদ, একজনেরও মধুর ভালবাসা হৃদয়কে সরস করে না, স্নিগ্ধ করে না। হায়, আমি কি শীতের নির্ম্মম বিচ্ছেদ-প্রহরণের জন্যই জন্মিয়াছি? তুমি তাহা কখনও বলিতে পার না। তুমি বড়, তুমি ধনী আছ বা থাকিবে বলিয়া চিরদিনই আমি ছোট এবং নির্ধন থাকিবার জন্য জন্মিয়াছি কি? যে অবস্থাই হউক, যে ঘটনাই ঘটুক, চিরদিন তাহা স্থায়ী নয়। অবস্থার বিপর্য্যয়, ঘটনার বিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। অবশ্যম্ভাবী এই জন্য, কেননা, ইহাই মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায়। বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টিলীলা-রহস্য। ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, পাষাণ চক্ষু বিদারিয়া জল পড়ে।

* "Men cease to interest us when we find their limitations * * Infinitely alluring and attractive was he to you yesterday, a great hope, a sea to swim in, now, you have found his shores, found it a pond, and you care not if you never see it again" *Emerson*

[illegible] কত দিন দিয়াছে কি? যাহা রাখিয়া গিয়াছে, তাহা [illegible] চির মনে অঙ্কিত এবং অক্ষয় হয়। কোন বৎসর, কোন যুগ, [illegible] আজো এমন নিদারুণ ঘটনারাশি রাখিয়া যায় নাই। ১৩০৩ সাল [illegible] দুর্ভিক্ষময়।

ঘটনার জন্যই বৎসর চিরস্মরণীয়। মহাজনদিগের জন্মের জন্য [illegible] বৎসর স্মরণীয় হইয়াছে, তিরোধানের জন্যও কত বৎসর পূজ্য? জলের বুদ্বুদের ন্যায় সময় সাগরের মাস বৎসর যুগ শতাব্দী অনেক আসে, অনেক উঠে, অনেকই যায় অনেকই বিলীন হয়। কদাচিৎ কোন কোন ঘটনায় কোন কোনটাকে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। ইতিহাস আর কিছুই নয় উহা কেবল অনন্ত সময়ের বক্ষে স্মৃতির ফুটনোট মাত্র। বিশেষ বিশেষ ঘটনাতেই সময় জীবিত জাগ্রত এবং স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত, নচেৎ কত ব্যর্থ মুহূর্ত এ জগতে গিয়াছে কে তাহার গণনা করিয়া রাখিয়াছে? অনন্ত মুহূর্ত সাগরে ইতিহাস দুই দশটী মুহূর্তের কথা লিখিয়া রাখিয়াছে মাত্র। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক সু এবং আর অর্দ্ধেক কু। অর্দ্ধেক বিয়োগের কথা অর্দ্ধেক যোগের কথা, অর্দ্ধেক দুঃখের কথা, আর অর্দ্ধেক সুখের কথা, অথবা অর্দ্ধেক মরণের কাহিনী, আর অর্দ্ধেক জীবনের কাহিনীতে পূর্ণ। খ্রীষ্টের জন্মের জন্য একটা বৎসর স্মরণ যোগ্য হইয়াছে মরণের জন্যও আর একটা বৎসর স্মরণ যোগ্য হইয়াছে। বিয়োগে দুঃখে মরণে আমরা কাঁদি, কিন্তু বিয়োগ দুঃখ এবং মরণ ভিন্ন কি যোগ সুখ এবং জীবনের অভ্যুত্থান সম্ভব? সু বা কাহাকে বল, কু বা কাহাকে বল সকল ঘটনাই বিধাতার লীলা চক্র ব্যুহ,—সকলই স্মরণ্য, সকলই বরণ্য সকলই উন্নতির মূল।* কু' যাহা, তাহা কেবল "সু" য়ের সোপান মাত্র। খ্রীষ্টের জন্মে, না খ্রীষ্টের মরণে পৃথিবীর অধিক উন্নতি হইয়াছে, তুমি বলিতে পার কি? বলিবে জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই ত তিনি মরিয়াছিলেন। জন্মে অনেকেই। খ্রীষ্টের জন্মের কাহিনী অনেকের জন্মের কাহিনীর ন্যায় মানুষ ভুলিত, ভুলিতে পারিত, কিন্তু [illegible]

* "There is no virtue which is final all are initial. The virtues of society are vices of the saint * * * Whilst the eternal generation of circles proceeds, the eternal generator abides, abides." *Emerson.*

মৃত্যু—ক্রুশে তাঁহার দেহত্যাগ—পৃথিবী ভুলিতে পারে নাই পারিবে না। ভুলিতে পারা অসম্ভব ; এই জন্যই খ্রীষ্টের দেহত্যাগেই পাপীর পরিত্রাণের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা এবং আশা সুলভ হইয়াছে। বাঁচিয়া থাকিতে খ্রীষ্টের বড় জোর শত জন অনুচর বা শিষ্য ছিল। মরণান্তে কোটী কোটী শিষ্য হইয়াছে। মরণে কি জীবনের কথা নাই ?

অাগষ্টাইন মহাপাপী ছিলেন। এমন কুকার্য্য ছিল না, যাহা তিনি করেন নাই। এই বিচিত্র পাপের পথে বা মরণের পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়াই শেষে তিনি নবজীবন পাইয়াছিলেন, যখন একথা ভাবি, তখন বলিতে লজ্জা হয় না যে, মানুষের অযোগ্য পাপরাশিতে না ডুবিলে বুঝি বা আগ ষ্টাইন, ঋষির জীবন পাইতেন না। আমাদের দেশের জগাই মাধাই সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। কেবলই উন্নতির পথে চলিতেছেন, কেবলই সৎ হইতেছেন, পতন বা মরণ এক দিনও ঘটে নাই এমন লোক জগতে আছে কি ? কপটী ধার্ম্মিক, প্রতারক ভক্তের কথা শুনিব না তাঁহারা ধর্ম্মের ব্যবসা করেন, ধর্ম্ম কি, মোটেই বুঝেন না। এমন ধার্ম্মিক জগতে নাই, পাপ যাঁহার অচিন্ত্য বা অস্পৃশ্য। মহাত্মা কেশবচন্দ্র বলিতেন তিনি যত অগ্রসর হন, ততই প্রখর পাপ বোধ—তাঁহার অস্থিমজ্জা পাপে জড়িত, মনে হয়। অভাব বা অপরাধ জ্ঞান না থাকিলে বিনয় আইসে না, অহঙ্কার বিনাশ হয় না। অহঙ্কার বিনাশ না হইলে ধর্ম্মের উদয় হয় না। আমি অতলে ডুবিয়াছি, মরিয়াছি, এই রূপ জ্ঞানের উদয় হইলে তবে অনুতাপ উপস্থিত হয়। অনুতাপের পর, আত্মত্যাগের পর, তবে ধর্ম্ম এবং চরিত্রের উদয় হয়। এই জন্য মহাত্মা চ্যানিং বলিতেন যে, পতনই উন্নতির সোপান।*

---

* I say that I see in crime itself the proofs of human greatness and of an immortal nature * * It has its origin in the noblest principle that can belong to any being I mean in moral freedom There can be no crime without liberty of action, without moral power Were man a machine, were he a mere creature of sensation and impulse, like the brute, he could do no wrong * * * Now the great design of temptation plainly is that the soul, by withstanding it should gain strength should make progress should become a proper object of divine reward That is, man sins through an exposure which is designed to carry him forward to perfection, so that the cause of his guilt points to a continued and improved existence" —*W C Channing, D D*

পতনে কি নবজীবনের মন্ত্র নাই? থাকুক বা না-ই থাকুক, দর্শনের একথাও আজ রাখিয়া দিয়া যাই। নির্ঘম নিষ্ঠুর ঘাতকতা পূর্ণ শতাব্দী সময়ে ভারতের উন্নতির বীজ বপন হইয়াছে, একথা ঠিক কিনা, সে বিচারে কাজ নাই। আমরা ভাবিতেছিলাম, ১৩০৩ সালের কথা। ছেয়াত্তর সাল যদি বঙ্গে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া থাকে, ১৩০৩ সালও তবে ভারতে চিরবিখ্যাত হইয়াছে। স্মৃতিতে চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে,—১৩০৩ সালের ন্যায় সর্ব্বসংহারক, সর্ব্ব হৃদয় বিদারক বৎসর এ ভারতে আর আইসে নাই। মহামারী ভারতে অনেকবার হইয়াছে। দুর্ভিক্ষও অনেক বার দেখা দিয়াছে কিন্তু দুই যমজ ভাই এমন বীরবেশে ভারতে আর কখনও উপস্থিত হয় নাই। ভারতের নিদারুণ সংবাদে আর্ত্তনাদে পৃথিবীর প্রাণ আজ বিচলিত। সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, এমন দুর্দ্দিন ভারতে আর কদাপি আইসে নাই। এমন সর্ব্বনেশে বিকট মহামারীও আর হয় নাই, এমন সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষও আর হয় নাই। ১৩০৩ সাল ইতিহাসের বক্ষে চির স্থান পাইয়াছে।

১৩০৩ সালে কত গৃহ শ্মশান হইয়াছে ভারতের অসংখ্য পল্লীতে তাহার অলিখিত বিবরণ রহিয়াছে। সামান্য সামান্য বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইতেছি—কিন্তু বিবরণ নাই—সহস্র সহস্র নিদারুণ ঘটনার। যদি কাহারও প্রাণে ভালবাসা থাকে আর সেই ভালবাসা যদি দেশানুরাগে রঞ্জিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার পক্ষে ক্রন্দন—কেবল ক্রন্দনই নিত্যক্রিয়া হইয়াছে। কিন্তু সেরূপ প্রাণী কি এদেশে আছে? এই দারুণ দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে পয়সার খাতিরে লোক চাকরী করিতে যাইতেছে শুনিতেছি, কেহ কেহ বলিতেছে, পয়সা রোজগারের এমন সুন্দর সময় আর জুটিবে না। ইহাও শুনিতেছি, ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত নরনারীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াও লোকেরা পয়সা রোজগার করিতেছে। মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস পাপ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব কি? অনেক লোকই পাপ করিয়া থাকে কিন্তু ইহা সামান্য পাপ নহে—ইহা পশুরও অযোগ্য কাজ। শুনিতেছি ভারতে এরূপ জঘন্য অপহরণ কাজও চলিতেছে। বলিব কি, আমাদের সকল কথা বন্ধ হইয়াছে। এক শ্রেণীর লোক পয়সা রোজগারের উপায় পাইতেছেন, আর এক শ্রেণীর লোক নাম কিনিবার সুযোগ পাইয়াছেন। প্রায়ই সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া থাকি, অমুক মহারাজা প্রজাদের জন্য লক্ষ

টাকা দান করিয়াছেন ; দান করিয়াছেন, নিজে ধন্ত হইয়াছেন। কিন্তু সত্যই দান করিয়াছেন, না কেবল নাম কিনিবার সুযোগ খুজিতেছেন ? অনুসন্ধানে জানিতেছি—অনেক বিবরণই মিথ্যা,—জলাশয় খননও নয়, অন্নদানও নয়, কেবল নাম কেনার ফন্দি। এদেশে দরিদ্র অসংখ্য ; কিন্তু ধনীর সংখ্যাও কি কম ? দরিদ্রের রক্ত জমাট হইয়া যে সকল ধনীর অট্টালিকা, গাড়ী ও ঘোড়ার আকার বা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে তাহাদের সংখ্যাও কি এ ভারতে কম ? কিন্তু লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় আজ এই অসময়ে, বেদেশীয় লোকেরা যেমন মুক্তহস্তে ভারতকে রক্ষা করিতে অগ্রসর, এদেশের ধনীরা তেমন নন। দারিদ্র্যের কারণ ইংরাজ, তাহারা লুণ্ঠন করিয়াছে সকল ধন অপহরণ করিয়াছে ও ই অন্যায়ের তীব্র ভর্ৎসনার এ সময় নহে। মানুষ তুমি যদি মানুষ হও তবে যাহার যে শক্তি আছে, তাহা নিয়োগ কর। ধনীর শেষ কপর্দ্দক ঢালো। এমন পবিত্র সুযোগ আর পাইবে না। সেবা ব্রতে জীবনের আরম্ভ—সেবা ব্রত লইয়া আজ জীবনকে ধন্য কর। কত জনক জননী ভাই ভগিনী এই ভাবতে আছেন, তাঁহারা আজ কি নীরব থাকিবেন ? কত হিতৈষী কংগ্রেসের দিন অভ্যুত্থিত হন তাঁহারা কি আজ নীরব থাকিবেন ? হায় তাঁহারা কি আজ গাজনের সন্ন্যাসীর ন্যায় ভণ্ড হিতৈষী নামের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে নিশ্চিন্ত রহিবেন ? কিন্তু হায় সকলই নীরব—জুবিলির জন্য দুই একটা সভা সমিতির কথা পাঠ করিতেছি কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উত্তেজনায় আহূত সভা সমূহ বাদ দিলে স্বতঃপ্রবৃত্ত দুর্ভিক্ষ নিবারণের সভার বিবরণ একটীও পাঠ করিতেছি না। কি দুঃখের কথা কি পরিতাপের কথা !! হিতৈষী নামটী এদেশের কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষিপ্ত হউক। গবর্ণমেণ্ট করিতেছেন বলিয়া আমাদের আর কর্ত্তব্য নাই যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলেও কোন দুঃখ নাই। ভারত ভণ্ডহিতৈষীর দল লইয়া আর কতদিন মত্ত হইবে ?

পৃথিবীর প্রকৃত হিতৈষীদের কথা ভাবিলেও নবজীবনের সঞ্চার হয়। উইলবারফোস ও পার্কারের জীবনকাহিনী এখন পুরাতন হইয়াছে। ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডির কথাও পুরাতন হইয়াছে। শুনিতে চাহিলেও মানুষ এখন আর তাহাতে উত্তেজিত হয় না। শুনিলেও, এখন আর তাহাতে মানুষ সুখশয্যা পরিত্যাগ করে না—বিলাসে ডুবিয়া বিশ্রামের স্বপ্নই

দেখে। আধুনিক বঙ্গের অবস্থা ভাবিলেই ভারতের অবস্থা বুঝা যায়। বঙ্গ যেন ভারতের প্রতিলিপি। "এদেশের কবি রিপুর কাহিনী লিখিতেই ভালবাসে, নাটক এবং উপন্যাস-লেখক প্রণয় চিত্র আঁকিতেই মজবুত। হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীতের লেখনী এখন নীরব—এখন নবীনচন্দ্রের পলাশি সমরের রাণী ভবাণীর স্থলে "উত্তরার" অভদ্র অঙ্গ চালনার আদর। * এখন নীল দর্পণের স্থলে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় দেখিতেই অনেক লোক লালায়িত। এই যুগে এই দুর্দিনে এই দুর্যোগে একটী দ্বীপের দুই মহাত্মার কাহিনী পাঠ করিয়া আমরা ধন্য এবং কৃতার্থ হইতেছি। দুটী সামান্য প্রাণী —দরিদ্র নিঃসহায় নিঃসম্বল—আজ জীবন বিসর্জ্জনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ক্রীট দ্বীপে দণ্ডায়মান। একজনের নাম পাপা মেলিকে আর এক জনের নাম মাণ্ডেকো। একজন মন্ত্র দাতা আর একজন মন্ত্র ধারক। উভয়ই বীর উভয়ই ধীর উভয়ই অবিচলিত উভয়ই তেজস্বী, উভয়ই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উভয়ই অটল এবং অচল ইটালির ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের অভিনয় যেন ক্রীট আজ পুনরভিনীত হইতেছে। যেন ম্যাট্‌সিনি এবং গ্যারিবল্ডি আবার অভ্যুত্থিত হইয়াছেন যেন জগৎ কাঁপাইয়া দেশ মাতাইয়া বলিতেছেন—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন " এই দুই সামান্য লোকের শক্তি সমক্ষে ইয়ুরোপের সমগ্র শক্তি আজ কম্পান্বিত। কোন বলে ইঁহারা বলীয়ান? এক একটা মহাশক্তি ইচ্ছামাত্র মুহূর্ত্তে যাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে সমর্থ তাহাদিগকে দমন করিতে সমবেত হইয়াও সেই মহা শক্তিপুঞ্জ কেন আজ হতস্তত করিতেছেন থতমত খাইতেছেন ভয় পাইতেছেন বিহ্বল হইতেছেন পাঠক তুমি বলিতে পার কি? চিন্তাশীল হইলে তোমাকে বলিতেই হইবে বড় বড় রাজ্যেশ্বর আপন আপন স্বার্থ চিন্তায় বিভোর—অগ্রসর হইয়াও তাঁহারা ভাবিতেছেন কিরূপে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি হইবে। এই জন্যই কেহই লাগিয়াও লাগিতে পারিতেছেন না। নিত্যই শুনিতেছি, এই বার যুদ্ধ বাধিবে, কিন্তু কই যুদ্ধ বাধে? স্বার্থ স্বার্থ—কেবল স্বার্থ চিন্তায় সকলে বিভোর।। আর পাপা মেলিকো এবং মাণ্ডেকো আজ নির্ব্বাণ যজ্ঞে সকল স্বার্থ বলি দিতে অগ্রসর। ধর্ম্মযুদ্ধে আজ তাঁহারা প্রাণ দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যে নীতি, ধর্ম্ম এবং পুণ্য বলের নিকট পৃথিবী চিরদিন অবনত মস্তক যাহার অভাবে পৃথিবীর বীর শ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নেরও দর্প চূর্ণ হইয়া

* মহাভারত ৪র্থ খণ্ড ১১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

ছিল, * সেই বলের নিকট আজ স্বার্থ-চালিত স্বার্থময় রাজ-নীতির প্রবল সৈন্য-ব্যূহ পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় নিষ্পেষিত এবং উপেক্ষিত হইতেছে। শক্তি, স্বার্থ-রক্ষায় না স্বার্থ বিসর্জনে, বলত? রবার্ট এমেটের ন্যায় দেশ-হিতৈষীর অত্যাচারে, প্রাণবিয়োগে আয়রল্যাণ্ডে অধিক বল সঞ্চারিত হইয়াছে, না পার্ণেলের রিপু চালনায় অধিক হইয়াছে, পাঠক, ভাবিয়া বল। আজ মেজিনো এবং মাণ্ডেকোর জীবন যদি সমর-অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়, তবে তাহা হইতে যে পুণ্য বলের সঞ্চার হইবে একদিন, সেই পুণ্যবল ক্রীটকে স্বাধীন করিবেই করিবে। বাল্যে আমরা ইতালীর দুই নিঃস্বার্থ বীরের নিঃস্বার্থতায় যে স্বাধীনতার ইতিহাস পাঠ করিয়াছি, ক্রীট-ইতিহাসে, জীবনের এই শেষদিনে, তাহাই আবার পুনঃপাঠ করিতেছি। ধন্য ইতালি এবং ধন্য ক্রীট। একদিকে এই মহা উদ্দীপনা ও মহাপ্রাণতার চিত্র, তারই পার্শ্বে ভারতের নিদারুণ হাহাকার এবং হিতৈষীগণের নিশ্চেষ্টতা, নিরুদ্যম, সুখ সেবিত গাঢ় সুষুপ্তি। হায়রে সভাসমিতি।

হায়, ভারতবর্ষ। অসভ্য জাপান অসভ্য তাতারও আজ স্বাধীন এবং প্রধান, ভারত আজ চরিত্রে মৃত, শরীরে মৃত ধর্ম্মে পুণ্যে মৃত। চতুর্দ্দিকে কেবল মৃত্যুর করাল রাক্ষসী মূর্ত্তি। ইন্দ্রিয় স্রোতে আজ ভারত ভাসিয়া চলিয়াছে, চরিত্রহীনতার মহাবাত্যা বিস্তৃত হইতেছে,—জাতীয় একতা ক্রমেই সুদূর-পরাহত হইতেছে। কেবল স্বার্থকুহক, কেবল রিপুর কুহক, কেবল হিংসা বিদ্বেষের রাজ্য বিস্তার॥ এই ভারতকে আজ মহামারী এবং মহাদুর্ভিক্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়া ১৩০৩ সাল, বঙ্গের অমূল্য রত্ন, নিঃস্বার্থ দেশ-হিতৈষী মনোমোহনকে অপহরণ করিয়া অতীতের কোলে মাথা লুকাইলেন,—দিগ্বিজয়ী ধার্ম্মিক নামধারী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে রিপুর জলন্ত বহ্নিতে পোড়াইয়া আজ জেলে পাঠাইয়া এবং অসীম সাহসী কালীপ্রসন্নকে কাপুরুষ যোগ্য মিথ্যা রমণী কলঙ্ক ঘোষণার গৌরব মুকুট (?) মাথায় পরাইয়া জেলে পাঠাইয়া বিদায় লইলেন। আমরা মনোমোহনের জন্য অশ্রু ফেলিতে এবং হিংসাবিদ্বেষে জর্জ্জরিত হইয়া মরণের কাহিনী শ্রবণ করিতেই জীবিত রহিলাম। এই দগ্ধ বঙ্গভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ এবং কালী

* "It was not Bonaparte's fault He did all that in him lay, to live and thrive without moral principle It was the nature of things, the eternal law of the man and the world, which balked and ruined him and the result, in a million experiments would be the same *Emerson*

প্রসন্ন, উভয়েই পূজিত। আমরা উভয়ের জন্যই দুঃখিত এবং মর্ম্মাহত। এই দুই ব্যক্তির উপলক্ষে প্রবীণ বঙ্গবাসী এবং নবীন বসুমতীতে, উদার সঞ্জীবনী এবং সাহসী হিতবাদীতে যে বিদ্বেষ-বিষ উদ্গীরিত হইতেছে, তাহা কোন দেশের ভদ্র সমাজেরই যোগ্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের পতনে জাতীয়-ধর্ম্মহীনতা-রূপ মহা-পতনের আভাস পাওয়া যায়। এতবড় ধার্ম্মিক নাম-ধারীর মহাপতনে দুঃখ করিবার নাই কি? শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন আমাদেরই এক-জন। আমাদের প্রতিজনের প্রতি কাজে জাতির গৌরব বাড়ে প্রতি কাজে কমে। আর কাব্য বিশারদ তিনি যেন উদ্দীপ্ত সাহসের খনি, তিনি নীলকর সেরিকের বেলা ক্ষমা চাহিলেন এবং পাইলেন, অবলা, চিরপরা-ধীনা রমণীর কলঙ্ক ঘোষণায় সময় ক্ষমা চাহিলেন না বা পাইলেন না, এ দুঃখ আমাদের রাখিবার ঠাঁই নাই। এই উপলক্ষে তিনি নির্লজ্জ-বীরত্বের বিদ্বেষ বহ্নি ঘোষণার সুযোগ দিলেন এবং এখনও দিতেছেন, ইহাতে আমরা মর্ম্মাহত হইতেছি। তারপর সঞ্জীবনী এবং বঙ্গবাসী, শত্রুর পতনেও উল্লাস করা ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ, একথা ভুলিয়া গেলেন, এ কথা যত ভাবি, ততই কষ্ট পাই। বঙ্গে এবৎসর যেন দাবানলের ন্যায় হিংসা বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় ভারতের দুই অঙ্গ বিশেষ, কিন্তু দিন দিন বিদ্বেষ বিষে জর্জ্জরিত হইতেছেন। পণ্ডিত লেখরামের হত্যায় ভারতে এই বহ্নি এমন প্রজ্জলিত হইয়াছে যে ইহার পরিণাম ভাবিতেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। হিংসা বিদ্বেষ এই ভাবতে ১৩০৩ সালে যেমন জ্বলিয়াছে, এমন আর কোন যুগে নয়। পণ্ডিত লেখরামের হত্যায় হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষ, এবং বঙ্গে উপরোক্ত দুই ঘটনায় যে বিদ্বেষ বহ্নি জ্বলিয়াছে, তাহাতে জাতীয় একতায় সম্ভাবনা নির্ব্বাণ হইতেছে। তার উপর মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ। ১৩০৩ সাল গিয়াছে, কিন্তু যাহা করিয়া গিয়াছে, বহুযুগেও তাহা সংশোধিত হইবে কিনা, জানিনা। এইরূপ যদি দেশের শোচনীয় অবস্থা, তবে এ ভারতে সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকা থাকে কেন? কাগজ সমূহ যদি এই বহ্নি নিবারণে যত্ন না করিয়া, আরো প্রজ্জলিত করিতে যত্নবান, তবে পত্রিকা সকল না থাকিলে ভাল হয় না কি? জাতীয় একতা, এই বিদ্বেষ বহ্নিতে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইতে চলিল। সমবেত চেষ্টার অভাবে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী ভারতকে শ্মশানে পরিণত করিতে লাগিল। হায়, এ ভারতে পত্রিকা থাকে কেন? থাকিয়াই বা কি করি-

জেছে? পত্রিকার শক্তিই বা কোথায়? অনন্ত অভাব সাগরে এদেশের পত্রিকা সকল যেন সামান্য বুদবুদ মাত্র। সে দিন কোন বিখ্যাত ইংরাজ-সম্পাদক বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন, "যে বঙ্গের সমস্ত কাগজের গ্রাহক সংখ্যা ৬৭০০০ হাজার বই নয়, সে দেশ আবার উন্নত বা সুসভ্য? সে দেশ স্বাধীনতার যোগ্য কিসে?" * কথাটা ঠিক নয় কি? বাঙ্গালার কথা বলি। এদেশে যতগুলি কাগজ আছে, তাহার অধিকাংশই অনাহারে ক্লিষ্ট, জীর্ণ, শীর্ণ। এদেশের আর সকলের উদরান্ন জুটে, কিন্তু মৌলিক লেখকদের জুটে না। কাগজ পড়ে কে? তাস পাশার উত্তেজনা, পরনিন্দার ছলনা, রিপুর তাড়না, বিলাসিতার আকর্ষণ এবং জ্ঞানের অহঙ্কার যাহাদের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট, তাহারা তোমার কালীর দাগ পড়িবে? তুমি কি ছাই জান, এবং কি ছাই লেখ যে, এত আস্পর্দ্ধা কর, তোমার পুস্তক এবং কাগজ লোকে পড়িবে? রবীন্দ্রনাথের নাম এ দেশময়, "সঞ্জীবনী" প্রমুখ দল বলেন, তিনিই এখন বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে প্রধান। † শুনিলেও সুখ হয়, কিন্তু তাঁহার "কাগজ" খানিও টিকিল না কেন? জিজ্ঞাসা করিয়া এস, জানিতে পারিবে কেবল গ্রাহকদের অপরাজিত দয়ায়। যদি ভুল শুনিয়া না থাকি, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন এবং প্রচার, অক্ষয় চন্দ্রের নবজীবন, যোগেন্দ্র নাথের আর্য্যদর্শন, কালীপ্রসন্নের বান্ধব, রবীন্দ্রনাথের "সাধনা,"—এ সকল প্রধান পত্রের তিরোধানের কারণ, গ্রাহকগণের অসীম দয়া। চন্দ্রনাথ আজ স্কুলপাঠ্য লেখেন পাঠকগণের অসীম দয়ায়, কেননা

---

* "We are accustomed says the *Pioneer* to hearing Bengal described on Congress platforms as the most advanced province of India but the claim is hardly borne out by official statistics regarding the number and circulation of its vernacular newspapers The progress of the modern communities is in a direct ratio with that of their periodical press, which reflects not only public opinion but the degree of culture attained by the people Judged by this standard the Lower Provinces are not reached the level of the least civilised of European nations A population considerably more than twice that of the United Kingdom finds 54 newspapers sufficient for its intellectual cravings Only 5 are dailies 38 appear weekly, 5 fortnightly and 6 monthly The curse of Babel appears to have stricken Bengal with unusual severity for five languages are represented in her Press Bengali Urya Urdu Hindi and Persian The circulation reported by the proprietors of these organs is on a scale equally restricted One of them claims the respectable total of 20 000 copies, but the next in importance has 4 000 subscribers only A single issue of all the vernacular journals in Bengal includes about 68,000 copies less than half the daily circulation of a London morning newspaper These facts are not without their moral but we reserve our reflections"
—THE INDIAN NATION, *March 29, 1897*

† সঞ্জীবনী ৫ই বৈশাখ, ১৩০৪ 'সাহিত্য ও নীতি প্রবন্ধ' দেখ।

শুনিয়াছি, যে শকুন্তলা তত্ত্বের জন্য তিনি দেশ বিখ্যাত, সেই শকুন্তলা-তত্ত্বের প্রথম সংস্করণের শত খণ্ড পুস্তকও বিক্রীত হয় নাই! অক্ষয়চন্দ্র ও হেমচন্দ্র আজ সাহিত্য-ক্ষেত্র পরিতাপে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যোগেন্দ্রনাথ ডেপুটী-গিরি করিতেছেন, রজনীকান্ত, চন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ স্কুলপাঠ্য লিখিতেছেন, কালীপ্রসন্ন, ত্রৈলোক্যনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং নবীনচন্দ্রের সাহস এবং বুকের বল অধিক, তাই, তাঁহারা সহ্য করিয়াও, রাশি রাশি অর্থ ঢালিয়াও মাতৃ-ভাষার সেবা করিতেছেন। ঠাকুরদাস অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া চাকরীর উমেদারি করিতেছেন, জ্ঞানেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র চাকরীতেই সুখী হইতেছেন। আর ছোট বড় কত নাম কবিব? অনাহারে জীর্ণ, শীর্ণ, ও ক্লীষ্ট হইয়া কত লেখক ও সম্পাদক উমেদাবীবেশে দ্বারে দ্বারে আজ ভিক্ষুক।। যে সকল কাগজ চলিতেছে, সে সকলের রাশি রাশি মূল্য বাকী। কেহ ডুবিয়াছে, কেহ ডুবিতেছে, কেহ কেহ ডুবিবার পূর্ব্বে অভাব-তরঙ্গে আন্দো-লিত হইতেছে। এই ত দেশের অবস্থা। এদেশের লোকে কাগজ পড়ে সহস্রে একজন, টাকা দেয়, শত গ্রাহকের এক জন। কাগজ পাঠাইতে লিখিয়া ফেরত দেয় কতজন, কাগজ গ্রহণ করিয়া মূল্য দেয় না আরো কত শত জন। এই অবস্থায় ভারত মস্তক তুলিতে চাহিতেছে। এক পা উঠানে শত বার পতন হইতেছে। অবস্থা পীড়নে কত কাগজ এখন ব্যব-সাদারী শিখিতেছে, টাকার খাতিরে কলুষিত রুচি উত্তেজিত করিবার জন্য কত পত্রিকা তরজা কবিব লড়াই বা থেউড়-পালা ধরিতেছেন। এই ত অবস্থা। কেহ কাহারও ভাল সহ্য করে না,—নিন্দা, এবং বিদ্বেষে দেশ প্লাবিত। বর্ষের পর বর্ষ যাইতেছে দেখিয়া কেহ কেহ বলেন, ভারতের উন্নতি হইতেছে। কিন্তু উন্নতি, না অবনতি? ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ভিন্ন এবং ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ভিন্ন যদি জাতির উন্নতি হওয়া সম্ভব, স্বীকার কর, তবে নিশ্চয় এদেশের উন্নতি হইতেছে। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করি না। আমরা বলি, ভারত যে তিমিরে, সেই তিমিরে। সকলেরই এক পরিণাম—পতন ও মৃত্যু। অকাল মরণই যেন আমাদের দেশের পরিণতি।

পৃথিবীর ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি, মরণের পর নবজীবনের সঞ্চার হয়, বিয়োগের পর যোগ আইসে। কথাটা অঠিক নহে বলিয়াই আমরা আজও আছি। কষ্টের উপর কষ্ট, নির্য্যাতনের উপর নির্য্যাতন—রোগ এবং অনাহার, ভর্ৎসনা এবং ভ্রুকুটী, বিদ্বেষ এবং নিন্দার তীব্র প্রহার সহ্য

করিয়াও—মানুষের কৃপার ভিখারী, এবং চরণের ধূলি হইয়াও আমরা কেবল সেই মহা আশাতেই আছি যে, মরণের পর নবজীবন পাওয়া যায়। দারুণ শোক তাপময় ভারত মহাশ্মশানে আজ ক্রীটের মহাপুরুষদ্বয়ের স্বার্থ ত্যাগের উজ্জল দৃষ্টান্ত আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। বিয়োগ-অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারের পরই যোগজ্যোতি আসিবে, এই মহা আশাতে আছি। মহাসংযম-সাধন-ক্ষেত্রে স্বার্থ, রিপু, প্রলোভন, অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিলে যেমন মহেশ্বরের সহিত মহাযোগে যুক্ত হওয়া যায়, মহাসংসার-প্রাঙ্গণে, রোগ শোক অনাহার এবং ক্লেশে জর্জ্জরিত হইলেই তবে মহা-প্রাণতায় বা মহামনুষ্যত্বে দীক্ষিত হওয়া যায়। শব-সাধন ভিন্ন সংসার-সাধন আর কিছুই নয়,—সংযম-সাধন ভিন্ন ধর্ম্মসাধন, তেমনি, আর কিছুই নয়। শ্মশানবৈরাগ্য সাধনই মহাসাধন, অর্থাৎ স্বার্থনাশই মহা-জীবনের পূর্ব্বাভাস। * দুঃখ, মরণ, সকলের পর তবে সুখ এবং নবজীবনের আবির্ভাব সম্ভব। অসুর কুল বিনাশ করিবার জন্য উলঙ্গিনী, মুণ্ডমালিনী, পাপ-তাপ নাশিনী মা অমাবস্যার বিঘোর-অন্ধকারে কি রঙ্গেই আজ ঘুরিতেছেন। সব ডুবিয়া যায়, সব রসাতলে যায়,—মা, তবুও কেবল রক্তপানে বিভোর। সন্তান-কুলের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্যই মা অভয়া যেন অট্টহাস্য হাসিতেছেন এবং জগৎ প্লাবিত করিয়া কেবল রক্তস্রোত প্রবাহিত করিতেছেন। পুত্রহারা মায়ের ক্রন্দন, পতিহারা সতীর ক্রন্দন, সব তিনি সহ্য করিতেছেন। সর্ব্ব-সংহারিণী উলঙ্গিনী—সকল আসক্তি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ভয়ে ভয়ে আমরা সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি। অসুর-কুল-ধ্বংশ হইলে, দুঃখ রাত্রি উদ্‌যাপিত হইলে, বুঝি মা অন্নপূর্ণা বেশ ধরিবেন, সেই আশায় বুক বাঁধিয়া আছি। অনন্তের কোলে বৎসর ডুবিয়াছে, অনন্তের লোকে মনোমোহন ডুবিয়াছেন, অনন্তের কোলে শত সহস্র নরনারী ডুবিতেছে, অনন্তের কোলে আমরাও ডুবিব। থাকিবে কি? কিছুই না—কেবল মহৎ ঘটনারাশি। সেই ঘটনা রাশি—যাহা বিয়োগের মহাস্বার্থত্যাগের মহামূল্যে কেনা যায়—যাহা মহা-যোগের উপযোগী। কিন্তু তাহা যে কি, কে জানে?

"The one thing which we seek with insatiable desire is to forget ourselves, to be surprised out of our property, to lose sempiternal memory, and to do something without knowing how or why, * * * Nothing great was ever achieved without enthusiasm The way of life is wond

তাহা আর কিছুই নয়, তাহা কেবল চরিত্র রূপী মহাজীবন। সে জীবন চিন্ময়ীর অংশ। তাহা অসুরনাশিনীর বংশধর। সেই চরিত্রধনে ধনী হইলে আর মরণ নাই,—আর বিয়োগ নাই,—আর ত্রিতাপ নাই। মরণে সেখানে জীবন, বিয়োগে সেখানে মহাযোগ। সেই নিত্যানন্দ ধাম ভিন্ন এই ঘটনা ও বৈচিত্র্য পূর্ণ, উত্থান-পতনময় পৃথিবীতে মনুষ্যের আর অনাবিল চিরসুখ শান্তি নাই। চিরবসন্ত, চিরশান্তি—নিত্যশান্তি তাঁহারই, যিনি মরণের ভিতর দিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এবং যিনি গাঢ় অন্ধকারে নিত্য-ধ্রুব জ্যোতি দেখিয়াছেন। মরণের পূর্ব্বে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা চাই। আসক্তি নির্ব্বাণ হইলে তবে বৈরাগ্যের মহাঘাটে স্নাত হইয়া সেই ব্রত লইতে হয়। মহা বিসর্জ্জনের যুগে আমরা মহামিলনের তত্ত্ব পাঠ করিবার আশায় আছি। বিধাতা এই করুন, ১৩০৩ সালের বিয়োগ এবং ১৩০৪ সালের সংযোগ দিনে আমরা বিয়োগ এবং যোগ তত্ত্বের গভীরতা ভেদ করিয়া যেন সেই মহাশিক্ষার অধিকারী হইতে পারি। ভারতের বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ-রূপ মহাশ্মশানের ভিতর বসিয়া যেন মহাজীবনলাভের অধিকারী হইতে পারি। যোগেশ্বরের কৃপায় দারুণ দুঃখের পর যেন ভারতে নব-জীবনের সঞ্চার হয়।

৬ই বৈশাখ, ১৩০৪।

বিষাদ-কালিমা।

সে দিন অমৃত-বাজার পত্রিকায় পাঠ করিতেছিলাম, ভারত ষ্টেট সেক্রেটারি মহোদয় স্বীকার করিয়াছেন, কেবল মধ্যভারতে, অনশনে, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়নে চারি লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যাহা স্বীকার করিয়াছেন, প্রকৃত অবস্থা তাহার দশগুণ অধিক শোচনীয়। ঘটনার তীব্রতার অনুপাতে গবর্ণমেণ্টের স্বীকৃতির হ্রস্বতা। ম্যাকেঞ্জি প্রমুখ দল যাহাকে সর্ব্বগ্রাসী, সর্ব্বনাশী, সর্ব্বসংহারক, সর্ব্বপ্রধান, অতি ভীষণ দুর্ভিক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার তীব্র দাহনে কত লোক যে গৃহহীন, পুত্র-কন্যা-হীন, পিতা-মাতা হীন হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? কত গৃহ শ্মশান হইয়াছে, কে সে ইতিহাস লিখিতে পারে? কে ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে অটুট রাখিয়া নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে নির্দ্দেশ করিতে পারে, এবার ভারতে

দুর্ভিক্ষে কত লোক মরিয়াছে॥ বায়ু এই কয়মাস ভারতে কত উষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহিতেছে, আকাশের নক্ষত্রগণ কেবল তাহার সাক্ষী। আর সাক্ষী নাই, আর গণক নাই, আর ঐতিহাসিক নাই॥।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১২ই জুন, শনিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার পর বঙ্গদেশে দারুণ ভূমিকম্প হইয়া অসংখ্য ধনীর গৃহকে ভূমিসাৎ করিয়াছে। রজনীতে এই ঘটনা হইলে না জানি কি সর্ব্বনাশ হইত। চতুর্দ্দিকেব নিদারুণ বিবরণ পড়িলে দুঃখে বিষাদে হৃদয় অবসন্ন হয়। সুসঙ্গের মহারাজ এবং গোবিন্দলালের মৃত্যু সংবাদে আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, রংপুর, নাটোর, দিনাজপুব, কুচবেহার, প্রভৃতি স্থল একেবারে মরুভূমি সদৃশ হইয়াছে॥ সকল ধনীর গৃহেই হাহাকার॥। কিন্তু চেরাপুঞ্জি প্রভৃতি স্থলে দরিদ্র প্রজাব বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকিলেও, অন্যত্র পর্ণকুটীরবাসী দবিদ্রদের বিশেষ অনিষ্টেব সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই।*

ভূমিকম্পের বিবরণে আজকালকার সকল পত্রিকার কলেবর পূর্ণ। তাহা হৃদয়-বিদারক,—বিষাদময়, উদাসময়, সন্তাপময়॥ এইরূপ আকস্মিক দৈব ঘটনা নিবারণের ক্ষমতা মানবের নাই। মানবের জ্ঞান বল, বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, শক্তি বল এবং সামর্থ্য বল—সব এখানে পরাজিত। মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূমিকম্পে সৃষ্টি ধ্বংশ হইলেও মানবের সাধ্য নাই—জগতকে রক্ষা করে। বুঝিবা, অহঙ্কারী মানুষের দর্প চূর্ণ করিবার ইহা বিধাতার এক আশ্চর্য্য লীলা। অথবা মানুষকে কর্ত্তব্য পথে নীত করিবার এক আশ্চর্য্য শক্তি বিকাশ। অথবা ধনীকে দরিদ্রদেব কথা স্মরণ করাইয়া মোহ-মদিরার উত্তেজনা ভুলাইবার এক আকর্ষণী বিক্রম প্রকাশ। তুমি চিরদিন সুখ-শয্যায় শয়ন করিবে—পর্ণ-কুটীরের কথা একবারও ভাবিবে না? অনন্ত ছিদ্রময় পর্ণ-কুটীরে কিরূপে অনশন-ক্লিষ্ট দুঃখী দুঃখিনীরা চৈত্র-বৈশাখের কঠোর সূর্য্যের তীব্র তেজ, এবং আষাঢ় শ্রাবণের অবিশ্রান্ত প্রবল ধারা সহ্য করে, তুমি তাহা একবারও ভাবিবে না? ভাবিবে না যে—তোমার চক্ষের সম্মুখে সহস্র সহস্র নরনারী অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে। তুমি কেবল নৃত্যগীত উল্লাসে—অহঙ্কারেই মত্ত থাকিবে। তুমি মানুষ, না তুমি কি? এই দুঃখ দুর্দ্দিনেও জমীদারেরা কোমর বাঁধিয়া খাজানা আদায়

* "It was reported that in Cherra Hills not less than 6000 lives were lost We are glad to learn that the loss esimated to be 700 lives' *Unity and the Minister*, June 27, 1897—people's press edition

করিতেছেন—এ বিবরণ অনেক জ্ঞাত হইতেছি। প্রজার অসংখ্য পিতা মাতা আজ রাক্ষসের করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন,—রক্ত শোষণ করিয়া, কত প্রজার ভিটা মাটী, ঘটী বাটী বিক্রয় করিয়াও খাজানা আদায় করিতেছেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনই হউন বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই হউন, কাহার কথা বলিতে চাও? যাহা প্রত্যক্ষ ঘটিতেছে, অনুসন্ধান করিয়া এস, বুঝিতে পারিবে, তাহা মর্ম্মপীড়ক, তাহা দুঃখদায়ক, তাহা হৃদয়-বিদারক। কিন্তু সে সকল কথা বলে কে? এ দেশের পত্রিকা সকল দিন দিন যেন ধনীদিগের পোষ্যপুত্র স্বরূপ হইতেছেন। তাঁহাদের অত্যাচার, অমানুষী পশুতুল্য ব্যবহার, তাঁহাদের জীবন-সুলভ অকীর্ত্তিরাশি ঘোষণা করিতে কোন পত্রিকা নাই। কোন পত্রিকা নাই, কোন সভা নাই, কোন প্রচারক নাই। ভারত-সভা একদিন জমীদারদিগের দোষ ত্রুটী সংশোধনে এবং দরিদ্রের স্বার্থ-সংরক্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন—এখন ধনীর টাকায় আশ্রয়-বাড়ী পাইয়া, জমীদার শ্রেণীর সাহায্য পাইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজার কথা ভুলিয়া রাজ-দরবার রচনার কামনায় মাতিয়াছেন। রাজদরবার কি এবং কোথায়? বৎসরান্তে একটী মহাসভা ভারতে যে দ্বাদশ বার বসিয়াছে, তাহারই কথা বলিতেছি। সে সভায় দ্বারবঙ্গের মহারাজ আসিলে আনন্দ ধ্বনিতে মণ্ডপ প্রতিধ্বনিত হয়, কিন্তু দীনমণ্ডল, গ্রামে এক জন মহামান্য মাতব্বর হইলেও, তাহার আদর নাই, কিম্বা তুমি যদি প্রজার কথা এক দিন বলিয়া বা লিখিয়া থাক, তবে তুমি যত বড়ই হও না, ঐসভায় নিত্য উপেক্ষিত, অবহেলিত, স্থানচ্যুত হইবেই হইবে। এবার নাটোর কন্‌ফারেন্সে জমীদার শ্রেণীর অধিক সমাবেশ হইয়াছে বলিয়া সকলের আনন্দের আর সীমা নাই। বেহার ক্যাডাষ্ট্রালসার্ভেতে প্রজার কিছু উপকারের সম্ভাবনা ছিল, দ্বারবঙ্গের মহারাজা নাকি কঙ্গ্রেসে বিশ সহস্র টাকা দিয়াছিলেন, সে জন্য কোন সভা বা পত্রিকা ইহার স্বপক্ষে কথা বলে নাই। ন্যাসন্যাল গার্জিয়ান একবার ইহার স্বপক্ষে কিছু কিছু লিখিয়াই, শুনিয়াছি, কোন প্রবীণ দেশহিতৈষীর পরামর্শে সুর ফিরাইয়া বিপক্ষে লিখিতে আরম্ভ করেন। দরিদ্রের কথা ভাবে, বলে বা স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে, এখন এমন সভাও দেখি না, পত্রিকাও দেখি না। দরিদ্রের কথা বলিবেই বা কেন? দরিদ্রের কথা বলিলে পেট ভরে কই? ধনীদের বিরুদ্ধে লিখিলে কাগজের গ্রাহকও থাকে না—সম্পাদকের আহারও জুটে না!! কাহারও মতের বিরুদ্ধে লিখিলে অমনি কাগজ পাঠাইতে

নিষেধ পত্র হাজির হয়। খোসামুদীর ভাষায়, মত-বিরুদ্ধ কথা না লিখিবার মৌরশী-প্রতিশ্রুতি-কবালা লিখিয়া দিলে, তবে ধনীবা, বড লোকেরা, কাগজেব গ্রাহক থাকিতে পাবেন। এ সম্বন্ধে এদেশের বড়ই শক্তযোট। জাতীয় মহাসমিতি প্রজাদেব জন্য কিছু করেন না, এবার এই দারুণ দুর্ভিক্ষেও একটী টেলিগ্রাম পাঠান ভিন্ন আব কিছু কবেন নাই, একথা নব্যভাবতে লেখা হইয়াছে বলিয়া কত মহা ব্যক্তি নব্যভারত ছাড়িয়াছেন।। সভাসমিতি প্রজাদের কথা লইয়া থাকিবে কেন? বাডী করিতে টাকা দেয় কে? আফিসের খরচ ও দেশহিতৈষী সম্পাদকের মাসিক বেতন ও পাওয়ানা গণিয়া দেয় কে? প্রজাদের মধ্যে পার্টি কোথায়, সম্মান কোথায়, গাডী কোথায়, হ্যাট কোথায়? তুমি হাওয়ার্ডের কথা, বা ম্যাট্‌সিনির কথা বলিতে চাও, তুমি মহা পাগল। তাহারা যত দিন জীবিত ছিলেন, কোন রূপ সম্মান পাইয়াছিলেন কি? মাস্ এডুকেশন অলীক স্বপ্ন, শিল্পেব উন্নতি, বাতুলের প্রলাপ, কৃষিব উন্নতি ও প্রজা-সংবক্ষণ-ব্যাঙ্কেব প্রস্তাব—নিবেট মূর্খের জল্পনা। বড বড সভা, বড় বড পত্রিকা, বড বড হিতৈষী, ঐ সকল যা-তা লইয়া বৃথা সময় নষ্ট কবিতে পারেন না। তুমি বৃথা অ-কাজের কথা আর বলিও না। দশ জনের মধ্যে এক জন হইতে চাও, মহা সম্মান পাইতে চাও, কোন দিন মানুষ ঘোড়ায় গাডী টানিবে, আশা রাখ ত চলিয়া এস—প্রজা পক্ষ ধরিয়া এ সকল কখনও পাইবে না। এবারকাব ভীষণ ভূমিকম্পের পর আমরা স্পষ্ট বুঝিয়াছি, এদেশের পত্রিকা সকল দরিদ্রেব মা বাপ নন্। ভূমিকম্পের বিবরণে যত কাগজের যত স্থান পূর্ণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষের বিবরণে তাহাব দশমাংশের একাংশ পূর্ণ হইলেও এদেশে এত লোক বুঝি।। মরিত না। লোক মরিয়া মরিয়া ভাবতকে মহা শ্মশানে পরিণত করিতে বসিয়াছে, অথচ এদেশ যেন নিশ্চেষ্ট। পত্রিকা সকল উদাসীন, মধ্য-ভারতের ক্ষণজন্মা মহামতি গুড্‌রিজ (Mr Goodridge) সাহেব তীব্র মন্তব্য প্রকাশ না করিলে জাতীয় সভাসমিতি দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে টেলিগ্রামটীও বিলাতে পাঠাইতেন কি না, সন্দেহ। কোন কোন সহৃদয় পত্রিকায় দুই চারিটী দুর্ভিক্ষের কথা প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু অবস্থাব গুরুত্বের তুলনায় তাহা কিছুই নয়। চতুর্দ্দিকে নীরবে অসংখ্য লোক অনশনে মরিতেছে।।

বলিতে পার, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতেছেন, আর প্রয়োজন কি?

গবর্ণমেন্টের সাহায্যে কি কাজ হইতেছে, যদি তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিতে, তবে বুঝিতে পারিতে, প্রয়োজন আছে, কি না। একটী সামান্য গ্রামের প্রায় দুই হাজার লোক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত, শুনিয়াছি, সেই গ্রামে কেবল ৩০৲টী টাকা দুর্ভিক্ষ-তহবিল হইতে এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ, দুই দশ কোটী টাকায় তাহার কি হইবে? লোক রক্ষা পাইত—যদি প্রতি দেশ বা গ্রামের লোক আপন দেশ বা গ্রামকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত। দেশ রক্ষা পাইত, যদি সম্পাদকগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিতেন—যদি জমীদার-গণ আপন আপন প্রজা রক্ষা করিতেন। নিজ পরিবারকে রক্ষা করা যেমন প্রত্যেকের কর্ত্তব্য, নিজ দেশ বা গ্রামের লোকদিগকে রক্ষা করাও তেমনি প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা বুঝে কে? কিন্তু সে কর্ত্তব্য পালন করে কে? কত শত শত ধনী এদেশে আছেন, কিন্তু কজন আজ আপন সুখ ভুলিয়া দরিদ্র-রক্ষা ব্রত গ্রহণ করিতেছেন? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-সংরক্ষণ-প্রয়াসী প্রবীণেরা বলেন, বঙ্গে প্রজাদের মা বাপ জমীদারেরা, জমীতে চির-স্থায়ী সত্বাধিকার না থাকিলে বঙ্গের প্রজার প্রতি এমন স্নেহ কখনও জমী-দারের জন্মিত না। কেহ কি কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন? পূর্ব্বে এই বঙ্গে জমীদার প্রজায় কি মধুর সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানি না, কিন্তু গত বিশ বর্ষে বঙ্গের বহু গ্রামের যে চিত্র দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে বলিতে সঙ্কোচ বা ভয় হয় না যে, জমীদার এবং প্রজায় এখন যেন খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। অবশ্য একথা বলিবার সময়, ইহা বলা উচিত যে, সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। এদেশে দুই দশ জন প্রজাবৎসল সহৃদয় জমী-দারও আছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ভাষায় বলিতে পারি, সাধারণতঃ—জমীদারেরা এবং বড় লোকেরা প্রজাগণকে পশুর ন্যায় দেখিয়া থাকেন এবং তাহাদের সহিত পশুর ন্যায় ব্যবহার করেন। সংবাদ-পত্র যদি কোন স্থলে এ হেন বীরদিগের দয়া-বৃত্তি উত্তেজিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে সে দয়াও মৃগের প্রতি সিংহের দয়ার ন্যায়।। অধিক আর কি লিখিব?

বঙ্গেও দুর্ভিক্ষে এবার লোক মরিতেছে—অনুসন্ধান করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। তবে মহা যোট—জমীদারে, পুলিসে এবং সংবাদপত্রে;—দরিদ্রের অনশনে মৃত্যুর কথা প্রকাশ বা প্রচার করে কে? বঙ্গের জমী-দারেরা আজ কাল অনেকেই গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত মহারাজা, রাজা, রায় বাহা-

দুর উপাধিতে ভূষিত, সুতরাং গণ্যমান্য ব্যক্তি। গবর্ণমেন্টের নিকট গণ্য—ঘুষ দিয়া, সংবাদ পত্রের নিকট গণ্য—কাগজ লইয়া, সভা সমিতির নিকট গণ্য—চাঁদা দিয়া। প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষ টাকা বিলাতের কমিটীতে ও জাতীয় মহাসমিতিতে খরচ হয়, জমীদার চটাইলে এত টাকা কে দিবে? পুকুর, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল কলেজে অনেক টাকার প্রয়োজন, বিলাতের খরচ কুলাইতেই গবর্ণমেণ্ট তহবিল শূন্য, এ সকলের টাকা জমীদারের দান-সাপেক্ষ। সুতরাং রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুরগণ আজ গণ্যমান্য—গবর্ণমেন্টের নিকট, সভা সমিতির নিকট, সংবাদ-পত্রের সম্পাদকের নিকট। মহাঘোট—এবার দুর্ভিক্ষের মৃত্যুর তালিকা সংবাদ পত্রিকায় উঠিবে না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের প্রজা ফরিদপুরের কোন গ্রামে যদি অনাহারে মরিয়া থাকে, তবে সে কথা ঘোষণা করিলে তাঁহার অবমাননা হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাহাজাদপুরের কোন প্রজা অনাহার-ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া যদি গলায় দড়ি দিয়া মরিয়া থাকে, তবে সে কথা বলিলেও তাঁহার অবমাননা হয়। সুতরাং সে সকল ধনীর নিন্দা প্রচার এ যাত্রা মুলতুবি থাকুক!। এবার বঙ্গে মহাঘোট!!

মহারাণীর রাজত্ব ৬০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এবার হীরক জুবিলি। মহা-বিপদের যেন মহাপ্রায়শ্চিত্তের উৎসব!। সহরে উপসহরে জুবিলি হইয়াছে—তাহার বিবরণে পত্রিকা সকল পূর্ণ। কিন্তু কি উপায়ে টাকা সংগ্রহ হইয়াছে, সকলে জানেন কি? অনেক স্থলেই দারোগা, পেয়াদা যাইয়া দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়া টাকা আদায় করিয়াছে। সেই টাকায় নহবৎ উঠিয়াছে, যাত্রা, নৃত্য গীতাদি হইয়াছে—আর মদের নদী বহিয়াছে। ইহার নাম হইল জুবিলি। না—লিখিতে ভুল হইয়াছে, কোন কোন স্থলে গরীব প্রজা এক দিন দুই দিন হাঁটিয়া আসিয়া ৫, কি /০, কি ৵০ পাইয়াছে—কোথাও বা কিছু খাইতে পাইয়াছে!!! সুতরাং ইহার নাম হইল, মহাপুণ্যতীর্থ!! এই জুবিলিতে যে টাকার শ্রাদ্ধ হইয়াছে বা হইবে, যদি গরীবদের জন্য তাহা ব্যয়িত হইত, হায়, বুঝিবা ভারতের লক্ষ লোক প্রাণে বাঁচিত। কিন্তু তাহা ত আমোদ নয়। সুতরাং কে তাহা করিবে? কেহ কেহ ছবির উপর ছবি সাজাইয়া, উজ্জ্বল বর্ণে সুচিত্রিত করিয়া পত্রিকা বাহির করিয়াছেন, এবং আপন দলের পত্রিকা সম্পাদকের প্রশংসা পাইতেছেন, কিন্তু এই টাকাগুলি যদি দরিদ্রের জন্য ব্যয় হইত, বুঝিবা শত জন দরিদ্রও রক্ষা পাইত। কেহ

কেহ ব্যবসা জাঁকাইবার জন্য সহস্র সহস্র বিজ্ঞাপন, এই অবসরে, বিতরণ করিতেছেন, কেহ বা কত দ্রব্য বিতরণ করিয়া বাহাবা লইতেছেন, হায়, যদি এই টাকাগুলি দরিদ্রেব জন্য ব্যয় হইত, তবে বুঝিবা কত লোক বাঁচিত। আমরা জুবিলির সময় হীবক বন্দরে গিয়াছিলাম। সেই স্থানে দলে দলে নিমন্ত্রিত প্রজাবা আহাবের আকর্ষণে আসিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিতেছিল এবং দীর্ঘনিশ্বাসেব সহিত বলিতেছিল, "হায়, কাচ্চা বাচ্চা লইয়া দুই তিন প্রহব দূব হইতে আহারেব আশায় আসিয়াও বঞ্চিত হইলাম,—আমাদের মহারাণী দবিদ্রা না হইলে সাধারণেব নিকট চাঁদা আদায় করিয়াও খাইতে দিলেন না কেন?" কি নিদারুণ কথা—কি তীব্র ভর্ৎসনা।। সাধারণের নিকট চাঁদা তুলিয়াও সে টাকায়, এই বিষম বিপদের দিনে, দরিদ্র-সেবা রূপ মহাকাজ হইল না।।। ৩ লক্ষ টাকায় মহারাণীর যে ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, এই টাকায় যদি দশ সহস্র লোক জীবন পাইত, তবে মহারাণীর অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিত। ভবিষ্যৎবংশীয়েরা এই কথা কৃতজ্ঞতার ভাষায় কীর্ত্তন কবিত। মুখে মুখে ভিক্টোরিয়াব যশগাথা এদেশে প্রচারিত হইত,—চিরকাল জীবিত থাকিতেন।। কিন্তু তাহা হইবার নয়। এ দেশে মহাবোট হইয়াছে। পাঠক জানিয়া রাখ, এদেশে দরিদ্রের মা বাপ নাই!!

যে দেশেব অসংখ্য লোক অনাহারে মৃত্যুগ্রাসে পড়িতেছে—যে দেশে নরনারীর ক্রন্দনে এবং দীর্ঘনিশ্বাসে ধরা এবং আকাশ পূর্ণ এবং উষ্ণ,—দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও ভূমিকম্প যে দেশকে শ্মশান-তুল্য করিয়াছে, সে দেশে আনন্দ করিবার কি আছে? এদেশে যদি সহৃদয় সম্পাদক থাকিতেন, তবে তিনি স্বীয় শরীরের তরল এবং উষ্ণ শোণিত-ধারায় পত্রিকা লিখিতেন, যদি কোন পুণ্যবান মহাত্মা জমীদার থাকিতেন—অকাতরে অর্থ ঢালিয়া প্রজা এবং দরিদ্র-রক্ষারূপ মহাযজ্ঞ করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতেন। যদি কোন প্রকৃত দরিদ্র বন্ধু সভা থাকিত,—খাটিয়া খাটিয়া, দরিদ্র সেবা করিয়া, এ দেশের অনন্ত প্রজাপুঞ্জেব চিরমহামহিমান্বিত কৃতজ্ঞতা-সিংহাসনে অটলভাবে বসিতে পারিতেন। ঘটনা উপস্থিত হয় না বলিয়া মানুষ মহৎ হইতে পারে না, এদেশেব লোকেরা আক্ষেপ করিয়া বলে। হায়, হায়, হায়, এ ভারতে এমন নিদারুণ ঘটনা রাশি উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও কেহ জীবন ঢালিয়া বিদ্যাসাগরত্বে বা ম্যাট্‌সিনিত্বে উন্নীত হইল

না!! হায়, হায়, হায়,—একটা লোকও এই ঘটনা ধরিয়া ধরার চিরপূজ্য হইল না!!!

বৃথা চীৎকার এবং বৃথা লেখালেখি। এ ভারত শ্মশান হইবার দ্বারেই চলিয়াছে। তবে বিধাতার বিধান নাকি স্বতন্ত্র—তাই বুঝি বা মানুষকে মোহ-নিদ্রা হইতে জাগাইতে তিনি সচেষ্টিত। একজন লোকের একবার সহস্র টাকা খোয়া যায়। সেই অবস্থায় লোকটী বলিয়াছিল, "হায়, এ টাকা থাকিলে কত লোকের উপকার করিতাম। এই টাকা পাইলে দরিদ্রের সেবায় লাগাইব।" বঙ্গের ধনীগণ, ভূমিকম্পের ভীষণ প্রকোপে এবার সতর্ক হইয়া যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তবে বুঝিব, বিধাতা মঙ্গলময়রূপ ধরিয়া ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলিতে বা ভাবিতে আমি নিতান্তই অক্ষম। মানব-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া, দিন দিন অক্ষম হইতে অক্ষমতর হইতেছি। বিধাতার বিধান জয়যুক্ত হউক,—আমি মরিয়া যাই,—আমি মরিয়া বাঁচি!!

আষাঢ় ১৩০৪।

খোসামোদী।

কি করিতে কি করিতেছি, কি দেখিতে কি দেখিতেছি। মহাত্মা ঈশা, চৈতন্য, বুদ্ধদেব এবং রামকৃষ্ণ-প্রমুখ সাধকেরা কামিনীকাঞ্চনের ভয়ে সদা সশঙ্কিত থাকিতেন, আমরা এযুগে জড়সড় "খোসামোদীর" তাড়নায়। এখন যাই কোথা, করি কি, তাহাই ভাবিতেছি।

এমন যুগে, এমন সময়ে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি যে, খোসামোদী ভিন্ন এক দিনও চলে না। খোসামোদী—ঘরে বাহিরে, অন্তঃপুরে, রাজদরবারে। স্বাধীনতা কবির কথায় এবং খেলায় শোভা পায় ভাল, আমরা রিপুর অধীন;—স্ত্রীপুত্রের অধীন, সমাজের অধীন, রাজার অধীন,—অধীন, অধীন, মহা অধীন। আমাদের ভয়ে ভয়ে চলিতে হয়, ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়। যার দিকে তাকাই—সে-ই কেবল খোসামোদী চায়,—স্বাধীন সত্য কথা কেহ শুনিতে চায় না;—বলিলে নির্য্যাতন এবং প্রহার করিতে উদ্যত। সকলের মতে মত ডুবাইয়া,জড়ভরত হইয়া গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইতে

পারিলেই বুঝি বা এ কালে সুখ আছে। নচেৎ কষ্ট, দুঃখ, নির্য্যাতন অপরিহার্য্য।

রাজার দোষের কথা বলিলে রাজা বিরক্ত হন, জেলের ভয় দেখান, আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করেন,—এ সকল স্বাভাবিক। ঘরের লোকই যখন দোষের কথা শুনিলে বিরক্ত হন, তখন বিদেশীয়ের নিকট অধিক প্রত্যাশা করা সাজে কি? আমরা পরস্পর যখন একটুও স্বাধীনতার উত্তাপ সহ্য করিতে পারি না, পরস্পর পরস্পরকে মতের দাস করিতে উদ্যত, তখন তাঁহারা সহিবেন কেন?—সহিতে পারিবেন কেন? আমরা যদি আপনাপন জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, বুঝিতে পারিব, খোসামোদী ভিন্ন আমাদের একদিনও যেন চলে না। স্বাধীনতা নামক যে একটা দেবদুর্ল্ল ভ জিনিস ছিল, তাহা ভারতের ভাগ্যে আকাশ-কুসুমবৎ হইয়াছে। ব্রিটীশ-শাসিত ভারত দাসত্বরূপ মহা অধীনতায় ডুবিয়াছে। কবি সত্যই বলিয়াছেন—

"তোমরা ব্রিটিস জাতি, পবিত্র উৎসাহে মাতি
ধরাব দাসত্ব প্রথা করিলে বারণ,
তোমাদের ছায়াতলে, তোমাদেরি পদতলে,
ভারত দাসত্বে হ'ল চিরনিমগন।"

মহাত্মা চ্যানিং প্রভৃতি মহাত্মারা বলেন, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ভিন্ন মানুষের ধর্ম্মজীবনের উন্মেষ অসম্ভব। মহাত্মা কেশবচন্দ্রও একথা বলিতেন। কিন্তু আমরা, আধ্যাত্মিক রাজ্যে, শাস্ত্রের অধীন, গুরুর অধীন, আবাহমান-কাল-প্রচলিত মত সাগরে চিরনিমজ্জিত। মানুষ প্রত্যেকে যদি প্রত্যাদেশ অবলম্বন করিয়া চলে, তবে তাঁহাকে স্বতন্ত্র মতাবলম্বী হইতেই হইবে। মানুষের প্রতিজনের আকৃতিগত পার্থক্যের সহিত জীবনগত এবং মতগত পার্থক্য অনিবার্য্য। প্রতি জন বিধাতার হস্তের স্বতন্ত্র জীব,—আকৃতিতে, মতে, এবং জীবনে। অনন্তরূপিণীর অনন্ত রূপ, অনন্ত মানব জীবনে—অনন্ত প্রকৃতিতে প্রতিফলিত, পরিস্ফুট, বিকশিত। মানুষ তাহা ভালবাসে না। মানুষ, মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে নিবাইয়া আপন মত-একত্বে মিশাইতে চায়। এজন্যই জগতে অসংখ্য সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। মিলাইতে চেষ্টা করিয়াও মানুষ মিলাইতে পারে না। অসম্ভব কি কখনও সম্ভব হয়? বিবাদ দিন দিনই বৃদ্ধি পায়—দিন দিনই সম্প্রদায় বাড়ে, ঝগড়া বাড়ে, মত

ঘর্ষণ বাড়ে। এক খ্রীষ্ট-সমাজে শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল। মুসলমান সমাজ এবং হিন্দু সমাজেই বা কত শত দল। এজগতে অনেক সাধক কামিনী-কাঞ্চনসাধনায় জয়ী হইয়াছেন, কিন্তু খোসামোদী সাধনায় কই কেহই যেন জয়লাভ করেন নাই, দল বাঁধিতে সকলেই কতকটা চেষ্টা করিয়াছেন। দলবাঁধার অর্থ—বিবিধ মতকে এক গণ্ডিতে পূরিতে বা একীকরণ করিতে চেষ্টা করা; অর্থাৎ শিষ্যত্বে দীক্ষিত করা, অর্থাৎ মনুষ্যের বিশেষত্ব লোপ করা। ধর্ম্মজগতে যে যত বড় লোক, দল বাঁধিতে সে যেন তত মজবুত। এ সম্বন্ধে কতই দর্শন বিজ্ঞানের ধাঁধায় এবং প্রতিভার শিখায় মানুষ মানুষকে ভুলাইতেছে। দলের প্রলোভনে বড় বড় লোকেরা সাপুড়িয়ার মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর ন্যায় প্রলুব্ধ, অবনত-মস্তক। দল বাঁধার অর্থ কি শুনিতে চাও? তাহা কেবল খোসামোদীর বাজার বসান, মত-বিসর্জ্জনের হাট বসান। এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজ বিবেকের স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য ঘোষণার কেন্দ্রস্থল ছিল, এখন সেখানেও দলাদলির হাট বসিয়াছে, মতের গণ্ডিতে সকলকে বাঁধিতে চেষ্টা হইতেছে। যে একটু এদিক সেদিক যাইতে চাহে, একটু বিবেকের বা প্রত্যাদেশের দোহাই দিতে চাহে, অমনি তাহার সর্ব্বনাশ। দলাদলির অর্থ—কেবল নিন্দা প্রচার, কেবল গ্লানি রচনা, কেবল ব্যক্তি বিশেষের প্রতিভা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। অন্যকে তুচ্ছ করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যেখানে হইয়াছে, সেই খানেই অহঙ্কারের হাট বসিয়াছে। এইরূপে নূতন নূতন দলের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যত্রও হইয়াছে—ব্রাহ্মসমাজেও হইয়াছে এবং হইতেছে। নামে ব্রাহ্মেরা স্বাধীনতার কথা বলেন, কিন্তু কাজে একটুও আত্মমত খর্ব্বীকৃত হইতে দেখিতে পারেন না। * এই জন্য ক্রমাগতই ব্রাহ্মসমাজে দলাদলি বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার প্রতিরোধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে বলিয়া মনে হয়। এখন সকলেই বুঝিতেছে, ব্রাহ্মসমাজে দিন দিন ভয়ানক রূপে দলাদলি বৃদ্ধি হইতেছে—স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত। প্রতি দলই অন্য দলের নিন্দা করিতেছে। অন্যকে খর্ব্ব বা ধ্বংস না করিলে যেন নিজত্ব প্রতিষ্ঠিত

---

* "But making allowances for all such natural causes we are constrained to remark that there is perhaps some truth in the view that Brahmos are fast developing a spirit of self-righteousness" *The Indian Messenger August 1, 1897*

হয় না! এই জন্য কত প্রকার নিন্দা ও ঘৃণার দান-সাগর রচিত হইতেছে। দিন দিন মিথ্যার সাহায্যে নূতনতর নিন্দা রচিত এবং প্রচারিত হইতেছে। প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য ঋণ করিয়াও অন্যকে জব্দ করার আয়োজন হইয়াছে এবং হইতেছে। আত্মানুসন্ধান, বিনয়, কর্মনাশার জলে ভাসাইয়া, অনেকেই, আজ পরছিদ্রানুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত। হায় রে ধর্ম্ম!!

স্ব-দলগত মতের আদর ও প্রচার-পিপাসা এত বাড়িয়াছে যে, তৎ-বহির্ভূত লোকদিগকে জব্দ করিতে, সাধারণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিতে একটুও দ্বিধা বা সঙ্কোচ নাই। মানুষ এমনই নির্লজ্জ। স্বাধীন এবং স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্বের মস্তকে পদাঘাত করিয়া মানুষ কেবল আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছে। যে যার মতে না চলে, সে-ই তার শত্রু। বিরুদ্ধ মতে চলিয়াও লোক ভাল থাকিতে পারে, এ বিশ্বাস, তোমার আমার কাহারই নাই। তোমার আমার বিপক্ষে থাকিয়াও লোক সৎ হইতে পারে, এ বিশ্বাস তোমার বা আমার মোটেই নাই। যদি এ বিশ্বাস থাকিত, ভাই, ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীতে সম্প্রদায়গত ঝগড়া বিবাদ থাকিত না, ব্রাহ্ম ব্রাহ্মকে, অথবা ব্রাহ্ম হিন্দুকে, হিন্দু ব্রাহ্মকে, অথবা হিন্দু খ্রীষ্টানকে এবং খ্রীষ্টান হিন্দুকে পতিত ও নিরয়গামী ভাবিত না। কিম্বা মুসলমান ও হিন্দুতে এত বিবাদ বিসম্বাদ থাকিত না। ধরা সুখের বাস হইত। কিন্তু সে স্বর্গীয় চিত্র কোথায় মিলে? মানুষ চায় কেবল খোসামোদী—কেবল আত্ম-প্রশংসা, চায় কেবল অন্যের স্বাতন্ত্র্য নাশ করিয়া শিষ্যত্বে মজাইতে। ভারতের স্বাধীনতার সোণার যুগ চলিয়া গিয়াছে।

আমার একটু স্বর্গীয় স্বাধীনতা মূলধন ছিল, তাহা লইয়াই ব্যবসা, দোকানদারী, জীবনের উন্নতির কেনা বেচা করিতে বসিয়াছিলাম। তা মানুষ রাখিতে দিল না। চতুর্দ্দিকের লোকেরা বলিতেছে, এ লোকটা কাহারও কথা শুনে না, আপন মতে চলে, বলে এবং লিখে। আমার এ বড় বেয়াদবি। যৌবনে ভ্রাতারা বিরোধী হইলেন, তাঁহাদিগকে ছাড়িলাম। পরে সমাজ বিরোধী হইল, তাহা ছাড়িলাম। তারপর সাহিত্য ও দেশসেবা ব্রত গ্রহণ করিয়াছি—এখানেও নানা দৈত্য আমার স্বাধীনতাটুকু খর্ব্ব করিতে চাহিতেছে। দৈত্যদের চেষ্টা, আমি জীবিত থাকিতেই আমার আমিত্বকে বিনাশ করিয়া তাহাদের তাহাত্বকে আমাতে প্রতিষ্ঠিত করিবে। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ

তাঁহাদের প্রতিভাকে খর্ব্ব করিবার জন্ত আপন আপন মত পুস্তকে পুরিয়া দিতেছেন। তাঁহাদের পদধূলিরও অযোগ্য আমি জীবিত থাকিতেই আমার আমিত্বকে বিনাশ করিতে মানুষের কত উল্লাস। আমার যাহা কিছু, সবই খারাপ, তাহাদের যাহা কিছু সবই ভাল। তাহাদের ব্যভিচার ভাল, তাহাদের মদ্যপান ভাল, তাহাদের কু-রুচি, কদাকার, ধর্ম্মহীনতা,সবই ভাল। ভাল এই জন্ত—তাহারা একটা দল বাঁধিয়াছে। আর আমি স্বতন্ত্র, একাকী। দল বাঁধিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিবার লোক জুটিয়াছে, আর আমার নিন্দা, দিবা-রাত্রি চর্তুর্দ্দিকে অবাদে ঘোষিত হইতেছে। আমি সপ্তরথি বেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় একাকীত্বের ভীষণ সংগ্রামে অহরহ যুঝিতেছি। স্বাধীনতা-বিহনে প্রাণ যায়, ধর্ম্ম যায়, চরিত্র যায়—ভীষণ সংগ্রামে এবার আর বুঝি কিছুই রক্ষা করা যায় না।।

আমার বন্ধুরা বলেন, "দরকার কি, যদি সকলেই বিরোধী হইল, তবে এ স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়োজন কি?" স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার প্রয়োজন আর কিছুই নয়, কেবল সত্যরক্ষা। পিতা যখন আমাকে এই মর্ত্ত্যে পাঠাইয়াছেন, তখন এই অধমের ললাটে অক্ষয়-অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন—"বৎস, কখনও সত্য পরিত্যাগ করিও না; যখন যে সত্য প্রেরণ করিব, তাহাই পালন করিও। যাহা পাইবার, ইহাতেই পাইবে।" আমি কিছুতেই এই আদেশ ভুলিতে পারিতেছি না। নিত্যই যেন নূতন সত্য আসিতেছে, ধরিতে যাই, আর বলিতে যাই, অমনি লোক খড়্গহস্ত হয়, অমনি লোক প্রহার করিতে আইসে। যাইব কোথায়, করিব কি? সত্যকে যদি ছাড়িতে হয়, তবে কি লইয়া থাকিব? বিশেষত্বকে যদি ডুবাইতে হয়, কি জন্ত বাঁচিব? চর্ব্বিত চর্ব্বণ, প্রতিভার বমন গলাধঃকরণ করিতে আমি নিতান্তই অক্ষম। তাহা পারিলাম না বলিয়া কত বন্ধু, কত সহায় আজ বিপক্ষে। লোকেরা বলে, মানুষের ও সমাজের দোষের কথা বলিও না, কেবল গুণের কথা বল, সকল দোষ চাপা দিয়া কেবল প্রশংসা কর। আমি পিতার আদেশ কিরূপে উপেক্ষা করিব, বুঝিতেছি না। আমি এখন করি কি, আমি এখন যাই কোথায়? সকলের সকল ভণ্ডামি চাপা দিয়া, খোসামোদীর তৈলপাত্র হাতে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল নয় কি? তোমার হিন্দুসমাজের দোষের কথা বলিলে; তুমি হিন্দু, চটিয়া অস্থির; এই ব্রাহ্ম-সমাজের দোষের কথা বলিলে ব্রাহ্ম চটিয়া অস্থির। কাগজ পরিত্যাগ করে

এবং সংবাদ-পত্রে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়। ইহা ছাড়া অসাক্ষাতে যে কত নিন্দা করে, তাহার ইতিহাস লেখা যায় না। আমি কঙ্গ্রেসের দোষের কথা বলিলে, কঙ্গ্রেসবাসীরা চটিয়া লাল হন। আমি যদি কোন কর্ত্তার বিরুদ্ধে কিছু বলি, অমনি সকলে চটিয়া লাল।। ভাই চটেন, বন্ধু চটেন, সামাজিকগণ চটেন, রাজা চটেন। আমি এখন যেন বিরক্তির রাজ্যেই আছি। পিতা কেন ভুল করিয়া আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, বুঝি না। কেন এত লোকের বিরক্তি উৎপাদন করিবার জন্য আমাকে রাখিয়াছেন, বুঝি না। আমি মরিলে যে দেশের অগণ্য ভাই, বন্ধু এবং দেশহিতৈষী বা সামাজিকের কল্যাণ হয়, আমাকে সে দেশে রাখিয়াছেন কেন? আমি মোটেই বুঝিতেছি না।

আমি আষাঢ়-শ্রাবণের প্রবলধারা মাথায় বহিয়া, ফরিদপুরের চারিটা থানার বহু গ্রাম ঘুরিয়া, কঙ্কালময় অসংখ্য নব নারীর আকৃতি দেখিয়া এবং করুণ ক্রন্দন শুনিয়া কিছু কিছু সাহায্য দিয়া আসিলাম। আমার অপরাধ, ছোট লাটের নিকট টেলিগ্রামে দেশের অবস্থা এবং অনাহারে মৃত্যুর কথা লিখিয়াছি। এই অপরাধের জন্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট তীব্র লেখনী ধারণ করিয়াছেন; এবং সত্য গোপনে চেষ্টা করিতেছেন। সেবার কোটালি-পাড়ের দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্টের তীব্র কটাক্ষপাতে কত উপাধি পাইয়াছি, এবার আবার আরম্ভ হইল!! দুখের কথা বলিব না—সত্য ঘোষণা কবিব না—প্রাণের কথা প্রাণেই রাখিতে হইবে, নচেৎ তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অত্যাচার, নির্য্যাতন সহিতেই হইবে। সত্য কথা বলিলে বাজা ধরিবেন, বন্ধুরা ধরিবেন, সামাজিকেরা ধরিবেন—সকলেই ধরিবেন। যার স্বার্থ যায়, সে-ই ধরিবে। কত ভ্রুকুটি, কত ভ্রূ ভঙ্গিমা যে আরো জীবনে দেখিতে হইবে, জানি না।

"চাপা দেও" এই মূল মন্ত্রটা শিখিতে পারিলে বুঝি বা এযাত্রা রক্ষা পাইতাম। সকলের সকল দোষ চাপা দেও এবং সকলকে মাথায় তুলিয়া নৃত্য কর;—এ কালের মূল মন্ত্র যেন ইহাই। ইহারই অপর নাম খোসা-মোদী। খোসামোদী যাহার সম্বল, সে রাজ উপাধি পায়, সমাজে সম্মান পায়, দেশে পূজা পায়, সে পরিবারে আদর পায়,—যাহা পাওয়ার সব পায়। আর তাহা যাহার নাই—সে লক্ষ্মীছাড়া, নরাধম, সে নীচ পশু। আমি মানুষের নিকট পশুর অপেক্ষাও হেয় এবং ঘৃণিত হইয়াও এক আদর্শ ধরিয়া

আছি—"সত্যমেব জয়তে।" খ্রীষ্ট সত্য ধরিয়া অমর হইয়াছেন, আমার বিশ্বাস, যদি সত্য ধরিয়া থাকিতে পারি, তবে আমি হীন এবং দীন, অধম এবং পতিত হইয়াও বাঁচিতে পারিব। অথবা যদি পিতার ইচ্ছা হয়—সত্য ধরিয়া, সত্য কহিয়া মরিয়াও অমর হইতে পারিব। অথবা বিধাতার যাহা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হউক, আমি খোসামোদার কুহক মন্ত্রে ভুলিতে পারিব না। জয় জগদীশ, এই কুহক মন্ত্রের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর। কেবল আমাকে কেন? ভারতের সকলকে রক্ষা কর। সত্যকে আশ্রয় করিয়া, এই ভারতে, আবার প্রকৃত স্বাধীন জীবের অভ্যুদয় হউক। এমন জীবের অভ্যুদয় হউক, যে সত্যের খাতিরে রবার্ট এমেটের ন্যায় ফাঁসিকাষ্ঠে দেহ ত্যাগ করিতে বা খ্রীষ্টের ন্যায় নির্য্যাতন-ক্রস কাষ্ঠে দেহত্যাগ করিয়া অমরত্বে উন্নীত বা উত্থিত হইতে যেন একটুও কুণ্ঠিত না হয়। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

দীন-জননী মহারাণী স্বর্ণময়ী।

১৩০৪ সালে বঙ্গের প্রধান ঘটনা, দুর্ভিক্ষ নয়, ভূমিকম্প নয়,—প্রধান ঘটনা, মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বর্গারোহণ। একদিন মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "এদেশে কেবল দুটী মানুষ আছে—এক মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং অন্য তারকচন্দ্র প্রামাণিক,—আর সব পশুতুল্য।" আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেন এরূপ বলেন? তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"যাহার হৃদয় আছে, দয়া আছে, যে দরিদ্রের উপকার করে, সে-ই মানুষ, আর সব পশু।" আমরা মনে মনে এই দুই জনের সহিত আর এক জনের নাম সংযোগ করিয়াছিলাম,তিনি আমাদের চিরপূজ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়। বঙ্গের তারকচন্দ্র গিয়াছেন, বিদ্যাসাগর গিয়াছেন—একাকিনী স্বর্ণময়ী ঘোরতিমিরাবৃত হৃদয়-শূন্য ভারত-শ্মশানে দীপ্তিময়ী করুণাধারা ঢালিতেছিলেন। হায়, হায়, হায়, তিনিও ১০ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩০৪, ৭১ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বঙ্গের দুঃখের সীমা নাই—নিরানন্দের অবধি নাই।

আমরা বাল্যকাল হইতে মহারাণীর নাম শুনিয়া আসিয়াছি। যৌবনের

প্রারম্ভে যখন সাহিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করিতেছিলাম, সেই সময় হইতে পরিচয় পাইয়াছি—"স্বর্ণময়ী দীন-জননী।" যখন প্রথম সাহিত্য-সেবায় প্রবৃত্ত হই, তখন দারুণ দারিদ্র্য-পীড়নে আমরা অস্থির ছিলাম। যখন শরৎচন্দ্র প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন কঠোর সামাজিক শাসনে আমরা ব্যতিব্যস্ত—একজন বন্ধু বা একজন আত্মীয় করুণার চক্ষে দেখিবার ছিলেন না। সেই দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ হইলে চক্ষে জল পড়ে। সেই দুর্দ্দিনে কদর্য্য কাগজে শরচ্চন্দ্র ছাপা হইয়া মহারাণীর নিকট উপস্থিত হইল। দয়ার প্রতিমূর্ত্তি, করুণার মধুর দৃষ্টিতে এক বিন্দু উৎসাহ-বারি নিক্ষেপ করিলেন। সামান্য উৎসাহ-বারিতে—কত কি হইল, আমি অধম লেখক, কি লিখিব? মহারাণী আমার নিকট যেন অমিয়া-ধারা হইলেন। একটী মিষ্ট কথায়, একটু স্নেহ-ধারায়—নবজীবনের সঞ্চার যে জগতের প্রাত্যহিক ব্যাপার, এক মুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষায় যে দেশের অসংখ্য লোক জীবন ধারণ করিতেছে, সে দেশের লোক আমরা, সামান্য বলিয়া কিছুই উপেক্ষা করিতে শিখি নাই। ঘোর দুর্দ্দিনে ১০টী মাত্র টাকায় স্বর্ণময়ী আমাদের নিকট "দীন জননী" আখ্যায় আখ্যাতা হইলেন।

সেই এক দিন, আর আজ এক দিন। ১২৮৪ সালে শরচ্চন্দ্র প্রথম প্রকাশিত হয়, আর আজ ১৩০৪ সাল। আমাদের মনে পড়ে, সেও ভাদ্র মাসের কথা—এও ভাদ্র মাস। দুয়ের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ১৯ বৎসর, এত-দিন মহারাণীর জীবন আমাদের নিকট যেন অমৃত-ধারার ন্যায় ছিল। স্মরণে সুখ হইত, ধ্যানে আরাম পাইতাম। মহারাণী যে দেশের মাতৃকুলকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই দেশে জন্মিয়াছি বলিয়া কৃতার্থ মনে করিতাম। আজ আমরা মাতৃহারা। আর এই বঙ্গ প্রদেশ?

জ্ঞান হইয়াছে পর শুনি নাই, মহারাণী কাহারও প্রতি বিমুখ হইয়াছেন? আমরা সময়ে সময়ে যে সকল দুঃখীর জন্য লিখিয়াছি, মহারাণী মুক্তহস্তে সাহায্য প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। মহারাণীর পদধূলি যে পুরীকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, আমরা সেই কাশিমবাজার রাজধানী দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়াছি—প্রত্যহ কত শত লোক সেখানে অন্ন বস্ত্র পয়সা পাই-তেছে। মহারাণীর জীবন অলিখিত, প্রতিমূর্ত্তি কোন ফটো ছবিতে কেহ দেখে নাই—তবুও কেন বঙ্গের ঘরে ঘরে মহারাণীর কথা? এই দেশে দানের ফর্দ্দ রাখিয়া ও সংবাদ পত্রে তাহা ছাপাইয়া অনেকে দাতা হইয়াছেন, রাজ-

সম্মান পাইয়াছেন; কিন্তু তারকচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের দানের তালিকা কোন সংবাদ-পত্র আজ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কি? তাঁহাদের পরিবারের লোকেরাও তাহা জানেন কি? জানেন না—জানা অসম্ভব। যেখানে দানের ফর্দ্দ থাকে, সেখানে দেবত্ব নাই। ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া অনেক সময়ে ভাবি, "যিনি আমার ন্যায় অধম ব্যক্তিকে এত দয়া করেন, তিনি কি জগৎকে ভুলিয়া আছেন? কখনই নয়, কখনই সম্ভব নয়।" আমরা স্বর্ণময়ী সম্বন্ধেও কত সময়ে ভাবিয়াছি, যিনি আমার ন্যায় নগণ্য, সামান্য, পরিত্যক্ত, নির্ঘিত, ঘৃণিত ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন, তিনি কি বঙ্গের অসংখ্য দরিদ্রকে ভুলিয়া থাকেন? শেষে শুনিয়াছি, কাহারও প্রতি তিনি বাম নহেন। দুঃখীর কথা শুনিলেই তিনি দয়া করিতে অগ্রসর। এইরূপে কত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার দয়ার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছে, কিন্তু তাহার কোন বিবরণ নাই। বিবরণ থাকা সম্ভব নয়। সে কালে শুনিয়াছি, দাতাকর্ণের নাম, একালে শুনিতেছি, মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম। স্বর্ণময়ী বঙ্গের প্রতি গৃহে দয়া-রাণীরূপে প্রভাসিতা। কে তাঁহাকে জানে না? কোন্ দুঃখী তাঁহার সাহায্য পায় নাই। মহারাণীর স্বর্গারোহণে আজ বঙ্গভূমি স্নেহময়ী জননী হারা হইয়াছেন।

হিন্দু-গৃহে মাতৃ-বিয়োগ, সকল দুর্ঘটনার মধ্যে প্রধান। সকল কথা মানুষ ভুলিতে পারে, মাতার কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। আজ বঙ্গভূমি দয়ার অনন্ত-প্রস্রবণ-স্বরূপা মাতৃহারা হইয়াছেন, সুতরাং এমন দুর্ঘটনা বঙ্গে এ বৎসর আর ঘটে নাই। দুর্ভিক্ষের হাহাকার, ভূমিকম্পের প্রকোপ মানুষ ভুলিয়া আজ পুণ্যময়ী মহারাণী স্বর্ণময়ীর জন্য অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। মা বঙ্গের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়াই বুঝি বা পলায়ন করিলেন। বঙ্গভূমি আজ দয়া-মায়া শূন্য শ্মশানে পরিণত। দুঃখীর আর্ত্তনাদে হাস্য-পরিহাস করিবার লোক এ বঙ্গে অনেক আছে, কিন্তু অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে আর লোক নাই। এমন দুর্দ্দিন আর বঙ্গে কখনও হয় নাই। এ অন্ধকারময় বঙ্গে যে তিনটী দয়ার প্রদীপ জ্বলিতেছিল, একে একে সে তিনটীই নির্ব্বাণ হইল। হা বঙ্গভূমি, তোমার দরিদ্রকুলকে আর কে রক্ষা করিবে?

আজকাল মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ চলিতেছে। চলিতেছে, চলুক। যাহার প্রাপ্য, শূন্য সিংহাসন সে পাউক, সাধারণের তাহাতে ক্ষতিও নাই, বুঝি বা বৃদ্ধিও নাই। এই ভাদ্র মাসে ভাগী-

বর্থী কুল কুল বহিয়া যে শ্মশান ভস্ম সাগরকে উপহার দিয়াছে, বুঝিবা, বঙ্গের শেষ দয়ার বিন্দু তাহার সহিত চিরবিসর্জ্জিত হইয়াছে। ধন পাইয়া লোক নৃত্য করে, বিলাসিতা করে, গাড়া ঘোড়ায় উঠে, রিপুসেবা করে, অহঙ্কারে মত্ত হয়, দরিদ্রকে নিষ্পেষণ করে। কি কুকার্য্য না করে, জানি না। ধন পাইয়া দান করে অতি অল্প লোক—দরিদ্র-সেবা করে লক্ষে একজন। যাহার ধন পাওয়ার, সে পাউক, যে বড় হইবার, সে বড় হউক। দরিদ্র সাধারণের সহিত সে বড়ত্বের কোন সম্বন্ধ নাই। আমাদের মনে হয়, মহারাণী কেবল নিঃসন্তান নহেন, তিনি উত্তরাধিকারহীনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশে, তাঁহার পিতৃ মাতৃকুলে, তাঁহার স্বামীর কুলে, তাঁহার সন্তান সদৃশ বঙ্গকুলে দয়ার উত্তরাধিকারী রাখিয়া তিনি যাইতে পারেন নাই। এ দুঃখ আমাদের রাখিবার ঠাই নাই। তারকচন্দ্র, বিদ্যাসাগর এবং মহারাণীকে দয়ার উত্তরাধিকারী রাখিয়া গিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহারাণীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু হায়, মহারাণী স্বর্ণময়ী দয়ার বংশে বাতি দিতে আর কাহাকেও রাখিয়া যান নাই। তাই বুঝি আজ বঙ্গের ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ—দরিদ্রের কুটীরে কুটীরে অশনিপাত হইতেছে। কে বলিবে, বঙ্গের এ দুর্দ্দিন কেন?

আমরা বলিয়াছি, মহারাণীর উত্তরাধিকারী নাই। উত্তরাধিকারী নাই, ফটো নাই, জীবন-চরিতও নাই। আছে কেবল দয়ার কথা। তাহা অকথিত, অব্যক্ত, অশেষ,—তাহা লোকের হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত, প্রতিবিম্বিত। তাহার ছাঁচ তুলিয়া দেখাইতে পারে, এমন মহাজন এদেশে নাই। মহারাণীকে চিনিতে যে গুণের প্রয়োজন, সে গুণ যতদিন এ দেশের নরনারী না পাইবে, ততদিন তাহাকে কেহই চিত্রিত করিয়া দেখাইতে পারিবে না। চেষ্টা ব্যর্থ। চেষ্টায় ভাষা সৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রতিকৃতি সৃষ্ট হয় না। প্রতিকৃতি অঙ্কনের ক্ষমতা মানুষের হৃদয়ে। যে জিনিস যাহার হৃদয়ে নাই, তাহা সে বুঝিতে অক্ষম। যে হৃদয়ে দয়া নাই, সে দয়ার চিত্র আঁকিতে অক্ষম। মহারাণীর জীবনচরিত লিখিবার উত্তরাধিকারীও তিনি রাখিয়া যান নাই। নীরবে সে জীবনের আরম্ভ, নীরবেই তাহা শেষ হইয়াছে। তিনি মাতৃকুলকে উজ্জ্বল করিয়া আজ বৈকুণ্ঠে স্থান পাইয়াছেন। অমর কুলে আজ আনন্দধ্বনি, আর এই বঙ্গে হাহাকার, নিদারুণ হাহাকার।

তাহার স্বামী এবং পিতৃমাতৃকুল সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা কোন কোন

সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা কোন পত্রিকা হইতে কিছু কিছু সংশোধন করিয়া কতকটা এ স্থলে তুলিয়া দিলাম।

"কাশীমবাজারের রাজপরিবারের নাম কাহারও নিকট অবিদিত নয়। এক শত বৎসর হইল, এই পরিবার প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতায় সাধারণ্যে যথেষ্ট পরিচিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত রাজপরিবারের যশঃসৌরভ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ ইংরেজ বণিকগণ যখন ভারতে ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তখন নানাস্থানে তাঁহাদের কুঠী ছিল। সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদে যে কুঠী ছিল, ওয়ারেন হেষ্টিংস্ সাহেব তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁনিই ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য রূপ অট্টালিকার ভিত্তি পত্তন করেন। তখন নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজের মনান্তর ঘটে এবং তদ্দণ্ড ইংরেজের সমস্ত সম্পত্তি নবাব সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া কুঠীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য নবাব হুকুম প্রদান করেন। নবাবের সৈন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌কে আক্রমণ করিল, নবাব সৈন্যের আক্রমণ হইতে কুঠী রক্ষা করার শক্তি সামর্থ্য হেষ্টিংস্ সাহেবের ছিল না, সুতরাং কুঠী নবাবের হস্তগত হইল। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। সেই সকল বিপদের সময়ে একজন বাঙ্গালী তাঁহার জীবন রক্ষা করিলেন। তাঁহার নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। তিনিই কাশীমবাজারের রাজ পরিবারের উন্নতির আদি পুরুষ।

কান্ত বাবু নিজ বাড়ীতে হেষ্টিংস্ সাহেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। নবাবের এই আদেশ ছিল, যে ব্যক্তি কোন ইংরেজকে আশ্রয় দিবে, তিনি তাহাকে সপরিবারে শূলে দিবেন। কান্ত বাবু এই ভীষণ আদেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া হেষ্টিংস্ সাহেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার কলিকাতা যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই কথা নবাবের কর্ণগোচর হইয়াছিল এবং তিনি কান্ত বাবুকে তজ্জন্য শাস্তি দিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে কর্ণেল ক্লাইব বঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং নবাবের মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হইল, সুতরাং কান্ত বাবু রক্ষা পাইলেন।

পলাশি-ক্ষেত্রে নবাব পরাজিত হইলে পর, ইংরেজ বণিকগণ বঙ্গদেশের প্রভুত্ব লাভ করেন। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ সাহেব বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। তিনি এদেশে আসিয়াই কান্ত বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন

এবং তাঁহাকে নিজের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে তিনি ভুলিলেন না। কান্ত বাবু কালকাতায় আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এই পদে তিনি ১৪ বৎসর কার্য্য করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এবং গাজিপুর ও আজিমগঞ্জ জেলাতে বৃহৎ জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র লোকনাথ নন্দী পিতার জীবিতাবস্থাতেই রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহা সমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়াছিলেন। রাজা লোকনাথ অনেক নূতন জমিদারী ক্রয় করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। হরিনাথ নামক একটী শিশু সন্তান রাখিয়া তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বালক হরিনাথ ভাল শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিক্ষার উন্নতি করিতে তিনি সর্ব্বদা ব্যগ্র ছিলেন। ১৮২০ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। রাজা হরিনাথ উদারমনা এবং মহানুভব লোক ছিলেন। তাঁহার অর্থ-ভাণ্ডার স্বদেশবাসী দীন দুঃখীর দুঃখ বিমোচনে সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল। তিনি কাশীমবাজারে একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভূতপূর্ব্ব হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৩২ সালে অল্প বয়সে রাজা হরিনাথের মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র কৃষ্ণনাথ তৎকালে নাবালক ছিল। কৃষ্ণনাথ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, তাঁহার বিবাহের জন্য বহুদিন যাবৎ পাত্রীর অন্বেষণ হইতেছিল। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ভট্ট-কুল গ্রামে একটী পাত্রী নির্দ্ধারিত হইল। ১২৩৪ সালের মার্গশীর্ষে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের অধান ভাটকুল গ্রামে এই পাত্রীর জন্ম হয়। গণকগণ পরীক্ষা করিয়া মেয়েটীকে সুলক্ষণা এবং সর্ব্বগুণসম্পন্না বলিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার নাম ছিল স্বর্ণময়ী। বলা অনাবশ্যক, তিনিই আমাদের মহারাণী স্বর্ণময়ী। তাঁহার শারীরিক রূপলাবণ্য যথেষ্ট ছিল। ১৮৩৮ সালে ১১ বৎসর বয়সে কুমার কৃষ্ণনাথের সঙ্গে তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর স্বর্ণময়ী বাঙ্গালা ভাষা বেশ শিখিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তলিপি অতি সুন্দর ছিল। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কুমার কৃষ্ণনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হন, তৎপর বৎসর লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার পিতার ন্যায় তিনিও শিক্ষিত এবং শিক্ষার উন্নতিকল্পে যত্নবান ছিলেন। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পর মেডিকেল কলেজের যে সভা হয়, তাহাতে রাজা

কৃষ্ণনাথ হেয়ার সাহেবের প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া তজ্জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। সকলেই ভাবিল, কালে রাজা কৃষ্ণনাথের যশ এবং কীর্ত্তি সমগ্র ভাবতে বিস্তৃত হইবে। কিন্তু সে আশা মিটিল না। যৌবন অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই রাজা কৃষ্ণনাথ এ পাপ পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন। বাস্তবিক তাঁহার মৃত্যুঘটনা যারপর নাই শোচনীয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কোন উদ্ধত-স্বভাব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য রাজা কৃষ্ণনাথের উপর শমন জাবী হইল। প্রকাশ্য ফৌজদারী আদালতে হাজির হওয়া এবং ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হওয়া তিনি নিতান্ত লজ্জাকর মনে করিলেন এবং কলিকাতা যাইযা বন্দুকের গুলিতে আত্মঘাতী হইলেন। রাণী স্বর্ণময়ী যৌবনে পদার্পণ করা মাত্রই (১৭ বৎসর বয়সে) বিধবা হইলেন। স্বামী হারাইয়া শোকে অধৈর্য্য হইলেন। বিপদের উপর আবার বিপদ উপস্থিত হইল। মৃত রাজা কৃষ্ণনাথ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কোম্পানীকে দান করিয়াছেন, এই মর্ম্মে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একখণ্ড উইল বাহির করিয়া সমস্ত সম্পত্তি দাবী করিলেন। এক মাত্র স্ত্রীধন ভিন্ন রাণী স্বর্ণময়ীর জীবনোপায় কিছু রহিল না। তিনি নির্ব্বাক হইয়া সমস্ত সহিতে লাগিলেন। মিতব্যয়িতার বলে কয়েক বৎসরের মধ্যে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া, সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সুপ্রিমকোর্টে কোম্পানীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করিলেন। আদালতে উইল মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হইল। রাণী স্বর্ণময়ী সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি যে সময় বিশাল কাশিমবাজার ষ্টেটের কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন, তখনও তিনি সম্পূর্ণ যুবতী। সম্পত্তির দখল লইয়া দেখিলেন, কোম্পানীর সময়ে যারপরনাই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে এবং আয় এত কমিয়াছে যে, তদ্দ্বারা সদর রাজস্ব আদায় হওয়াও দুষ্কর। সেই সময় তিনি মৃত রায়বাহাদুর রাজীবলোচন রায়কে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। রাজীবলোচন প্রভূত ক্ষমতা বলে সম্পত্তির আয় ৩২ লক্ষ টাকাতে পরিণত করিয়াছিলেন। অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াও রাণী স্বর্ণময়ী সর্ব্ব প্রকারের বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া কালাতিপাত করিতেন। দিনে এক বেলা মাত্র আতপ তণ্ডুল এবং শাক সবজী আহার করিতেন। মাটীর উপর কম্বল পাতিয়া তিনি নিদ্রা যাইতেন। সামান্য থানের ধুতি পরিতেন। দেবসেবা এবং পরোপকার তাঁহার জীবনের দুইটী প্রধান ব্রত ছিল। তাঁহার দানের সীমা ছিল না। ন্যূনকল্পে তাঁহার দানের

পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকার বেশী হইবে। ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে তিনি প্রায় ১॥ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। বহরমপুরের কলেজ এবং জলের কল তাঁহার অর্থে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিপোষিত। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র এবং অসীম দানশীলতার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহারাণী উপাধি দান করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর মহারাণীকে জানাইলেন যে, তাহার ভাবী উত্তরাধিকারীকে "মহারাজা" উপাধি দেওয়া হইবে। পরিশেষে মেম্বর অব্ দি ইণ্ডিয়ান অর্ডার অব্ দি ক্রাউন অব্ ইণ্ডিয়া উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছেন। রাজীবলোচনের মৃত্যুর পর মহারাণী রায় বাহাদুর শ্রীনাথপালকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর গত হইল তিনি সি, আই, উপাধি পাইয়াছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী ৭১ বৎসর বয়সে (১৩০৪) ১০ই ভাদ্র, বুধবার, স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে তাঁহার শাশুড়ী হরসুন্দরী সম্পত্তির মালীক হইয়াছেন। রাণী হরসুন্দরী কাশীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া বাবু মণীন্দ্রনাথ নন্দী কাশীমবাজারের রাজগদীতে বসিয়াছেন এবং মহারাজা উপাধি পাইয়াছেন। জগদীশ্বর মণীন্দ্র বাবুকে দীর্ঘজীবী করুন।"

আশ্বিন, ১৩০৪।

দেশের উপরকার দশজন।

আমরা কোন এক প্রবন্ধে লিখিয়াছি, দেশের উত্থান এবং পতন, ব্যক্তি-সাধারণের সঞ্চিত পুণ্য এবং পাপের পরিণাম ফল। ব্যক্তি-সাধারণের পুণ্যের জোরে দেশের উত্থান হয়, আবার সেই জাতির ব্যক্তিগণের চরিত্র এবং নীতি যখন শিথিল হয়, মনের গতি পাপের দিকে ধাবিত হয়, তখন দেশ অলক্ষিত ভাবে পাপের পথে চালিত হয়। জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য পুণ্যরাশি দেশের উত্থানের পক্ষে যেরূপ সহায়, পৃথিবীর নানা সম্প্রদায়ের উত্থান-ইতিহাসে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য পাপরাশিও, পর্য্যায়ক্রমে, দেশের পতনের মূল কারণ রূপে সময়ে সময়ে জগতে যে কাজ করিয়াছে, নানা সম্প্রদায়ের অধোগতির ইতিহাসে এ কথাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। মহাজন বলেন, যোগ্যতমের অবিষ্ঠান এ জগতে অপরিহার্য্য (Survival of the fittest) কথাটার অন্ত অর্থ, পুণ্যবানের জয় এ জগতে অপরিহার্য্য। কেন না, এ জগতে অজের

শক্তি কেবল পুণ্য এবং নীতির। যে দেশের উপরের লোক সাধারণ পুণ্যবান, সে দেশের নিম্ন শ্রেণীও পুণ্যে অনুপ্রাণিত, আর যে সমাজের উপরের লোক-সাধারণ উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র, সে সমাজের নিম্নশ্রেণীও পাপের কীট।

প্রবীণ লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, নীতি ও পুণ্যবানদিগের চরিত্র দ্বারাই দেশ বা সমাজ চালিত। কথাটা যদিও ঈশা, মুশা, বুদ্ধ, মহম্মদ, ম্যাটসিনি, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতির সমকালীন ঘটনারাশি দ্বারা তত প্রমাণিত হয় না বটে, তবু স্বীকার করিতে হইবে, কালক্রমে ইঁহাদের চরিত্রই দেশ ও সমাজে অজেয় প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়াছে। অন্য দিকে, পৃথিবী যাহাদিগকে বড় লোক বলে, অর্থাৎ টাকায় যাঁহারা বড়, তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা যে দেশের পতনের কারণ, কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে? উত্থানের সময় মহাপুরুষদিগের পুণ্যে দেশ জাগে, পতনের সময়ে, উপর-কার দশজনের পাপরাশিতেই দেশ ধ্বংস পায়। রোম এবং গ্রীস, মিসর এবং ভারতের উত্থান পতনের ইতিহাসে এ কথার প্রমাণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পৃথিবী যখন পুণ্য ও নীতির পরিবর্ত্তে কেবল টাকার বশ হয়, তখন তাহার পতন অপরিহার্য্য। উপরের দশ জনের কুদৃষ্টান্তে দেশের কতদূর অধোগতি হয়, এ কথার প্রমাণ আমরা প্রতিদিনের ঘটনারাশিতে পাইতেছি। আমরা এক সময়ে রাঁচি পরিদর্শনে গিয়াছিলাম। সেখানকার কোল জাতির লোকেরা অনেকেই মদ্যপান করিয়া থাকে। হাটের দিন রাঁচিতে বহু কোলের সমাগম হয়। আমরা দেখিলাম, দলে দলে কোল জাতীয় লোকেরা মদের দোকানে ঢুকিতেছে এবং সুরায় বিভোর হইয়া ফিরিতেছে। প্রাণে বড় যাতনা পাইয়া, তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। তাহারা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল, একে একে সে সকল খণ্ডন করিয়া, দেখাইতে লাগিলাম। তাহারা অবশেষে বলিল—"যদি মদ্যপানে অপকারই হইবে, তবে, বাঙ্গালী বাবুরা মদ্যপান করেন কেন?" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, কে কে মদ্যপান করে? তাহারা একে একে সেখানকার অধিকাংশ গণ্যমান্য বাঙ্গালী বাবুর নাম করিল। আমরা লজ্জায় অধোমুখ হইলাম। লজ্জায়, দুঃখে এবং ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া, কুদৃষ্টান্ত কেন নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অতি অল্পেই সংক্রামিত হয়, সে বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমরা যেন যুদ্ধে পরাস্ত হইলাম। তার-পরও অনেক কথা বলিলাম বটে, কিন্তু সে কথা তাহাদের মনে লাগিল না।

রাঁচির জেলা স্থলে, সেই সময়ে যে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহাতে এ বিষয়টী উল্লেখ করিয়া মনের দুঃখ কতক নিবারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখীর কথা শুনে কে? সেই হইতে যতই এ কথা ভাবিতেছি এবং যতই নিম্ন শ্রেণীর সহিত মিশিতেছি, ততই দেখিতেছি, বুঝিতেছি, উপরকার দশ জনের কুদৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে অধিকাংশ লোকই ব্যতিব্যস্ত। বিরুদ্ধে বলিলে অমনি লোকেরা বলিয়া উঠে—"অমুক বড় লোক করেন, অমুক জমীদার করেন, অমুক পুরোহিত করেন আমরা করিব না কেন?" বঙ্গ প্রদেশের কথা আলোচনা করা যাউক। পোষাক পরিচ্ছদের সহিত এ দেশের বড় লোকদিগের অমিতব্যয়িতা, দুর্নীতিপরায়ণতা, অসচ্চরিত্রতা নিম্ন শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে। অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, বঙ্গদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অনেকটা ভাল। অনেকটা ভাল ছিল, এ কথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ভাল নাই। দেশের উপরকার দশ জনের কুদৃষ্টান্তে, দিন দিন তাহারাও বিলাসিতার পথে গমন করিয়া ব্যভিচার এবং মদ্যপানে বিভোর হইতেছে। আমরা ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, এ দেশের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ কেবল অজন্মা নয়, কেবল বিদেশের রপ্তানি নয়, অংশত, বিলাসিতা, অমিতব্যয়িতা এবং চরিত্রহীনতাও। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ভারতের অনেক উপকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে জাতি সাধারণে যে স্বাধীনতার স্বর্গীয় প্রভাব প্রদান করিয়া বিলাসিতার শ্লথ ভাবে সকলকে আকর্ষণ করিয়া, এদেশের যে কি মহা অনিষ্ট করিতেছেন, ভাবিলে আমাদের ধমনীতে রক্ত শুষ্ক এবং নিশ্চল হইয়া যায়। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষতার অপর নাম উদাসীনতা। এই উদাসীনতা লোক-সাধারণের ধর্ম্মহীনতার প্রধান কারণ হইয়া পতনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতেছে। শিক্ষার নামে দুশ্চরিত্রতা, সভ্যতার নামে বিলাসিতা, এবং বাবুগিরি, ধর্ম্মের নামে কপটতা, প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনাই দিন দিন প্রশ্রয় পাইতেছে। তুমি সমাজের উপরকার দশ জনের একজন, টাকার মছলন্দে বসিয়া তুমি আমাদের কথা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছ না, তাহা বুঝিতেছি। তুমি মদ্যপানে বিভোর, চটিয়া লালে লাল হইতেছ, তাহাও বুঝিতেছি। কিন্তু তোমার পা ধরিয়া মিনতি সহকারে বলিতেছি, একবার ভাবিয়া দেখ, দেশের কি শোচনীয় অবস্থা। তুমি সুশিক্ষিত, তুমি পণ্ডিত, তুমি যদি বিলাসিতাকে উপেক্ষা এবং মিতব্যয়িতাকে সম্বল করিতে পারিতে, তুমি যদি নীতি ও পুণ্যের পরিধানে

পরিশোভিত হইতে পারিতে, তবে না জানি তোমার দ্বারা সমাজের কত উপকার হইত। জিজ্ঞাসা করি, তোমার বাবুগিরি ও বিলাসিতা বড়,তোমার জাঁকজমক, পোষাক পরিচ্ছদ বড়, না তোমার পাণ্ডিত্য বড় ? তোমার বেশ-ভূষার পারিপাট্য, না তোমার শিক্ষা এবং পাণ্ডিত্য তোমাকে এদেশে সম্মানিত করিয়াছে, বলত ? স্থির হও, তুমি দেশের প্রতিনিধি, বিচলিত হওয়া, উত্তেজিত হওয়া তোমর পক্ষে সাজে না। তুমি ত গিয়াছ, তোমার কুদৃষ্টান্তে তোমার পরিবার, তোমাব সমাজ, তোমার দেশ অধঃপাতে যাইতেছে, ভাবিতেছ কি ? তুমি ঋণ করিয়া ঘি খাইতেছ, গাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া বড় মানুষী চাল চালাইয়া, দশ জনকে ভোজ দিয়া বড় লোক বলিয়া প্রতিভাত হইতেছ, শেষে, হায় অবশেষে দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাইয়া বাহাদুরি দেখাইবার আয়োজন করিতেছ, তুমি জান না, তোমার এই কুদৃষ্টান্তে লোকেব কি সর্ব্বনাশ হইতেছে। অন্তিমকালে তোমার সঙ্গে না যাইবে তোমার টাকা কড়ি, না যাইবে গাড়ী যুড়ি, পোষাক পরিচ্ছদ এবং বাবুগিরি। তবে কেন মজিতেছ ? পূর্ব্বে এদেশে এই শিক্ষা ছিল, ঋণ পরিশোধ না দিলে নিরয়গামী হইতে হয়। এখন তুমি দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাইয়া, বা তাহাব কথা উল্লেখ করিয়া, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছ, ইহাই বুদ্ধির প্রাখর্য্য, পুরুষকার, ইহাই মহত্ব। পূর্ব্বে এই শিক্ষা ছিল, নিবৃত্তিই ধর্ম্মের মহাসাধন, এখন তুমি প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া, মদ্যপান এবং ব্যভিচারকে সভ্যতার ভূষণ প্রতিপন্ন কবিবার জন্য, ধীরে ধীরে বিষপাত্র চুম্বন কবিতেছ। আপনি রসাতলে যাইতেছ, কিন্তু একবাবও ভাবিতেছ কি যে, সেই সঙ্গে তোমার জাতিকে, তোমার সমাজকে এবং তোমার দেশকেও ডুবাইতেছ ? তোমার ব্যভিচাব, তোমাব মদ্যপান, তোমার বিলাসিতা, তোমার সুরঞ্জিত, সুসজ্জিত, সুরভিত কেশ ও পোষাক-গরিমা তোমার নামকে এ জগতে অক্ষয় এবং পরকালে অমর কবিতে পারিবে, ভাবিতেছ কি ? ছি, ছি, ছি, বঙ্গালয়েব বেশ্যার অভিনয়কেও তুমি ভাল বলিতে অবসর দিতেছ, দেখিতেছি। তোমাব সহিত কেবল সম্বন্ধ থাকিলে, কোন কথা বলিতাম না। তুমি রসাতলে যাইতে বসিযাছ, যাও, কোন দুঃখ ছিল না, কিন্তু তুমি উপবের দশ জনেব একজন, তোমাব কুদৃষ্টান্তে সমাজ ও দেশ যায় যে ! ! তুমি মিথ্যার আশ্রয় লইয়া সত্য গোপনেব চেষ্টা করিতেছ, জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মুসলমানের রন্ধন করা কুক্কুটমাংস দ্বারা উদরপূরণ করিয়া, শেষে কিছুই খাও নাই বলিয়া, সভায় মিথ্যা

ঘোষণা করিতেছ, তুমি বুঝ না যে, তোমার এ চাতুরী ধরা পড়িতেছে। চাতুরী ধরা পড়িতেছে এবং তোমার কুদৃষ্টান্তে জাতিভেদের মূল বিচ্ছিন্ন হইতেছে, এবং ক্রমে কপটতা এবং মিথ্যার জাল বিস্তৃত হইতেছে। তুমি গোপনে স্বাস্থ্যের ধুয়ায় মদ্যপান করিতেছ এবং প্রকাশ্যে বলিতেছ, মদ্যপান কর না, কিন্তু তোমার ভৃত্য, তোমার পুত্র কন্যা এবং পরিবারের সকলের চক্ষুকে ও নাসিকাকে আবৃত করিতে পারিতেছ কি? তাহারা তোমার কুদৃষ্টান্তে ঐ দেখ অল্পে অল্পে কি বিষপাত্র চুম্বন করিতেছে। তোমার গুপ্ত প্রণয়, পরিবারে, সমাজে, দেশে সংক্রামিত হইতেছে,—তোমার মিথ্যা প্রবঞ্চনা পরিবারে, সমাজে এবং দেশে সংক্রামিত হইতেছে। তোমার ধর্ম্মহীনতা, দুশ্চরিত্রতা এবং অপবিত্রতায় অনুপ্রাণিত হইয়া তোমার বংশধর, তোমার সমাজ এবং তোমার দেশ, পতনের দ্বারে উপস্থিত। তুমি শুনিয়াও শুনিবে না, তুমি বুঝিয়াও বুঝিবে না, এ দেশের মঙ্গল হইবে কিসে? হায়রে নবাবী!!

এ দেশের উপরের দশজন ধর্ম্মহীনতায় পরিম্লান এবং বাহ্যচটক ও বেশ-ভূষার পারিপাট্যে উজ্জ্বল। এই ধর্ম্মহীনতার সহায়—সুসভ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট। গবর্ণমেণ্টের আমদানি করা সভ্যতার নামে এ দেশে না চলিতেছে, এমন জঘন্য কাজ নাই। আমরা এ দেশের কোন এক রাজার মন্ত্রীর কথা শুনিয়াছি। তিনি রাজপুত্রের চরিত্র কলুষিত করিতে যে সকল কদর্য্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও শুনিয়াছি। রাজপুত্রকে ডুবাইতে পারিলে মন্ত্রী স্বেচ্ছাচারী হইয়া রাজ্যশাসন করিতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। রাজপুত্রকে বিলাসিতা, মদ্যপান এবং ব্যভিচারে ডুবাইতে পারিলে আর ভাবনা কি? কে তাঁহার কাজে বাধা দিবে? তিনি রাজপুত্রকে ডুবাইতে কৃতকার্য্য হইয়া আজও দুর্দ্দান্ত প্রতাপে অত্যাচারের সিংহাসনে বসিয়া নরনারীর রক্ত শোষণ করিতেছেন। তাঁহার কুকার্য্য নিরোর কার্য্যও প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে। এ দেশের এক জাতীয় নিম্নশ্রেণীর রমণীরা শিশুদিগকে অহিফেন সেবনে নিদ্রিত করিয়া শেষে স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হয়। এই মন্ত্রীও পাপ-অহিফেনে রাজপুত্রকে সুষুপ্তিতে ডুবাইয়া স্বকার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বুঝি বা, গবর্ণমেণ্টও সভ্যতার মোহিনী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, ধর্ম্ম উদাসীনতা-অহিফেন সেবন করাইয়া, চাকরী এবং উপাধির প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া, এদেশের উপরকার দশজন মানব শিশুকে সুষুপ্তিতে ডুবাইয়া স্বকার্য্য সাধনে তৎপর! কেহ কেহ বলেন, অহিফেন এবং মদের ব্যবসায়ের ফাঁদে মানুষকে

ফেলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বকার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য। এজন্য এদেশে এবং বিলাতে বিষম আন্দোলনও চলিতেছে। কিন্তু অহিফেন এবং মদ্য দেশের অধিক সর্ব্বনাশ করিতেছে, না, ধর্ম্মহীনতা দেশের অধিক সর্ব্বনাশ করিতেছে? প্রলোভন বাহিরে, না মানুষের অন্তরে? নিবৃত্তি গৈরিক বস্ত্রে, না মানুষের হৃদয়ে? ধর্ম্মহীনতা-অহিফেন এবং নীতির প্রতি উদাসীনতা-মদ্য দেশের যে সর্ব্বনাশ করিতেছে, বাহিরের মদ্যপান এবং অহিফেন তাহার নিকট তুচ্ছ। স্কুলে স্কুলে দেশের ভাবী সন্তানগণ নীতির প্রতি অনাস্থাবান হইয়া, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া যে সংসারে প্রবেশ করিতেছে, সে সংসারে পাপ, দুর্নীতি জীবন্ত দৃষ্টান্ত রূপ ধরিয়া বিভীষিকা দেখাইয়া সকলকে আতঙ্ক করিতেছে। বালকেরা পিতৃকুলের দুশ্চরিত্রতায় দীক্ষিত হইতেছে। দিন দিন এইরূপে চতুর্দ্দিকে দুশ্চরিত্রতার রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে। তারপর? তারপর আর বলিব কি? ঘোর দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। আর গবর্ণমেণ্ট, যখন দেখিলেন, সকলে সুষুপ্তিতে ডুবিয়াছে, তখন সীমান্ত প্রদেশে, কি আর কোন রাজ্যে, দিক কাঁপাইয়া বাহ্যবিস্তারে চলিতেছেন। হঠাৎ যদি কোন কুমতিজনক কোন কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছেন অমনিই তাহাকে ধরিয়া জেলে দিতেছেন। উপাধিতে বা চাকরীর মায়ায় যাহারা ভুলিলেন না, Hon'ble শব্দটীর মোহমন্ত্রে যাঁহারা পোষ মানিলেন না, তাঁহাদের জন্য পুরাতন অকর্ম্মণ্য Sedition আইন, নূতন টীকা টিপ্পনীতে জীবিত হইয়া উঠিতেছে!! ভয়ে সকলে জড়সড়। যাঁহারা একটু একটু মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহারা আবার সুনিদ্রায় নিমগ্ন! দেশের সেবা ভাল, না, আপনার সুখ ভাল? পরের উপকার ভাল, না ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ভাল? এই প্রশ্নের মীমাংসা উপরকার দশ জন কুদৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপ প্রতিপন্ন করিতেছেন, যথা—"সেবা—মহা ভুল, প্রতিপত্তি এবং সম্মানই জগতে ধন্য। পরের উপকার বাতুলের প্রলাপ, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই জগতে ধন্য!! ধার করিয়া ঘি খাইয়া, তেজিয়ান হইয়া, বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া, গাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া, শেষে ঐ সোণার বাজারের, নব বৃন্দাবনের নব রসে মত্ত হও। সোণার পাত্রে মদ্যপান করা অপেক্ষা আর কিসে সুখ আছে? কিসের দেশ সেবা, কিসের পরের উপকার? ইহা মিথ্যা কথা, ইহা প্রলাপ। জানিও, ইহার পরিণাম ঐ জেল।"

গবর্ণমেণ্টও ধন্য, এবং এ দেশের উপরকার দশজনও ধন্য! আর দেশ

এবং সমাজ? তাহা ডুবাইবার জন্য যখন এত আয়োজন, তখন তাহাকে রক্ষা করিবে কে? দেশের রাজা করিলেন না, দেশের উপরকার দশ জন করিলেন না, এখন কে করিবে? এই শোচনীয় অবস্থাতেও যদি কোন ক্ষণজন্মা পুণ্যবান মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যদি কোন ম্যাট্সিনি বা পার্কার, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের উদয় হয়, তবে বুঝিবা কোন সময়ে দেশ রক্ষা পাইতে পারে। শুনিয়াছি, মহাপাপে দেশ ডুবিলে ভগবানের প্রভাব দেশোদ্ধারের নবপুণ্যবীজ বপন করেন। এদেশ যখনই পাপে ডুবিয়াছে, তখনই বিধাতা উদ্ধার করিয়াছেন। আবার কি সেই দিনের অভ্যুদয় হইবে না? অধোগতির আর কি অবশিষ্ট আছে? উপরকার দশজন যে অধর্ম্মের বিষ পান করিয়া, নির্লজ্জের ন্যায় তা-ধেই তা-ধেই করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, উহাতে দেশ অনুপ্রাণিত। পাপে তাপে এদেশ ডুবিয়াছে!! মহা পতনের মহান্ধকারে এদেশ নিমগ্ন!! বিধাতার কৃপা ভিন্ন আর রক্ষা নাই। প্রভু, বল, পুণ্যবীজ বপনের সময় আজও কি উপস্থিত হয় নাই?

অগ্রহায়ণ ১৩০৪।

সেকালের এবং একালের ব্রাহ্ম।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমি যে সকল কথা লিখি, তাহাতে ব্রাহ্মসাধারণের অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, পদে পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিরক্তি, অসন্তোষ, ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, মূর্ত্তিমান আকারে, চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা লিপিবদ্ধ এবং মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এজন্য তিনি নিন্দুকের রসাল জিহ্বার তলে পতিত হইতেছেন কিনা জানি না, আমি তাহা নবাভারতে ছাপাইয়াছি বলিয়া ক্রোধ প্রবল হইয়া জিহ্বার সাহায্যে বর্ষিত হইতেছে। অবস্থা এইরূপ, এক ব্যক্তি বড়লোকের ধনরাশি ঠকাইয়াছে, সে যেন অপরাধী নয়, কিন্তু যে তাহা ব্যক্ত করিতেছে, সে-ই অপরাধী। একজন অন্যের ধন চুরি করিয়া বা অন্যের মহা অনিষ্ট করিয়া অশান্তির আগুন জ্বালিতেছে, সে যেন অপরাধী নয়, যে তাহা প্রতিকারের চেষ্টা করিবে, সেই অপরাধী। বুদ্ধি, বিদ্যা, চাতুর্য্য, ধাম্মিকতা, সকলেরই বাহাদুরী। বলিহারি যাই।

আমি নিজে ব্রাহ্ম,—যে সকল দোষের কথা বলি, তাহাতে আমিও দুষ্ট।

নিজে দুষ্ট হইয়াও দোষের কথা লিখি কেন? তোমাদের পরশ্রীকাতর মনে আমার প্রতি যে অভিসন্ধি আরোপ করার ইচ্ছা থাকে, তাহা কর। করিয়া সুখী হও, এবং স্বর্গ মর্ত্ত্যের ধর্ম্মপথ আবিষ্কার কর। আমার মনে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল ভিন্ন অন্য কোন কামনা নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন যে অমৃত বৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, মহাত্মা কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং বিনয়ের অবতার রামতনু এবং রাজনারায়ণ যাহার জন্য শরীরের রক্ত জল করিয়া অমর চরিত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষে আজকাল বিষময় ফল ফলিতেছে, ইহা ভাবিলে প্রাণে দারুণ জ্বালা উপস্থিত হয়। হায়, হায়, কি সোণার বৃক্ষে কি ফল ফলিতেছে॥

এই পৌষ মাসে আমি একদিন দেবগৃহে দেবোপম-চরিত্র শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বাবুর শ্রীচরণ সন্দর্শনে গিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ, রামতনু এবং রাজনারায়ণ এখন ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিস্তম্ভ স্বরূপ, ইঁহাদের তিরোধান হইলে ব্রাহ্মসমাজের যে হীনাবস্থা হইবে, তাহার বিষয় আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনা হইয়াছিল, বিজয়কৃষ্ণ, রামকুমার এবং শিবনারায়ণ ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে। প্রতি মানুষের একভোটে (One man one vote) ধর্ম্মসমাজের মঙ্গল হইতে পারে না, প্রতিষ্ঠ-চরিত্র প্রবীণ ব্যক্তিগণের কথা শিথিল চরিত্র যুবকগণের দ্বারা উপেক্ষিত, অবহেলিত হইতে পারে, কথা হইয়াছিল। তিনি বলেন, ধর্ম্মসমাজ আবার সাধারণের কি? সাধারণের সমাজ হইলেই দুর্নীতি প্রশ্রয় পাওয়া অপরিহার্য্য। আর যে সকল কথা হইয়াছিল, অদ্যকার প্রস্তাবের সহিত তাহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। রাজনারায়ণ বাবুর সহিত আলোচনার পর ব্রাহ্মসমাজের অনেক কথা ভাবিয়াছি। যত ভাবিয়াছি, ততই বেদনা পাইয়াছি। মনে দারুণ চিন্তা এবং হৃদয়ে বেদনা লইয়া কলিকাতা আসিয়া আবার যে সকল কথা শুনিলাম এবং যে সকল ঘটনা ঘটিতে দেখিলাম, প্রাণ তাহাতে অবসন্ন। ভাবিতেছি, সমাজের হইল কি?

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মূল মন্ত্র ছিল, উদারতা এবং ধর্ম্মনিরপেক্ষতা। এই উদারতা এবং ধর্ম্মনিরপেক্ষতার গুণে এদেশে অমৃত ফল ফলিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ, রামতনু, রাজনারায়ণ, সেই উদারতা এবং নিরপেক্ষতার

ফল। এই সকল মহাজনেরা কি করিয়াছেন, কি দেখাইয়াছেন, অল্লাধিক পরিমাণে অনেকেই জানেন, সুতরাং বিবৃতির প্রয়োজন নাই। ইঁহাদের সংস্পর্শে এবং চরিত্র ছায়ায় মহাত্মা কেশবচন্দ্রের উদয়। কেশব চন্দ্রের উদয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের চরমোন্নতি, একই কথা। তাঁহার জীবন এবং সকল-ধর্ম্ম-সমন্বয় একই কথা। তিনি বিশ্বজনীন উদারতা এবং স্বাধীনতার মহা সম্মিলন সংঘটন করিয়া যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বহুযুগ লাগিবে। তাঁহার জীবনাদর্শে কলিকাতার প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, ত্রৈলোক্যনাথ, উমেশচন্দ্র, শিবনাথ প্রভৃতি এবং মফঃস্বলের আরো অনেক মহাজনদিগের অভ্যুদয় হয়। শেষে কি কুক্ষণে এবং কি অলক্ষণে যে বিষপোকা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিল, ভাবিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। শিবনাথ এবং আনন্দমোহন উদারতায় ধর্ম্মাধিপত্যের বিভীষিকা দেখিয়া, স্বাধীনতা,বনাম স্বেচ্ছাচারিতার নিশান হস্তে লইয়া কলিকাতার রাস্তায় অবতরণ করিলেন। কুচবেহার বিবাহ অনুকূল হইল—প্রতিবাদ ও আন্দোলন উঠিল। প্রতিবাদ এবং আন্দোলনের অর্থ, অবাধ পরনিন্দা। চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল, বড় ছোট, জ্ঞানী মূর্খ, ভক্ত অভক্ত, সবাই সমান, সকলেরই এক ভোট। ভোটবাদিগণ দলে দলে জুটিলেন। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার অসংযত ও উশৃঙ্খল সমালোচনা-প্রবাহ বহিতে লাগিল। কখন দেখি, কেহ সুলভ সমাচারকে পদ দ্বারা মর্দ্দন করিতেছেন, কখনও দেখি, কেহ কেশব বাবুর নাম মৃত্তিকায় অঙ্কিত করিয়া পাদুকা দ্বারা আস্পর্দ্ধা সহকারে মর্দ্দন করিতেছেন। সে সকল ঘৃণিত কথার উল্লেখ করিতেও দুঃখে হৃদয় অবসন্ন হয়। এইরূপে মহাজন-নিন্দার গরল উঠিল। বুঝি বা সেই পাপের ফলে এখন ব্রাহ্মসমাজ ভুগিতেছেন।

ক্রমে সাধারণ-ব্রাহ্ম সমাজ-প্রতিষ্ঠিত হইল, উপাসনার প্রকাণ্ড মন্দির উঠিল। ইহার ট্রষ্ট-ডিডে লেখা আছে, কোন ব্যক্তি বা কোন ধর্ম্মের নিন্দা এই মন্দিরে হইবে না। কিন্তু স্বকর্ণে শুনিয়াছি, এই মন্দিরে বিজয়কৃষ্ণ আনন্দ করতালি তুলিয়া কেশবচন্দ্রের নিন্দা ঘোষণা করিয়াছেন। রামকুমারের সহিত এই সময়ে কয়েকবার মফঃস্বল ভ্রমণ করিয়াছিলাম, তখন দেখিয়াছি, তাঁহার মুখে অন্য কথা নাই, কেবল কেশব বাবুদের নিন্দা। প্রতিদিন এজন্য বহুবার তাঁহার সহিত বিবাদ করিতাম। সাত বৎসর পর তিনি স্বীকার করিয়াছেন, নিন্দা করিয়া অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন। নিন্দা-পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য কি না, কে জানে, বিজয়কৃষ্ণ এবং রামকুমার ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নবনব সাধনপথ আবিষ্কার করিয়া দল বাঁধিয়াছেন। নিন্দা যখন মানুষের মূল-মন্ত্র হয়, হিংসা এবং ক্রোধ তাহার আশ্রয় লয়। প্রতিহিংসা এবং ক্রোধ ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্ম-হৃদয়ে এমন বদ্ধমূল হইতে লাগিল যে, ধর্ম্ম, উদারতা, ধীরতা, সহিষ্ণুতা, পুণ্য, পবিত্রতা, সৎসাহস ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল। একথা যখন পত্রিকায় ঘোষিত হইতে লাগিল, তখন লাইবেল কর, এই মূল মন্ত্র উঠিল। আমি লিখিব কি, লজ্জায় মরিয়া যাই, নিন্দা-গরল পান করিয়া যে সকল মহাজনদিগের অভ্যুদয় হইতেছে, তাঁহাদেরই অনেকেরই না আছে চরিত্র, না আছে ধর্ম্ম, না আছে সৎসাহস, না আছে পুণ্যের জোর। তবে আছে কি?—ভীরুতা, কাপুরুষতা, পাপ-স্পৃহা, অহঙ্কার, হিংসা, বিদ্বেষ, বিলাসিতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, আত্মম্ভরিতা এবং এবম্বিধ অশেষ গুণরাশি। এক সময় এমন ছিল, যখন এদেশের লোকেরা ব্রাহ্মের নাম শুনিলেই শ্রদ্ধা করিত, আর এখন? এখন ব্রাহ্ম নাম শুনিলেই সকলে কর্ণে অঙ্গুলি দেয়। ইহার কারণ কি? কারণ কি কিছু নাই? ব্রাহ্ম বলিলেই এখন অনেকে বুঝেন, যে ব্যক্তি ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া প্রতারণা করিতে পারে, যে ব্যক্তি অন্যের নিন্দা দ্বারা নিজের সহস্র দোষ ঢাকিতে পারে, সে-ই ব্রাহ্ম। কি দুঃখের কথা! মহাজন-দিগের মহত্ত্ব স্মরণ ও চিন্তনে মানুষের মহত্ত্বের উদয় হয়। নিন্দা-কীর্ত্তনে আত্মা কলুষিত হয়, চরিত্র নমিত হয়। নিন্দা বিষপানে ব্রাহ্ম সাধারণের কি অপকার করিয়াছে, যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

প্রতি ব্যক্তিই সমান, বড় ছোট, জ্ঞানী মূর্খ, সাধক অসাধক, ভক্ত অভক্ত, সকলেই সমান, সকলেরই এক ভোট॥ স্বাধীনতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা কেহ কখনও শুনিয়াছ কি? স্বাধীনতার মহা-কেন্দ্র ইংলণ্ডেও কৃতি ও পণ্ডিত লোকের আদর, বৃদ্ধ ও বুদ্ধিমানের আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; আর এখানে সবাই সমান॥ চরিত্রবান শিবনাথ আর অগঠিত-চরিত্র আমি সমান! তাঁহারও একভোট, আমারও একভোট॥ ত্রিংশ বৎসর-ব্যাপী সাধনার ফলে যে উমেশচন্দ্রের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহাকে অষ্টাদশ বর্ষ-বয়স্ক নবীন যুবক ব্রাহ্ম ভোট-সমতায় আজ অনায়াসেই উড়াইয়া দিতেছে! দিতেছে, দিক। ফল হইতেছে কি? কেমন ব্রাহ্ম সকল উৎপন্ন হইতেছেন? কেমন প্রচারক সকল দেখা দিতেছেন? লিখিব কি, যেন চরিত্র-হীনতার

মহামেলা মিলিয়াছে। সয়তানে সয়তানে কোলাকুলি হইতেছে, চরিত্রহীনে চরিত্রহীনে মিলন হইতেছে, তারপর একদল অন্যদলের বাপান্ত করিয়া মহাকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে কোন সৎকাজ যে না হইতেছে, এমন নহে, সৎকাজের তুলনায় অসৎকাজের বোঝাই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, ঝগড়া এবং বিবাদ, অন্তর্কলহে সমাজ ডুবিতেছে। পূর্ব্বে বিনয় ছিল ব্রাহ্মের প্রধান লক্ষণ, এখন বিলাস তৎস্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্বে অমায়িকতা ও মধুরতা ছিল ব্রাহ্মের অঙ্গের ভূষণ, এখন আত্মম্ভরিতা এবং অহংসর্ব্বস্বভাব সে স্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্বে বিশ্বাস এবং ভক্তি ছিল ব্রাহ্মের একমাত্র অন্নজল, এখন সম্মান, কুলগৌরব, টাকা ও পদ-মর্য্যাদা সে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে সেবা, চরিত্র, অনুরাগ, প্রেম, সত্য ও জ্ঞান-পিপাসা ব্রাহ্মের বিশেষত্ব ছিল, এখন প্রশংসা-পিপাসা, হিংসা ও স্বার্থ সকল সৎগুণের স্থান অধিকার করিতেছে। পূর্ব্বে অন্যের মহত্ত্ব স্মরণ এবং চিন্তন ব্রাহ্ম-জীবনের মহত্ত্বলাভের একমাত্র অবলম্বন ছিল, সেই স্থলে এখন পরনিন্দা, পরচর্চ্চা শোভা পাইতেছে। আর সর্ব্বোপরি অনুদারতা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ঘরে ঘরে বিচরণ করিতেছে। পৃথিবীর আর সকলেই নগণ্য, সকলেই পতিত, সকলেই চরিত্রহীন, কেবল এ ধরায় ব্রাহ্মই একমাত্র মোক্ষের অধিকারী। এইরূপ অহঙ্কার ছোট বড সকলকে আক্রমণ করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে। তুমি হিন্দু, তোমার ছায়া মাড়াইলে ব্রাহ্মের পতন হয়, কেন না, তোমার রুচি-বোধ নাই, তুমি পৌত্তলিক। তুমি খ্রীষ্টান, তোমার ধারে বসিলেও ব্রাহ্মের অকল্যাণ হয়, কেন না, তুমি উপধর্ম্ম মানিয়া চল। হায়, হায়, হায়, এইরূপ করিয়া অহঙ্কার ব্রাহ্ম-শিশুদিগকে বধ করিতেছে। আমি শত মুখে বলিব, অহঙ্কার ও সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষার মূল বিদ্যালয় ব্রাহ্ম-সমাজ। ব্রাহ্ম-সমাজে নিন্দুকের আদর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ব্রাহ্মসমাজ এখন নিন্দুকের দলে পরিপূর্ণ। নিন্দা-বিষে ব্রাহ্ম-সাধারণ জর্জ্জরিত।

এই সকল কথা ভাবিলে সেকালের এবং একালের ব্রাহ্মের পার্থক্য বুঝা যায়। সেকালের ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ, রামতনু, রাজনারায়ণ, ইঁহাদের সমতুল্য লোক এদেশে আর নাই। মধ্য যুগের ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, উমেশচন্দ্র, শিবচন্দ্র, শিবনাথ, ভুবনমোহন প্রভৃতি। কেশবচন্দ্র বাদে এই সকল মহাজনগণের সকলেই জীবিত। এখনকার নব্য ব্রাহ্ম, হিংসা-বাবু, ক্রোধ বাবু, পরনিন্দা বাবু, বিলাসিতা বাবু, প্রতারণা-বাবু, অহঙ্কার

বাবু। এই নব্য-ব্রাহ্মদের বড় কেহই আর ঐ সকল মহাত্মাদিগের মহত্ত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতেছেন না। কারণ কি? কারণ এই,—সকলের ধারণা হইয়াছে,—সকলেই সমান, সকলেরই সমান অধিকার। আর কারণ এই—পরনিন্দার গরল পান করিয়া সকলেই বুঝিতেছেন, অল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই দোষ আছে, কেহই মহাপুরুষ নহেন। সাক্ষাতে কেহ কাহারও দোষ বলিবে না, ছোট ছোট ছেলেরাও অসাক্ষাতে বলিবে, মহর্ষির এই দোষ, প্রতাপবাবুর এই দোষ, শিবনাথ বাবুর এই দোষ। সাম্যশিক্ষার বিদ্যালয়ে বৈষম্য শিক্ষা যে দিতে চায়, তাহার লাঞ্ছনার শেষ নাই। একটু একটু এখন এই বৈষম্য শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়া শিবনাথও অপদস্থ হইতেছেন; এবং বুঝিবা মনস্তাপে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিত্ব ছাড়িয়াছেন! দোষ-কীর্ত্তন শিক্ষাই এখন ব্রাহ্মসাধারণের বিশেষ শিক্ষা। সুতরাং চরিত্রানুপ্রাণন এ যুগে অসম্ভব। এ যুগে নিজত্ব ও স্বার্থ সাধন, স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার, এই সকলই আদর পাইবে। পতনের আর কি অবশিষ্ট আছে?

হিন্দু সমাজের লোকের বিশ্বাস, শত পাপ করিয়া গঙ্গাস্নান করিলে তাহা ক্ষালন হয়। এই বিশ্বাসে অবাধে সম্বৎসর সকলে পাপ কার্য্য করে, বৎসরান্তে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হয়। ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেছে, মাঘোৎসবে চক্ষের জলে ভাসিয়া মাতামাতি করিলেই সকল পাপ দূর হয়। এই বিশ্বাসে সম্বৎসর ধরিয়া লোকেরা যাহা তাহা করে, মাঘোৎসবের সময় মহা ধূমধামে কান্নাকাটীর হাট বসাইয়া উদ্ধার হওয়ার আয়োজন করে। ভ্রান্ত বিশ্বাস। যাহার অন্তর পরিশুদ্ধ হয় নাই, শত গঙ্গাস্নান তাঁহার কি করিবে? সেই প্রকার, যাহার অন্তর পরিশুদ্ধ হয় নাই, শত অনুষ্ঠান বা শত মাঘোৎসব তাহার কি করিবে? বৃথা আয়োজন, বৃথা ক্রন্দন। প্রকৃত চরিত্রবান সংযত ধার্ম্মিকের অভ্যুদয় দেখিতেছি না। বলিতে লজ্জায় মুখ অবনত হয়, বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ একটীও মানুষের মত মানুষ—একটীও প্রকৃত বিশ্বাসী ধার্ম্মিক সৃজন করিতে পারে নাই। এমন একটীও ধার্ম্মিক সৃজন করিতে পারে নাই, যাহার রাগ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, বিদ্বেষ নাই, যিনি চরিত্রে অটল, ভক্তি বিশ্বাসে উজ্জ্বল, যিনি বিলাসিতাহীন ও সংযমী বীর। বরং যে সকল ধার্ম্মিক ইহার আশ্রয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দূরে যাইতে বাধ্য করিয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ,

রামকুমার, শিবনারায়ণের সঙ্গে সঙ্গে আর কাহাকে কাহাকে দূরে যাইতে বাধ্য করিয়াছে, ভবিষ্যৎবংশীয়েরা সে বিচার করিবে। মত-নিরপেক্ষতা এবং সহিষ্ণুতার অভাবে, এই সমাজ ক্রমে ক্রমে অতি সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ স্থানে আশ্রয় লইতেছে। মফঃস্বলের সমাজ সকল উঠিয়া যাইতেছে, যাহা আছে, তাহার সহিতও যোগ ছিন্ন হইতেছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্বেচ্ছাচারিতা ও ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের নিশান উড়াইয়া সহরে কি যেন এক অভূতপূর্ব্ব কাণ্ডের আয়োজন করিতেছে। সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, মত দৃঢ়তাহীন, চরিত্র-নীতি ও ধর্ম্মহীন—কিংভূত-কিমাকার এক জীব শ্রেণীর অভ্যুদয় হইতেছে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া এখন মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া এখন মরিয়া বাঁচিতে ইচ্ছা হয়। ঢের দেখিয়াছি, এখন মরিতে পারিলেই বাঁচি।

মাঘ, ১৩০৪।

অসাধারণ দাস দুর্গামোহন।

(জন্ম—৩রা অগ্রহায়ণ, ১২৪৮ সাল, বিক্রমপুরের অধীন তেলিরবাগ, মৃত্যু—৪ঠা পৌষ, শনিবার, ১৩০৪—বেলতলা।)

মানুষ, সব সময়ে মানুষ থাকে না,—কখন দেবত্বে উন্নীত এবং কখনও বা পশুত্বে নমিত হয়। মানুষ যখন স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত, তখন তাহাকে দেখিবে, মদ খাইয়া রাস্তায় পড়িয়া ধূলায় ধূসরিত হইতেছে, স্বৈরিণীর পদতলে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ অন্বেষণ করিতেছে, কি জঘন্য কাজ যে না করিতেছে, হিসাব নাই। এই মানুষই আবার পরার্থপরতা, বা পরমার্থের শক্তি সংঘর্ষণে আসিলে, নিমগ্ন লোকের উদ্ধারার্থ জীবনমমতা বিসর্জ্জন দিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে। কাহাকে বলিবে, খারাপ এবং কাহাকে বলিবে ভাল? চাঁদেও কলঙ্ক আছে, ফুলেও কণ্টক আছে, তিক্ত নিমেও জগতের কত উপকার, কুৎসিৎ কোকিলেরও কেমন মধুর স্বর। বিধাতার লীলা-রহস্য ভেদ করা বড়ই কঠিন নয় কি?

সব মানব আবার সমান নয়, কতক সাধারণ, কতক অসাধারণ। শক্তি বিশেষে প্রতি মানুষই অন্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন, কিন্তু সময়ে সময়ে শক্তি সমষ্টি আত্মসাৎ করিয়া কেহ কেহ অসাধারণত্ব লাভ করিয়া জগৎকে চমকিত করেন। যার যেমন ধারণ করিবার শক্তি, সে সেই পরিমাণে শক্তি

আত্মসাৎ করিতে সক্ষম। নদীর জল সকলের জন্যই, কিন্তু যাহার পাত্র বড়, সে অধিক জল গৃহে তুলিতে সমর্থ। চেষ্টার তারতম্যে পাত্র বড় ছোট হয়;—শক্তি-ক্রীড়ায় মানুষের শক্তি বাড়ে। অনুশীলনের তারতম্যে মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস হয়। চর্চ্চা, মার্জ্জনা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, অনুশীলনের সহায়। অনুশীলনের লক্ষ্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পরমার্থে আত্ম নিমজ্জিত করা। পরমার্থে আত্ম যখন নিমজ্জিত হয়, তখনই মানুষ দেবত্বে উন্নীত,—অন্য সময়ে মানুষ পশুর ন্যায় বা জড়ের ন্যায়।

তুমি, আমি, সে, আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের স্বার্থ বিসর্জ্জিত এবং পরমার্থ সঞ্জীবিত হইলে আমরাও অসাধারণ হইতে পারি, সে কথা এখন থাকুক। আমরাও সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে কোন শক্তিবিশেষের অধিকারী হইয়া হয় ত শ্রেষ্ঠ হইতে পারি, কিন্তু সে কথাও থাকুক। ঘটনা—প্রত্যক্ষ ঘটনা একালে ঘোষণা করিয়াছে, এদেশে কেশবচন্দ্র অসাধারণ, বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ, বিদ্যাসাগর অসাধারণ, মহাবাণী স্বর্ণময়ী অসাধারণ ছিলেন। এ কথার প্রতিবাদ যদি কর, সত্যের অপলাপ হইবে, হিংসার পরিপোষণ হইবে। স্বার্থ ভুলিয়া পরমার্থের চস্‌মা চক্ষে লাগাইয়া চাহিয়া দেখ, বুঝিবে, ইহারা অসাধারণ কি না।

মানুষের কতকগুলি সাধারণ জিনিস আছে, কতকগুলি অসাধারণ জিনিস আছে। সাধারণের উৎকর্ষ সাধিত হইলে স্বার্থের উদয় হয়, অসাধারণের উৎকর্ষ সাধিত হইলে পরমার্থের উদয় হয়। প্রেয় এবং, শ্রেয়, অসৎ এবং সৎ, দুই-ই মানুষে আছে। দেবাসুরের-সংগ্রাম প্রতিনিয়তই মানব-জীবনে চলিতেছে। আসুর শক্তিকে যিনি পরাজয় করিয়াছেন, তিনিই অসাধারণ। অসাধারণের আদর্শ ধরিয়া যিনি চলেন, তিনিই কালে অসাধারণ হন।

আমরা সাধারণ সমাজের মধ্যে থাকিয়া, সাধারণ সাধারণ করিয়া দিবারাত্রি ছুটিতেছি, খাটিতেছি, মরিতেছি। সাধারণ সাধারণ করিতে করিতে আমাদের লক্ষ্যও যেন খাটো হইয়া যাইতেছে, মন ছোট হইয়া উঠিতেছে, উদ্দেশ্য খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে—আমরা যেন দিন দিন সর্ব্ব বিষয়ে মহান অনন্ত হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত হইতেছি। আমরা মানুষের সন্তান, মানুষই থাকিয়া যাইতেছি। আমরা দিন দিন স্বার্থ-সাধনের অতল জলে ডুবিয়া যাইতেছি। হইলামই বা সাধারণ মানুষ, আমরা যে অসাধারণের সন্তান, তাহা

কি মনে রাখিতে নাই ; হইলামই বা সাধারণ, আমরা যে ঈশামুশা, মনু যাজ্ঞবল্ক্য, নানক গৌরাঙ্গের বংশের লোক, মনে রাখিতে নাই কি ? লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গতি, সবই যে আমাদের অসাধারণের দিকে, অনন্তের দিকে, মনে রাখিতে নাই কি ? কেবল সাধারণ, সাধারণ, সাধারণ !!—এমন ভুল ভ্রান্তি ত আর মানুষের দেখি নাই ! যাহা আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট—যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই সন্তুষ্ট—যাহা মিলিয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট। নূতনের কথা বলিও না,—যাহা পাইয়াছ, তাহাতেই তৃপ্ত থাক। সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষা, সাধারণ ভাব ও জ্ঞানচর্চা, সাধারণ প্রেম ও প্রণয়-সাধন, সাধারণ ভজন সাধন, সাধারণ বিশ্বাস ভক্তি অর্জ্জন ;—পূজা অর্চনা, যোগ তপস্যা, আচার ব্যবহার, সকলই সাধারণ রকমের। ব্রাহ্মসমাজ একটুও প্রচলিত সমাজের বা মতবাদের উপরে উঠিবে না। চতুর্দ্দিকে যে চিত্র, এখানে যেন তাহারই পুনরাভিনয় হইতেছে—পৌনঃপুনিক লীলাভিনয় হইতেছে। অসাধারণের সন্তান আমরা অসাধারণ হইব না—হইতে চেষ্টাও করিব না !—এ কি মহাভ্রান্তি ! !

সাধারণ সমাজকে এক অসাধারণ বীর জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম অমর দুর্গামোহন দাস। তিনি সাধারণকে জয় করিলেন কিরূপে ? তিনি জানিতেন, সাধারণ যাহা, তাহা চিরকাল সাধারণ। তিনি জানিতেন, সাধারণের উপর টাকার ক্ষমতা এ জগতে অসীম। এক সময়ে তাঁহার শরণাপন্ন কোন এক বন্ধু ব্রাহ্মসমাজের মত-বিরুদ্ধ গর্হিত কার্য্য করিয়া অপদস্থ হইতেছিলেন। শুনিয়াছি, দুর্গামোহন বাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, দুই হাজার টাকা খরচ করিলেই তোমরা ব্রাহ্মসমাজে উঠিতে পারিবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ টাকার দাস, উপরোক্ত কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে, তিনি এ কথা বিশ্বাস করিতেন। তিনি নিজে অজস্রধারে সমাজের কল্যাণের জন্য টাকা ব্যয় করিতেন বটে, কিন্তু কখন কখন গোপনেও করিতেন। এজন্য মনে হয় না যে, টাকা দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে জয় করার কলুষিত ইচ্ছা তাঁহার ছিল। অলক্ষিতভাবে যদি টাকা কোন রূপে ব্রাহ্মসমাজ-জয়ের সহায়তা করিয়া থাকে, সে কথা আমরা বলিতে চাহি না। তবে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে কিরূপে জয় করিলেন ? সকলেই জানেন, তিনি শেষ বয়সে পুনঃ বিবাহ করিয়া কলঙ্কের বোঝা মস্তকে বহিয়াছিলেন। তিনিও জানিতেন, কাজটা ভাল করেন নাই। শুনিয়াছি, বিবাহের পর লোকে গালাগালি দিলে তিনি হাসিয়া বলিতেন, "আরে ভাই, কাজটা করেছি

কিরূপ,গালাগালি দিবে না ?"* তাঁহার বিবাহের পর এদেশে, ব্রাহ্মসমাজে—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও, তুমুল আন্দোলন উঠে। বীর দুর্গামোহন সে দিকে দৃক্‌পাতও করেন নাই। লেখালেখি বলাবলি অনেক চলে—অনেক মনোমালিন্য ঘটে—যত নীচতা সম্ভব তাহাব অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিন পরেই—দুর্গামোহন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেব সভাপতি পদে ববিত হইলেন। ইতিহাসের এক মহাব্যাপার। আন্দোলনকারীদিগেব মুখ চূর্ণ হইয়া গেল। অসাধারণের ইচ্ছাশক্তি, সাধাবণ ইচ্ছাশক্তিকে এইরূপে জয় করিল। সাধারণের সাধারণত্ব এবং অসাধারণের অজেয়ত্ব এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইলাম।

এই অসাধারণের সহিত আব এক অসাধাবণের সংঘর্ষণ হইয়াছিল, মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি আপনার অজেয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি পুণ্যশ্লোক কালী নারায়ণের পত্নী, তিনি ঋষিতুল্য গিবীশচন্দ্রের ভগ্নী, তিনি অসাধারণ দুর্গামোহনেব শেষ পক্ষেব শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী। তাঁহাব সাত্বিক জীবনে আর কন্যা বা এই জামতার সহিত মিলন হয় নাই। মহীয়সী অজেয়া শক্তিধারিণী মাতৃমূর্ত্তি।

সাধারণকে জয় করিবার শক্তি দুর্গামোহনের বাল্যকাল হইতে ছিল। বাল্য-ইতিহাস, যৌবন-ইতিহাস, প্রৌঢ় বা বার্দ্ধক্যের ইতিহাস—সব অনুসন্ধান কর, এই অসাধারণত্বের পরিচয় পাইবে। অসাধারণ বুদ্ধি, অসাধারণ প্রতিভা, অসাধারণ সাহস, অসাধারণ কর্ত্তব্যপরায়ণতা। বাল্যে শিক্ষা এবং বন্ধুর প্রতি ভালবাসা, দুর্গামোহনের অসাধারণ। যৌবনে বিমাতার প্রতি কর্ত্তব্যপালন, দুর্গামোহনের অসাধারণ। এজন্য দুর্গামোহনকে বরিশালে কত লাঞ্ছনা, কত উপহাস বা বিদ্রূপ বাণ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তদানীন্তনকালের বরিশালবাসী মাত্রেই তাহা জানেন। বিমাতার বিবাহ দিয়া দুর্গামোহন যে অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না। তারপর, তারপর ?—প্রৌঢে পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা অসাধারণ। তারপর—তাবপর ? বার্দ্ধক্যে অপযশেব মুকুট মস্তকে পরিয়া আপনার শেষ বিবাহে যে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাও অসাধারণ। কিন্তু এ সকলের জন্য তিনি সকলের নিকট তত পূজ্য নাও হইতে পারেন, তাঁহার অসাধারণ কীর্ত্তি, দরিদ্রে দয়া, কাতরে করুণা, ব্যথিতে

* তত্ত্বকৌমুদী—১৬ই পৌষ, ১৮১৯ শক, ২১৩ পৃষ্ঠা।

সান্ত্বনা প্রদান। অসাধারণ প্রতিভা এবং বুদ্ধিবলে তিনি যে প্রভূত ধনরাশি সঞ্চয় করিতেন, অম্লানচিত্তে তাহা দীন দরিদ্রদিগকে ভাগ করিয়া দিতেন। শেষ জীবনে, পরিণয়ের পর, তাঁহার এই অসাধারণত্ব, স্বার্থময় সাংসারিকতার প্রতিঘাতে কিছু খর্ব্ব হইয়াছিল, সন্দেহ নাই,—কিন্তু বাল্য হইতে প্রৌঢ় পর্য্যন্ত পরদুঃখকাতরতাশক্তিতে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। আমরা একটা পয়সা খরচ করিতে যত ভাবি, সাক্ষ্য দিতেছি, দুর্গামোহন ১০৲ কি ২০৲ টাকার নোট ব্যয় করিতেও ততটুকু চিন্তা করেন নাই। আমাদিগের মধ্যের একজনের কথা অধিক বলা ভাল নয়, কিন্তু কি করি, সত্যের খাতিরে অম্লানচিত্তে আজ বলিতে হইতেছে, দয়া এবং সংস্কার-ব্রতে দুর্গামোহন ব্রাহ্মসমাজের বিদ্যাসাগর।

আমি দুর্গামোহনের একজন প্রকৃত ভক্ত। একথা বলিতেছি বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, আমি তাঁহার বিবাহ অনুমোদন করিয়াছি। তাঁহার শেষ বিবাহে আমি মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। বিশ্বাস করি, এ বিবাহ না করিলে তিনি আরো দীর্ঘজীবী হইতেন। তিনি আপনিও এ বিবাহকে আদর্শ মনে করিতেন না। শুনিয়াছি, কোন বন্ধুকে এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "আমি রিপু সংযম করিতে পারি না, বলিয়া আমার বিবাহের প্রয়োজন, কিন্তু তাহাতে বন্ধু বান্ধবের আনন্দ করিবার কি আছে?" —ইহা প্রকৃত মহৎ লোকের উক্তি। এই বিবাহ দুর্গামোহনের জীবন-চন্দ্রমার একমাত্র কলঙ্ক। কিন্তু এ সম্বন্ধেও তিনি অধিক দোষী, কি কোন কোন বন্ধু, কিম্বা তাঁহার কোন কোন আত্মীয় অধিক দোষী, আমি জানি না। পূর্ব্বে তিনি যে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই বিবাহ হইলে, বুঝিবা এ কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করিত না। কিন্তু সে সকল ইতিহাসের আলোচনার আর সময় নাই। দুর্গামোহন সমাজ-সংস্কারের অদ্বিতীয় নেতা—যাহা যখন ভাল বুঝিয়াছেন, তাহা করিবার সময় কাহারও ভালবাসা বা সমালোচনার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্যে পরিবার লইয়া বসিবার জন্য তিনি যে তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলেন, আমাদের চক্ষের সম্মুখে সে সকল চিত্র ভাসিতেছে। তিনি, কেবল তিনিই এ সকল পারিতেন। নিন্দা, তিরস্কার, নির্যাতন—বাল্যকাল হইতে এ সকল যেন তাঁহার জীবনের ভূষণ ছিল।

অসাধারণত্বের প্রকৃত পরিচয় কোথায় পাওয়া যায়?—জীবন-মাহাত্ম্যে।

সরল, অমায়িক, আড়ম্বরশূন্য দুর্গামোহন চিরকাল যেন সমালোচনারূপ ভীষণ তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিলেন—বিমাতার বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঐ তরঙ্গে তিনি আন্দোলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন দিকে তিনি দৃক্পাত করেন নাই। বিরক্ত হইয়া লোকেরা তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ করিতেও ছাড়ে নাই, কিন্তু তিনি কিছুতেই দৃক্পাত করেন নাই। মহাত্মা হারকোর্ট গ্লাডোষ্টোনের অশীতি জন্মোৎসব উপলক্ষে বলিয়াছেন—

"If I leave this vile garbage in which the accusations against Mr Gladstone are clothed to perish as they deserve—I mention them only to remind you of equanimity and magnanimity with which Mr Gladstone has always encountered attacks of this description, and scarcely even have I seen him stirred or disturbed for a moment by the shameful insults that are sometimes hurled at his head He seems to pass over them like a great ship making its voyage with a precious freight in a troubled sea, which dashes against it and breaks upon it, but the vessel goes on its way on its steady course without swerving or shrinking for a moment until the port is gained and the freight is safely landed

Sir W Harcourt in celebration of the 8oth anniversary of Mr Gladstone s birthday

আমরাও দুর্গামোহন সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছি। যেখানে মানুষের লক্ষ্য চ্যুতি, মত পরিবর্ত্তন সম্ভব, সেখানে অসাধারণত্ব নাই। খাতিরে বা ভালবাসায়, প্রশংসায় বা নিন্দায়—যে বিচলিত হয়, সে কাপুরুষ, সে সাধারণ লোক। আর ম্যাটসিনি বা পার্কার, গ্লাডোষ্টোন বা লুথার, কাহারও দিকে চাহিয়া আপন ব্রত পরিত্যাগ করেন নাই, এই জন্য তাঁহারা অসাধারণ পুরুষ, মহৎ হইতেও মহৎ,—আমাদের পূজ্য। দুর্গামোহন চিরকাল অবিচলিত, অপরিবর্ত্তিত, চিরকাল অসাধারণ। যদি স্বার্থ ভুলিয়া পরমার্থকে সার করিতে পারিতেন, ঐ সকল মহাপুরুষদিগের সম আসনে আজ তিনি বসিতে সক্ষম হইতেন।

সাধারণের সহিত এই অসাধারণের যোগ এ জগতে ঘোষণা করিতে রহিল, স্বার্থ এবং পরমার্থ, প্রেয় এবং শ্রেয়, অসুর এবং দেব। এই দুইই মানুষকে চালিত করিতেছে। এক পশুত্বে নমিত করিতেছে, আর এক দেবত্বে উন্নীত করিতেছে।—দুর্গামোহন দেবতা ছিলেন, একথা বলি না, তিনি সংসারজয়ী সংযমী বীর ছিলেন, একথা বলি না,

তিনি বিলাসিতাবিহীন নির্ব্বিকার যোগী ছিলেন, একথা বলি না, তিনি ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তায় এ জগতে নেপোলিয়নের তুল্য ছিলেন, তাহও বলি না, বলি কেবল এই কথা—তিনি দয়ায় এবং সেবায় অসাধারণ ছিলেন। তিনি কর্ত্তব্যপালন, মানব-সেবা এবং ধর্ম্মমত-ধারণে অসাধারণ ছিলেন। এই গুণেই তিনি আমাদিগের পূজ্য। আর পৃথিবীর চক্ষে?—যে যেমন, সে সেইরূপ তাঁহাকে বুঝিয়াছে, এবং সেইরূপেই বুঝিবে। কেহ তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে, পূজা করিয়াছে, কেহ ঘৃণা করিয়াছে, অগ্রাহ্য করিয়াছে, উপেক্ষা করিয়াছে। তিনি কিন্তু যাহা, তাহাই ছিলেন। যে অসাধারণত্ব লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইতে বহুদিন লাগিবে। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি অমর আত্মাকে অমরধামের অসাধারণত্বে দিন দিন আরো উন্নীত এবং শোকদগ্ধ পরিবারে সান্ত্বনা বর্ষণ করুন।

ফাল্গুন, ১৩০৪।

ঋষি রাজনারায়ণ।*

ভাল কথা অনেকেই বলে, ভাল কথা অনেকেই শুনে, কিন্তু তাহাকে মজ্জাগত করিতে পারে এ জগতে অতি অল্প লোক। বাঙ্গালী বড় বাক্‌পটু, এ অপবাদ আজকাল ভারত-ব্যাপ্ত। বঙ্গের বড় ছোট সকলেই যেন উপদেষ্টা, সকলেই বক্তা। অবৈতনিক চিকিৎসার ন্যায়, অবৈতনিক উপদেশ এখন বঙ্গে অতি সুলভ। কিন্তু এই বঙ্গেও দুই চারিজন এমন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা উপদেষ্টার পদ পরিত্যাগ করিয়া, উপদিষ্ট হইতে অধিক ভালবাসিতেন। বঙ্গের ঋষি রামতনু তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, বঙ্গের রাজনারায়ণ তন্মধ্যে অন্যতম। রামতনুর কথা অন্য প্রবন্ধে লিখিয়াছি, এ প্রবন্ধে রাজনারায়ণের কথা কিছু লিখিতেছি।

* জন্ম—১৮২৬ খ্রীঃ ২৩শে ভাদ্র। ১৮৫১ খ্রীঃ হেড্‌মাষ্টার হইয়া মেদিনীপুর গমন করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করেন, ১৮৭৯ খ্রীঃ বৈদ্যনাথ গমন করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেখানে ছিলেন। সর্ব্বদা বলিতেন যে, বৈদ্যনাথে না থাকিলে বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইত। মৃত্যু—১৮৯৯ খ্রীঃ, ১৬ই সেপ্টেম্বর, রাত্রি ১০ ঘটিকা।

পাণ্ডিত্য—ইংরাজি, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ৺ প্যারীচরণ সরকার, মাইকেল, ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। হিন্দু কলেজের তিনি একজন

১২৯১ সালের শেষভাগে দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বায়ুসেবনার্থ দেবগৃহে গিয়াছিলাম। মাইকেলের জীবন-চরিত-প্রণেতা বন্ধুবর যোগীন্দ্রনাথ সেখানে অল্পদিন পূর্ব্বে আসিয়াছেন। তিনি বাল্যবন্ধু। তাঁহার আশ্রয়ে স্কুল গৃহে একটু স্থান পাইলাম। এক দিন প্রাতঃকালে এক পক্বশ্মশ্রু বৃদ্ধ একটী সঙ্কীর্ত্তন হাতে করিয়া যোগীর গৃহে উপস্থিত। যোগী ভক্তিভরে সঙ্কীর্ত্তন গাইল। তখন বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গ যেন তালে তালে নৃত্য করিতেছিল। পরে শুনিলাম, ভাববিহ্বল, তন্ময়চিত্ত সেই বৃদ্ধই ঋষি রাজনারায়ণ। আমরা দেবসন্দর্শন লাভে ধন্য হইলাম।

তারপর অনেক বার বৈদ্যনাথ গিয়াছি, অনেকবার তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এই নগণ্য আমাদের প্রতি তাঁহার অনুপম দয়া এবং অতুল ভালবাসা, তাঁহার অনুগ্রহ এবং প্রীতির কথা মনে হইলে পাষাণ-হৃদয় ফাটিয়া যায়। এই অনুপযুক্ত ব্যক্তিকেও যিনি ভালবাসিতে পারেন, তিনি জগতের কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না। যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট গিয়াছেন, তিনিই তাঁহার অপরাজিত ভালবাসা পাইয়াছেন। আজ অতি দুঃখে ঘোষণা করিতেছি, ঋষি-প্রতিম রাজনারায়ণ আর এ সংসারে নাই! বঙ্গদেশ অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে, দেবগৃহ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

আজ তাঁহার কতদিনের কত কথা মনে জাগিতেছে। যখনই তাঁহার নিকট যাইতাম, দেশহিতকর কত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেন। সাহিত্য, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সব বিষয়েই আলোচনা করিতেন। সব কথা লিখিতে গেলে একখানি বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। ভক্ত কেশবচন্দ্র,

---

উৎকৃষ্ট ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় ৩০, টাকার বৃত্তি পান, শেষ পরীক্ষায় মাসিক ৪০, টাকায় বৃত্তি পান। বৃদ্ধকালেও সেক্সপিয়ার, মিল্টন, ড্রাইডেন প্রভৃতি সুন্দর রূপে আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার প্রণীত,'Hindu Theists' gift to English Theists" "Science of Religion," Religion of love," "Old Hindu's Hope," প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার পাণ্ডিত্যের অক্ষয় কীর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন ৫ খানি উপনিষদের ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশগুলি রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা নামে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা বাঙ্গালা ভাষার অতি উপাদেয় গ্রন্থ। জনশ্রুতি এইরূপ, এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর"ধর্ম্মতত্ব-দীপিকা" "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা," "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" ও ধর্ম্মসাধন" তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে প্রধান।

ঋষি রাজনারায়ণ এবং রামতনু সম্বন্ধে কত কথা লিখিতে ইচ্ছা হয়। লিখিবার শক্তি-প্রার্থী হইয়া বিধাতার দিকে চাহিয়া রহিয়াছি। তিনি সে শক্তি দিবেন কি? সামান্য জীবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন কি? তাঁহার অ-দৃষ্ট বিধানে কি আছে, কে জানে?

১২৯১ সালের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণের উচ্ছ্বাসের কথার উল্লেখ করিয়াছি, আর এক দিনের কথাও লিখিতেছি। গত বৎসর আমার একটী বন্ধুকে লইয়া তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে একদিন বসিয়াছিলাম। বন্ধুবর কয়েকটী সঙ্গীত করিয়াছিলেন। তাহা শ্রবণে বৃদ্ধের সেই ভাববিহ্বলতা, ভক্তির উচ্ছ্বাস ধ্বনি, "অতি উত্তম অতি উত্তম" দেখিয়া এবং শুনিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। এরূপ জমাট ভাব এক মহাত্মা রামতনু বাবুতে ভিন্ন আর কোথাও দেখি নাই।

একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখি, তিনি বাবু রামচরণ বসু মহাশয়ের সহিত কথা বলিতেছেন। আমরা প্রণাম করিয়া তাঁহার ধারে বসিলাম। তাঁহার অমৃতময় বাক্য শুনিতে লাগিলাম। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছিলেন, "হায়, যৌবনকালে কত ধর্ম্মাপরাধ করিয়াছি। উপাসনার সময় মুখে কত কথা বলিতাম, কিন্তু অন্তরে কত অসার চিন্তা, পাপময় চিত্র জাগিত। এখন এই বার্দ্ধক্যে সে জন্য অনুতাপ হইতেছে।"

গত বৎসর আর একদিন তাঁহার সন্দর্শনে গিয়াছি। তখন তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছে, তবুও দ্বারবানকে বলিলেন, "আমাকে চেয়ারে তুলিয়া বারাণ্ডায় লইয়া চল, বাবুদের সহিত কথা বলিব।" বারাণ্ডায় আসিয়া নানা কথা বলিতেছেন, এমন সময় কতকগুলি অশ্বারোহী পাঠান স্ত্রীপুরুষ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। সীমান্তের যুদ্ধ এবং বোম্বের বিদ্রোহ তখন তাঁহার প্রাণে জাগিতেছিল। তিনি উচ্ছ্বাসের সহিত বলিলেন—"আবেদনে, অনুরোধে, বক্তৃতায় সাহেবদের নিকট কিছু প্রত্যাশা নাই, বল প্রয়োগ ভিন্ন তাহারা কিছু দিবে না। বোম্বের লোকেরা এবং সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা খুব জব্দ করিয়াছে। হায়! আমরা কবে এইরূপ বলপ্রয়োগ করিতে পারিব?" বলিতে বলিতে তাঁহার বদন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, মস্তকের পক্ককেশ উত্তোলিত হইল। স্বদেশানুরাগের সেরূপ দৃশ্য আমরা আর কোথাও দেখি নাই।

দয়ায় বিদ্যাসাগর, ভক্তিতে কেশবচন্দ্র, প্রতিভায় বঙ্কিমচন্দ্র, বিনয়ে

রামতনু, সরলতা ও স্বদেশানুরাগে রাজনারায়ণ এই বঙ্গে অমর হইবার যোগ্য। রাজনারায়ণের প্রতি কথা, প্রতি কাজ স্বদেশানুরাগে প্রদীপ্ত থাকিত। তিনি বালকের ন্যায় সরল ছিলেন। যুবা বৃদ্ধ, জ্ঞানী মূর্খ—সকলে তাঁহার সরলতায় মোহিত হইত। বোধ হয়, তিনি অহঙ্কার, আত্মাভিমান, অসরলতা, কপটতাকে চিরকালের জন্য অন্তর হইতে বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি বালকের ন্যায় হাসিতেন, বালকের ন্যায় সরলভাবে কথা বলিতেন। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ তাঁহার যুবক সন্তানকেও পিতৃতুল্য ভক্তি প্রদান করিতেন।

প্রকৃত বীরত্ব কোথায়? শোণিত-পাতে, বক্তৃতায়, উপদেশে? না—অন্তরে, কার্য্যে, রিপু-সংযমে? ইদানীন্তন কালের লোকেরা সাধারণতঃ বাহ্যাড়ম্বরের দাস, বড় বড় কথা, লম্বা লম্বা বক্তৃতা, ইহাই অনেকের প্রিয়। হিংসা বিদ্বেষের কথা আর কি বলিব? একজনের ভাল অবস্থা এদেশের অন্যের সহ্য হয় না;—নিন্দার গরল উদ্গীরণ করিয়া লেখনী এবং রসনাকে কলুষিত করিতে অনেকেই উৎফুল্ল। প্রশংসা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, এ সকল এখন কবির কল্পনার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। বাঙ্গালীত্ব দিন দিন যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বুদ্ধিতে বাঙ্গালীর ন্যায় জাতি পৃথিবীতে অধিক নাই, কিন্তু চরিত্রে, কার্য্যে, কর্ত্তব্যপরায়ণতায়, অধ্যবসায়ে বাঙ্গালীর ন্যায় হীন জাতি পৃথিবীতে বড অধিক আছে কি না, জানি না। আত্মসংযম এখন কথার কথা ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য এখন প্রবলাধিপত্যে বঙ্গে রাজত্ব করিতেছে। বাঙ্গালী যুদ্ধ জয় করিতে অক্ষম বলিয়া আমাদের দুঃখ নাই, বাঙ্গালী রিপুসংগ্রামে পরাজিত হইতেছে, এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। হিন্দুর মহত্ত্ব কোথায়? বীরত্ব কিসে? ঐশ্বর্য্যে নাই, বীর্য্যে নহে,—মহত্ত্ব চরিত্রে, ধর্ম্মে। হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব, সংযমে। হায়, এখন আর যাহা বল, তাহা সকলই মিলিতে পারে, অধিক জিনিসের অভাব নাই—অভাব দেখিতেছি, কেবল ধর্ম্মের। হায়, ধর্ম্ম ভিন্ন হিন্দুর হিন্দুত্ব এ জগতে দীর্ঘকাল পূজা পাইবে কি? এই দুর্দ্দিনেও, রিপুজয়ী রাজনারায়ণ, ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিজ জীবন দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষ ঋষির সম্মানে চিরদিন সম্পূজিত। ঋষিত্ব—কেবল সংযমে। সে কালের ঋষিরা পৃথিবীর যাবতীয় কার্য্য ধর্ম্মানুপ্রাণিত হইয়া নির্ব্বাহ করিতেন। বহির্দৃষ্টি অন্তরস্থ করিয়া, মান সম্ভ্রমকে বিসর্জ্জন দিয়া, যিনি

আত্মরিপু সকলকে জয় করিয়া কামনা-বর্জ্জিত, বাসনা বর্জ্জিত, নির্লিপ্ত, নিশ্চিন্ত, অনাসক্ত হইয়াছেন, তিনিই ঋষি। তিনি আহার বিহার করেন, কথা বলেন, হাসেন, কাঁদেন, সবই করেন, কিন্তু তিনি নির্ব্বিকার-চিত্ত। ভেদ-বোধের বিষাঙ্কুর সেখানে নাই—তাঁহার সমদৃষ্টিতে জ্ঞানী মূর্খ, বালক বৃদ্ধ, সব সমান। তাঁহার শত্রু কেহ নাই, তাঁহার পর কেহ নাই। অবিভেদে সকল নরনারী তাঁহার চরণ ধূলি লইতে উল্লসিত। সে কালের এই ঋষির চরিত্রানুপ্রাণিত কোন লোক দেখিতে চাও কি? রামতনু ও রাজনারায়ণের জীবন অধ্যয়ন কর। মধুর, কমনীয়, সুমিষ্ট, সুন্দর, সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া বিমোহিত হইবে।

এ দেশে এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা সম্মান লাভের জন্য কাঙ্গাল। তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বকার্য্যের লক্ষ্য যেন ঐ অক্ষয় পদ লাভ। তাঁহারা প্রশংসার তুড়িতে নৃত্য করেন, যশের কথা জপমালার ন্যায় কণ্ঠে ও বক্ষে ধারণ করেন। শুনিয়াছি, তাঁহারাও নাকি বড় লোক। রাজনারায়ণ বাবু এ শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি বাহ্যাড়ম্বর ভাল বাসিতেন না। ভিতরে দেশহিতৈষণার এমনই তেজ, বোধ হয়, প্রয়োজন হইলে, সকল তুচ্ছ করিয়া, দেশের জন্য, মহাত্মা ম্যাৎসিনির ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে একটুও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু বাহিরে দেখিলে বোধ হইত যেন, একটী বৃদ্ধ যেন তেন প্রকারে জীবন লীলা শেষ করিবার অপেক্ষায় আছেন। শোকে কাতর নন্, দুঃখ দারিদ্র্যে ম্রিয়মাণ নন্, অবহেলায় নিষ্প্রভ নন্, এমন কোন লোক দেখিতে চাও যদি, তবে তিনি ঋষি রাজনারায়ণ। বাস্তবিকই তিনি দুঃখ-দারিদ্র্য-রোগ-শোক-বিজয়ী শ্মশানবাসী শিবের ন্যায় ছিলেন। বাহিরে নির্ব্বাণ, ভিতরে সিংহ বিক্রম। কত লোক তাঁহার শিবের ন্যায় মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিত। কিন্তু তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতেন।

ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনে যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারা শিষ্য যুটাইয়া সেবা-লালায়িত হন না, তাঁহারা নির্জ্জনে, নীরবে, নিরাড়ম্বরে জীবন কাটাইতে ভালবাসেন। উচ্ছ্বাসের সময় কেবল তাঁহারা ধরা পড়েন। কোন একটা সৎপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, বা দেশহিতকর কথা উঠিলে রাজনারায়ণের ভিতরের সিংহবিক্রম ফুটিয়া পড়িত,—সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত, মস্তকের কেশগুচ্ছ উত্তোলিত, বদনমণ্ডল রক্তাভ। যেন আগ্নেয়গিরির ভিতরের,

অগ্র্যুদয়ের প্রারম্ভিক চিহ্ন প্রতিভাত। ভদ্রতায় ও শিষ্টাচারে, তাঁহার সমতুল্য ব্যক্তি এদেশে দুর্লভ; এই ব্যক্তিই সময়ান্তরে, ইংরাজ-বিদ্বেষে জর্জ্জরিত এবং দেবদুর্লভ স্বাধীনতার জন্ত লালায়িত। এরূপ পবিত্র স্বদেশানুরাগ, স্বজাতিবৎসলতা ও জাতীয়তার পক্ষপাতী ব্যক্তি এদেশে আমাদের চক্ষে বড় অধিক পড়েন নাই। জ্ঞান এবং কর্ম্ম, ধর্ম্ম এবং রাজনীতি, দেশসংস্কার এবং সাহিত্য-সেবা, চরিত্র এবং সংযম,—একাধারে এরূপ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুর, প্রকৃত হিন্দুত্বে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বে রাজনারায়ণ ভূষিত হইয়া, জাতীয়তার অক্ষয় বঙ্গ বট বৃক্ষতলে যে অবিনশ্বর জীবনলীলা সমাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া না জানি যুগযুগান্তরে কত নরনারী প্রকৃত জীবন ও মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হইবে। এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে,—বাঙ্গালী জাতীর গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আর হতভাগ্য ব্রাহ্মসমাজ?—হায়, প্রকৃত ধার্ম্মিকগণের স্বর্গারোহণে ব্রাহ্মসমাজ দিন দিন নিষ্প্রভ হইতে চলিল।

রাজনারায়ণ কেবল ব্রাহ্মসমাজের নহেন, তিনি এই ভারতের এবং এই বাঙ্গালীকুলের গৌরবের জিনিস। তিনি নামে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন, কিন্তু কাজে, বঙ্গদেশের সর্ব্ব সৎকাজের অনুপম, অনভিষিক্ত অধিপতি ছিলেন। তাঁহার তিরোধানে একাল এবং সেকালের মিলন-রজ্জু ছিন্ন হইল,—যোগভক্তি, জ্ঞান-কর্ম্মের মিলন ক্ষেত্র অন্তর্হিত হইল। বঙ্গভূমির দুঃখের আর কি অবশিষ্ট রহিল? মহাজনবর্গের চিতাধূমে দেশ আচ্ছন্ন—বঙ্গভূমি মহাশ্মশানে পরিণত!!

কার্ত্তিক, ১৩০৬।

দলাদলি।

মানুষ বাল্যকাল হইতে অনুকরণপ্রিয়। যে যেমন দেখিবে, যেমন শুনিবে, সর্ব্বদা সেইরূপ করিতে এবং বলিতে চেষ্টা করিবে। এই অনুকরণপ্রিয়তা উন্নতির মূল। মানুষ যে আজ এত উন্নত হইয়াছে, ইহার মূলে এই অনুকরণপ্রিয়তা। অনুকরণপ্রিয়তার মূলে বিস্ময়, বিশ্বাস এবং তন্ময়তা। বালক যাহা দেখে,তাহাতেই বিস্মিত এবং তাহাতেই আস্থাবান। আস্থাবান বলিয়াই সেইরূপ করিতে চায়। বিস্ময় এবং তন্ময়তার মূলে শক্তিবোধ

এবং মহত্ত্বস্মরণ। আমি যাহা পারি না, এ ব্যক্তি তাহা পারে ; আমাপেক্ষা এ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, এইরূপ বোধ হইলেই অনুকরণে স্পৃহা জন্মে। এইরূপ মহত্ত্ব স্মরণ হইতেই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ মহত্ত্বের পূজায় উন্মত্ত। যাহার ভিতরে যে বিশেষত্বময় মহত্ত্ব দেখিবে, ইংলণ্ডের নরনারীর মুখে তাহার প্রশংসা আর ধরিবে না। প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে, দলপতিদিগের (Party leaders) মধ্যে মত সংঘর্ষণ দেখা গেলেও ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, সর্ব্বদা তাঁহারা পরস্পরের মহত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া থাকেন না ; যদি থাকিতেন, তবে ইংলণ্ডের এত উন্নতি হইত না। উচ্চ আদালতে প্রতিভাশালী সমকক্ষ আইন-ব্যবসায়ীদিগের তর্কবিতর্ক, বাগবিতণ্ডা খুব দেখা যায়, কিন্তু ঘরে তাঁহারা পরস্পর বন্ধু। বিলাতের দলপতিদিগের ঝগড়া বিবাদও সেইরূপ— পার্লিয়ামেন্টের সভায় মনে হয়, তাঁহারা ঘোরতর শত্রু, কিন্তু বাড়ীতে তাঁহারা পরস্পর বন্ধু। বন্ধুত্বের মূলে বিশ্বাস, মহত্ত্ব স্মরণ এবং বিশেষত্ব-বোধ বিদ্যমান। সেখানে প্রতিযোগীতা আছে, কিন্তু আত্মম্ভরিতা বা অহং-সর্ব্বস্ব-ভাব নাই। ভাল বলিয়া না জানিলে কেহ কাহাকে ভালবাসিতে পারে না। পরস্পরের মহত্ত্ব স্মরণ ভিন্ন বন্ধুত্বের উদয় অসম্ভব। আমি তোমাকে যদি ভাল বলিয়া না জানিতাম, তবে তোমাকে কখনও বালবাসিতে পারিতাম না ; ইহার মূলে এই কথা আছে, তোমার ভিতরে আমি এমন কিছু দেখিয়াছি, যাহা অন্যত্র পাই না। সেই জন্যই আমি তোমার জন্য পাগল। তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া আমি যাহা পাইয়াছি, অন্যত্র তাহা পাই নাই, তাই আমি তোমার দাস। এইরূপ বিশেষত্বময় মহত্ত্ব বোধ হইতেই প্রেমের উদয়। অনাবিল প্রেমের মূলেই অনুকরণ-স্পৃহা। বিশ্বনিয়ন্তা প্রেমশৃঙ্খলে নরনারীকে বাধিয়া পরস্পরের বিশেষত্ব-অনুকরণে মানুষকে উত্তেজিত করিয়াছেন। উন্নতির সোপান—এই অনুকরণ-স্পৃহা। পরিদৃশ্যমান জগতের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত, লক্ষিত এবং অলক্ষিত, সকল শিক্ষার মূল অনুকরণ-স্পৃহা। ইহা না থাকিলে মানুষ, বংশপরম্পরায় এত উন্নতিলাভ করিতে পারিত কি না, সন্দেহ। বাণিজ্য, দেশ বিদেশকে আমাদের সম্মুখে আনয়ন করিয়াছে, অর্থাৎ আপন পরকে, দেশ বিদেশকে এক সূত্রে বাঁধিতেছে। এই জন্য বাণিজ্যে জগতের এত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। বাণিজ্য বাহিরের অভাব দূর করিতেছে, অন্তর রাজ্যের অভাবও দূর করিতেছে।

মানুষ পরস্পর ভাই ভাই—সব জাতিই আপন, সকলের মধ্যেই বিশেষত্ব আছে, সকলকেই আদর করিতে হইবে, বাণিজ্য জগতে এই মহাশিক্ষা বিস্তার করিতেছে।

আমি বাল্যকালে ভাবিতাম, এ জগতে পর আবার কে, শত্রু আবার কি? যার নিকটে যাই, তার নিকটই কিছু পাই;—ছোট বড় ত বুঝি না। বড় এক বিষয়ে বড়, ছোট আর এক বিষয়ে বড। মহানের ছেলে সকলেই, কোন না, কোন বিষয়ে, বা বিভাগে, সকলেই মহান, সকলেই বড়। তুমি বল, ঐ ব্যক্তি তোমার নিন্দা করে, ঐ ব্যক্তি তোমার অনিষ্টের চেষ্টায় ফেরে। করে করুক, তাহাতে কি? নিন্দা করিয়া বা কে কি করিতে পারে, অনিষ্টই বা কে কি করিবে, যদি আমি ভিতরে খাটী থাকি। আমি যখন মন্দ, তখন জগতের সকলকেই মন্দ দেখি, আর আমি যখন ভাল, তখন সকলকেই ভাল দেখি। আমিত্বের মলিনতানুসারে জগতের বিকৃতি দর্শন। আমি যখন মন্দ, তখন আমাকে মন্দ বলাই ত উচিত। আমা দ্বারা যদি কাহারও কোন উপকার বা সেবাই না হইল, আমাকে বিনাশ করা বা আমার অনিষ্ট করাই ত ভাল। অন্যে নিন্দা করিলে আমার আত্মদৃষ্টি বাড়ে,—অনিষ্ট যে করিতে চায়, প্রকারান্তরে সেই ইষ্ট করে। কাছে আসে, কাছে বসে—বসিয়া বসিয়া অনিষ্ট করিয়া যায় যদি একটু, দিয়া যায় অনেক বেশী। আহা, সে যদি স্বার্থচালিত হইয়া আমার মলিন আমিত্বের নিকট না আসিত, আমি কি তাহার অন্তর রাজ্যের মহাধনে ধনী হইতে পারিতাম? সেই জীবন-উষায় ভাবিতাম, এজগতে পর কেহ নয়, শত্রু মোটেই নাই। শত্রু কেবল আমার রিপু সকল, যাহারা আমাকে পাপের পথে লইয়া যাইয়া বধ করে। শত্রু কেবল সে, যে আমাকে পশুত্বে নমিত করে।

বাল্যকালের এই কথা, এখন বার্দ্ধক্যের উষায়, নিজের এবং অন্যের চরিত্র দেখিয়া যেন অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। দিন দিন আমরা হইতেছি কি? মানুষ মানুষকে আপন ভাবিবে, মানুষ মানুষের মহত্ব দেখিবে, দেখিয়া শিখিবে, উন্নত হইবে, এই ত বিধাতার বিধান। এখন দেখি, মানুষ কেবল রক্তপানে লালায়িত। ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপনের জন্য এ জগতে ধর্ম্মের উদয়—এখন দেখি, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সাধনে সকল ধার্ম্মিক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ! দেখি, মানুষ মানুষকে মারিবার জন্যই দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত।

ঘুষর লমর এবং চিন সময়—বাহিরে এবং ঘরে ঘরে।' হায়রে হায়, জগতের অবস্থা এবং পরিণাম এতই মলিন !!

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এই বঙ্গপ্রদেশ—অনুন্নত, অশিক্ষিত, নির্ধন, দুর্ব্বল, দরিদ্র, অজ্ঞানতার গাঢ় তিমিরে নিমগ্ন। এই বঙ্গপ্রদেশের শতটী ভাইকেও আমরা আপনার করিয়া লইতে পারিলাম না! ধর্ম্মে দলাদলি, সমাজে দলাদলি, সাহিত্যে দলাদলি, সঙ্গীতে দলাদলি, রাজনীতিতে দলাদলি—পরস্পরের রক্তপানে পরস্পর উন্মত্ত। এরূপ হীনাবস্থা জগতের আর কোথাও দেখিয়াছ কি?

অনুকরণের মূলে প্রেম, দলাদলির মূলে বিদ্বেষ এবং হিংসা। অনুকরণের রাজ্যে প্রতিযোগীতার সংঘর্ষ আছে, কিন্তু হিংসার তীব্র দাহন নাই। মানুষ একরূপে বড় হইতে চায়—অন্যের প্রতিষ্ঠা এবং মহত্ত্ব অনুকরণ করিয়া। ইহার মূলে উচ্চাভিলাষ ও প্রতিযোগীতা আছে। অন্যরূপে বড় হইতে চায়—অন্যকে বিনাশ করিয়া। ইহার মূলে শুধু বিদ্বেষ। তুমি আমার প্রতিপক্ষ, আমি শক্তিতে কিছুতেই তোমাকে খর্ব্ব করিতে পারিলাম না, তোমাকে বিনাশ না করিলে, আমি আর বড় হইতে পারি না। বড় হওয়া—দুইয়েরই লক্ষ্য; কিন্তু এক স্বর্গ ধরিয়া এবং আর এক নরক অবলম্বনে। রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার তীব্র বাণে মাইকেলকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কেন, পাঠক বিচার করুন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরিয়া যাঁহারা মানুষ, তাঁহারা, বঙ্কিমের স্বর্গারোহণের পর, তাঁহাকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কেন, পাঠকগণ বিচার করুন। বিচার করুন, বঙ্গবাসীতে সঞ্জীবনীতে, আনন্দবাজারে হিতবাদীতে, বেঙ্গলীতে অমৃতবাজারে এবং অন্যান্য পত্রিকা সকলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিষ সর্ব্বদা উদ্গীরিত হয় কেন? রাজনৈতিক সভা একটী ছিল, দুটী হইল, সাহিত্য সভা একটী ছিল, দুটী হইল, সঙ্গীত সমাজ একটী ছিল, দুটী হইল; সারস্বত সমাজ ঢাকায় একটী ছিল, দুটী হইল; ধর্ম্মসমাজের কথা আর বলিব কি, সে ইতিহাস ত সকলেই জানেন। এ সকল কেন? আনন্দমোহন কৌন্সিল সভায় সম্মানের আসনে বসিতে চান, সীতানাথ বাধা দেন; শশি-শেখরেশ্বর বড় হইতে চান, প্যারীমোহন বাধা দেন। হেরম্বচন্দ্র, কৃষ্ণকুমার জীবনের রক্ত ঢালিয়া আনন্দমোহনের প্রীত্যর্থ কত বৎসর সাধন করিলেন, শেষে অর্দ্ধচন্দ্র পুরস্কার পাইলেন! এখন পৃথক স্কুলের আয়োজন হইতেছে। এ সকল তীব্র দলা-

ফলের ইতিহাস এদেশে অলিখিত থাকে থাকুক, কিন্তু ইহার মূলে কি শিক্ষা? বাঙ্গালার মাসিক পত্র পাঠ কর—মাসিক সাহিত্য সমালোচনার ছলনায় সেখানে ব্যক্তিত্বের বিনাশের কাহিনী লিখিত হইতেছে। এক-জনকে বধ করিয়া বড় হইবার ইচ্ছা দিন দিন সংক্রামিত ব্যাধির স্তায় এদেশে বদ্ধমূল হইতেছে। পরনিন্দা, পর কুৎসা পাঠে এদেশের ভাল ভাল লোকের মনও সদা প্রফুল্ল। 'আমি বড়, আমি বড়, আমি ভাল, আমি ভাল, আর সব খারাপ" এই অহঙ্কার মূলক আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বঙ্গের ঘরে ঘরে। দলাদলি, রক্তারক্তি, ঝগড়া বিবাদ—নিন্দা গালাগালি ভিন্ন আর কিছু যেন এদেশে নাই। অযোগ্য এবং অসংযত পরনিন্দা সাহিত্যের ভিতর দিয়া এখন সমাজের অণুতে অণুতে প্রবিষ্ট হইতেছে। সুরেন্দ্রনাথ এবং মতিলাল, কাব্যবিশারদ, এবং সমাজপতি, বিনয়কৃষ্ণ এবং যতীন্দ্রনাথ, সারদাচরণ এবং হীরেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ এবং রাজেন্দ্রনাথ—ইঁহাদিগের সকলেই প্রতিষ্ঠিত, প্রতিভান্বিত,—ক্ষমতাশালী, সহৃদয়, দেশানুরাগী, মাতৃবৎসল, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষ্টা কেন, বলিতে পার কি? একতায় উন্নতি, বিভাগে পতন—এই মূল শিক্ষা, উন্নতির এই প্রথম যুগে, মহারথীগণ ভুলিয়া যাইতেছেন কেন, বলিতে পার কি? লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ইহার উত্তর এক ভিন্ন দুই নয়—ইহার মূলে বিদ্বেষ, কেবল অহংসর্ব্বস্ব-ভাব। হায়রে বঙ্গদেশ !!

সে দিন একখানি সংবাদ পত্রে গ্রাম্য দলাদলির কথা পাঠ করিতেছিলাম। পাঠ করিতেছিলাম এবং অন্তর দগ্ধ হইতেছিল। বঙ্গদেশের কত দলাদলির কথাই জানি। সহরে সহরে বোর্ড এবং মিউনিসিপালিটী হইয়াছে, সে সকলের দলাদলির কত কথাই জানি। মহাসহর কলিকাতা, প্রতিভা আর পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি আর গবেষণা, কৃতিত্ব এবং জ্ঞান—এ সকলের খনি। একজন মহা পণ্ডিত বলিতেন, "আমি কাজের ভিড়ে সদা ব্যস্ত, রিপুর কথা ভাবিবার অবসর কোথায়?" কলিকাতা কাজের উৎস। এখানে অবিরত কত মানুষ খাটিতেছে,—কাজের বিরাম নাই। এখানে কার্য্যের স্রোতে ভাসিতে পারিলে অসার স্বার্থ এবং রিপুর গণনা কৃতী মানুষের মধ্যে আসিতে পারে কি? কিন্তু হায় এ হেন সহরেও কলুষিতচিত্ততা, নীচতা, ক্ষুদ্রতা, হিংসা বিদ্বেষ পূর্ণ মাত্রায় প্রদীপ্ত। একজনের নিকট একজনের প্রশংসা কর, অমনি সেখানে মহা গর্জ্জন আরম্ভ হইবে।· স্কুলের ছাত্র হইতে

কলেজের শিক্ষক পর্যন্ত, ছিতৈষীর প্রাঙ্গণ হইতে সম্পাদকের বৈঠক পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই, অবাধ পরনিন্দার গরল সদা উদ্গীরিত হইতেছে। সে কালের কবির লড়াই, এ কালের সংবাদ-পত্রের কুৎসিৎ ভাষা পড়িয়া লজ্জা পাইতেছে। সেই জন্যই বুঝিবা কবির দল সকল বিলুপ্ত। তুমি যদি ধৃষ্টতা পূর্ব্বক সম্পাদকগণের নীচতার বিরুদ্ধে লেখ, তুমি রুচিবাগীশ বিশেষণে ভূষিত হইয়া উপহসিত এবং উপেক্ষিত হইবে। কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্র সকল মেছুনীর হাটে পরিণত হইয়াছে, কলিকাতার চাদনীর দোকানীরা এবং বাজারের মেছুনীরা এখন লজ্জায় যেন অধঃবদন হইয়াছে। দেশের শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিলে প্রাণ অস্থির হয়। গত ৬।৭ বৎসরের মধ্যে যত লাইবেল মকদ্দমা এই বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াছে, বোধ হয়, তাহার পূর্ব্বের ৫০ বৎসরের মধ্যেও তত হয় নাই। মানুষের মান বাড়িয়াছে, আস্পর্দ্ধাও বাড়িয়াছে। দলাদলির নূতন নাটকের নূতন নূতন অঙ্ক প্রত্যহই অভিনীত হইতেছে। গত কয়েক বৎসরের বড় বড় লাইবেল মকদ্দমায় এদেশের বড় বড় লোকেরা কোন না কোন পক্ষ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই সূত্র হইতে কলিকাতায় বিষম দলাদলির বীজ রোপিত হইয়াছে। সেই বীজ এখন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। বিভক্ত সভা-সমিতির অন্তরালে সেই বীজ মুকুলিত। সংবাদ পত্র সকল পক্ষবিশেষের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়াছে। যে পক্ষের কাগজ ছিল না, সে পক্ষ রাতারাতি কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। সংবাদ-পত্র বর্ত্তমান যুগের দলাদলির মুখপাত্র স্বরূপ হইতেছে। হিংসা বিদ্বেষের উদ্গীরিত কলুষরাশিতে দেশ পরিপূর্ণ।

কয়েক বৎসরের মধ্যে এ দেশে অনেক সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গলাভাষার গৌরবের বিষয়, কেহ কেহ বলেন। কিন্তু পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরের গালাগালি যে কাগজে না থাকে, সে কাগজের তেমন কাটতি নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয়, গালাগালি শ্রবণের জন্য দিন দিন লোকের ঔৎসুক্য বাড়িতেছে। ইহাতে উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় না; ইহা ঘোরতর দুর্দ্দশার কথা। যে দেশের লোকেরা পরকুৎসা করিতে ভালবাসে এবং যে দেশের লোকেরা পরকুৎসা শুনিতে লালায়িত, সে দেশের পরিণাম কি? মহত্ব স্মরণ, মহত্ত্ব চিন্তন ভিন্ন কখনও কোন ব্যক্তি, কোন জাতি উন্নত হইতে পারে না। পরনিন্দা, পরকুৎসা লিখিয়া লিখিয়া এবং শুনিয়া শুনিয়া আমাদের আত্মা ও মন কলু-

বিত হইয়া গিয়াছে, আমরা দিন দিন দুর্গতির পূতিগন্ধময় প্রদেশে নিমগ্ন হইতেছি। দুর্গন্ধে মজিতে মজিতে, পচিতে পচিতে আমাদের ভালমন্দ বিচারশক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আমরা দিন দিন মনুষ্যত্বের অযোগ্য হইতেছি। এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে এদেশের আর মঙ্গল নাই। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইলে উন্নতি লাভের আশা নাই। বিভাগ করিয়া শাসন করা গবর্ণমেণ্টের দুর্জ্জয় নীতি; আমরা যদি এই কলুষিত রীতিকে পদদলিত করিয়া একতা এবং সাম্য, সম্ভাব এবং পুণ্যের পথে অগ্রসর হইতে না পারি, এদেশের মঙ্গল নাই। ভারতের দুর্দ্দশা এবং দুর্গতির শেষ নাই; এখন সকলে, ব্যক্তিগত প্রাধান্য ভুলিয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, ব্যক্তিগত দোষ ত্রুটী ভুলিয়া যদি একতার পবিত্র রজ্জুতে আবদ্ধ হইতে না পারি, এদেশের মঙ্গল নাই। এদেশ ডুবিয়াছে, সকলে একত্র মিলিত না হইলে কখনও এদেশের উদ্ধার হইবে না। হিতৈষীগণ সতর্ক হউন।

শ্রাবণ, ১৩০৭।

সত্য এবং সাহিত্য।

মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের স্বপ্ন—"আমি বড়," সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিন্তা—"আমি ভাল।" "আমি বড়" এবং "আমি ভাল" এই রব চতুর্দ্দিকে। কেবল আজই যে এই রব পৃথিবীতে শোনা যাইতেছে, তাহা নয়; চির-কাল এই রব সর্ব্বত্র নিনাদিত হইতেছে। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, রুসো, ভল্টেয়ার, ম্যাট্‌সিনি এই রবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তবুও, আজও, চতুর্দ্দিকে কেবল এই রবই শুনিতেছি। আমি কুলে বড়, আমি ঐশ্বর্য্যে বড়, আমি পদে বড়—তোমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম কর, আমার পদলেহন কর, আমার ঐশ্বর্য্যে এবং পদে পুষ্পবর্ষণ কর। আমি ব্রাহ্মণ, আমার বিরুদ্ধে তুমি কথা বলিতে সাহস করি-তেছ? তুমি সদ্‌গোপজাত ডাক্তার, তোমার এতবড় আস্পর্দ্ধা, তোমাকে হেয়, অবজ্ঞেয়, লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইতেই হইবে! আমি ঐশ্বর্য্যের,—মণিরত্ন-মালা-বিভূষিত তৃপ্তি-নিকেতনের একমাত্র রাজাধিরাজ, তুমি দীন দুঃখী সম্পাদক, তোমার এত সাহস যে, আমার বিরুদ্ধে কথা বল,

শৌর্যের ভিটা মাটী উচ্ছিন্ন করিয়া আমি কর্ম্মনাশার জলে তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়া তবে ছাড়িব। আর আমি মহামান্যা মহারাণী ভারতেশ্বরীর অন্যতম মন্ত্রী, তুমি সামান্য হইতেও অতি সামান্য টুথ পত্রের সম্পাদক, তোমার এত সাহস যে, আমার বিরুদ্ধে লেখ, এবার লাঞ্ছনার মুকুট পরাইয়া কলঙ্কের বাজারে তোমাকে বিক্রয় করিব। আজ কাল চতুর্দ্দিকে কেবল এরূপ দম্ভ, অহঙ্কার এবং তীব্র তেজের কথা শুনিতেছি। ইংলণ্ডে উদার নৈতিক সম্প্রদায় নিষ্প্রভ হইতেছেন, আভিজাত্যভাব-প্রধান সম্প্রদায় দিন দিন মস্তকোত্তোলন করিতেছেন, আমেরিকা—চির সাম্য এবং স্বাধীনতার পক্ষপাতী আমেরিকা ফিলিপাইন দ্বীপের গৌরবে আজ মাতোয়ারা, আজ প্রধানের প্রধান হওয়ার জন্য লালায়িত হইতেছেন, আর জর্ম্মণি এবং রুষিয়া তেজ এবং গর্ব্বের রত্নমুকুট মস্তকে তুলিয়া কি আস্ফালন করিতেছেন, কি তাণ্ডব নৃত্যে মাতিতেছেন, সকলেই জানেন। মনুষ্যের অহঙ্কারকে বিনাশ করিতে যে সত্যসেবী সাহিত্য বিদ্যমান, সে সাহিত্য আজ নিস্তেজ কেন? তুমি বল, দিন দিন পৃথিবীতে সাম্য এবং স্বাধীনতার রাজত্ব আসিতেছে, আমি দেখিতেছি, সাম্য এবং স্বাধীনতা দিন দিন সুদূরপরাহত হইতেছে। দরিদ্রের সন্তান আজ টাকায় ক্রীত হইয়া উচ্চ রাজসিংহাসন পাইয়াছেন, তিনিও, পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া আজ দরিদ্র-পীড়নে বদ্ধপরিকর। চেম্বরলেন লর্ডের সন্তান না হইয়াও, আজ উচ্চ পদে বসিয়া তাঁহার এক সময়ের দলের লোককেই পীড়ন করিতে বদ্ধপরিকর। বঙ্গদেশের বড় বড় জমীদার, বড় বড় রাজ পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ কর—অনেক স্থলেই দেখিতে পাইবে, পোষ্যপুত্রের রাজত্ব। দরিদ্র ভিন্ন কে আপন পুত্রকে বিক্রয় করে? দরিদ্রের সন্তানগণ আজ রাজা হইয়া কিরূপে দরিদ্র নিষ্পেষণে বদ্ধপরিকর হইতেছেন, একবার চিন্তা কর। কত দরিদ্রের কন্যা আজ দৈববলে রত্ন-সিংহাসনে বসিয়া কিরূপ দরিদ্র-নিষ্পেষণ-মন্ত্রণায় যোগ দিতেছেন, চিন্তা কর এবং চিন্তা কর—পদগৌরবে মত্ত কত শত শত লোক কত প্রকারে দরিদ্র, অসহায়, নির্ধন এবং বিপন্নের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। ক্ষমতা পাইয়া তাহার অপব্যবহার করে না, লক্ষের মধ্যে একজন; আর অধিকার পাইয়া, তাহার মমতা পরিত্যাগ করে, সহস্রের মধ্যে একজন। রাজার অত্যাচার, জমীদারের অত্যাচার, মহাজনের অত্যাচার, পুলিসের অত্যাচার, হাকিমের

অত্যাচার, ব্রাহ্মণের অত্যাচার—অত্যাচারে অত্যাচারে এদেশ বার বার হই-য়াছে। বীরত্ব, সাহস, সততা, ধর্ম্মচিন্তা, এই নিষ্পেষণের যুগে দরিদ্রের হৃদয়ে স্থান পাইবে, কখনও আশা করিতে পার না। যে সাহিত্য নীল-করের অত্যাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছিল, সে সাহিত্য আজ কোথায়? যে সাহিত্য আমেরিকার দাসপ্রথার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল, সে সাহিত্য আজ কোথায়? জীবন-সংগ্রাম, বড় বিষম সংগ্রাম। এ দেশের নিম্নশ্রেণীর আর উদ্ধারের পথ নাই। মহাত্মা বিদ্যাসাগর বহু-দর্শিতার বলে সাহসের সহিত বলিয়াছিলেন, "এদেশে নিম্নশ্রেণীর গতি ফিরিবে না। তাহাদিগকে আমরা পশুর ন্যায় মনে করি। মানুষের দ্বারা মানুষের উপকার হওয়া সম্ভব, পশুর উপকার হইবে কিরূপে?" এ সকল অতি সত্য কথা। এদেশে নীলকরের অত্যাচার দমন হইয়াছে বটে, কিন্তু এদেশে জমীদারের অত্যাচার, পুলিস ও হাকিমের অত্যাচার, ধনী ও মহাজনের অত্যাচার কমিয়াছে কি? একজন সাধুলোক এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, এদেশে দরিদ্রের ঘরে টাকা ও সুন্দরী স্ত্রী নিরাপদ নয়। সুন্দরী স্ত্রী-হরণের দুই চারিটী কাহিনী আজকাল সংবাদ-পত্রে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু শত শত কাহিনী অলিখিত এবং অঘোষিত রহিয়া যাইতেছে। দরিদ্র ব্যক্তি দরিদ্রের স্ত্রী বা কন্যা অপহরণ করিলে সে ঘটনা বিবৃত হইতে পারে, কিন্তু ধনী ব্যক্তি যদি পরস্ত্রী হরণ করে, সে কাহিনী লিখিতে পারে, এমন সম্পাদক এদেশে বিরল। দশ বা শত খানি পত্র পাইয়া ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে দেশের সম্পাদক লিখিতে পারেন, "হাজার হাজার পত্র পাইয়াছেন," টাকার লোভে নানা কলুষিত বিজ্ঞাপন পত্রিকায় করিয়া যাঁহারা দেশকে ডুবাইবার পথ পরিষ্কার করিতে এক-টুও কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা ধনীর দোষ কীর্ত্তন করিবেন, কখনও আশা নাই। এখনকার কাগজের অধিকাংশ সম্পাদক ব্যবসাদারীতে ডুবি-য়াছে—চিন্তা কেবল টাকা, টাকা, টাকা; লোকের হিত, দেশরক্ষা, এ সকল কথা ভাবিবার সময় এ নহে! বিলাসিতার স্রোতে মজাইবার জন্য কত প্রকার তৈলের আবিষ্কার হইয়াছে, সে সকলের প্রচারক এ দেশের পত্রিকা সকল। গ্রাহক জুটাইবার জন্য কত কলুষিত পুস্তক উপহার প্রদত্ত হইতেছে এবং কত জঘন্য গল্পের রচনা হইতেছে। সাপ্তাহিক কাগজেও গল্পের রাজত্ব বিস্তৃত হইতেছে! আর যাঁহারা নীতি ও ধর্ম্ম

প্রচারে ব্রতী, পবিত্রতা যাঁহাদের মুখের অনাহত শব্দ, তাঁহারাও যে সে কাজে টাকার খাতিরে লিখিতেছেন। এবং জাতীয় সাহিত্য গেল গেল বলিয়া চীৎকার করিতেছেন বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"জাতীয় সাহিত্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে।" বাস্তবিকই ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত। সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের আদর নাই। বাহুল্যভগণনা পরিত্যাগ করিয়া সত্যের খাতিরে লেখনী চালনা করে অতি অল্প লোক। সত্য কথা লিখিবার, বলিবার রুচি নাই, ভাষা নাই, ভাষার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নাই। স্বার্থ এবং অর্থের গোলামগিরি করিয়া কখনও সাহিত্যসেবা চলে না। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য, সাহিত্য কেহ লেখে না। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির খাতিরে কেহ তাহা কেনেও না। লেখক লেখেন—কেবল টাকার জন্য, গ্রাহক তাহা গ্রহণ করেন, কেবল লাভের জন্য। উপহার এবং ছবির প্রলোভন বড় শক্ত প্রলোভন। সাহিত্যের এইরূপ অরাজকতার দিনে অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদের আশা করা ঘোরতর মূর্খতা। শুনিতেছি, ইহার উপর আবার বড় বড় ঘরের পার্ব্বণীর বন্দোবস্ত আছে। ইহার উপর আবার লাইবেলের ভ্রূকুটী আছে। সুতরাং অত্যাচার কাহিনী এদেশে অবিবৃত, অলিখিত থাকিবেই থাকিবে। আর সত্য ঘোষিত না হইলে নিম্নশ্রেণীই বা কেমনে রক্ষা পাইবে? —এবং সাহিত্যেরই বা কিরূপে শ্রীবৃদ্ধি হইবে?

সম্প্রতি কাগজে পড়িতেছিলাম, বুয়র যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতের ল্যাবুসিয়র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ক্রুগার প্রভৃতির প্রতিনিধির সহিত যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা লইয়া পার্লিয়ামেন্টের মহাসভায় চেম্বরলেন বিষম আন্দোলন তুলিয়াছেন। মনে করিয়াছিলাম, ল্যাবুসিয়র ভীত হইবেন; কিন্তু ভয় দূরে থাকুক, তিনি যেরূপ সাহসিকতার সহিত উত্তর দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি প্রথমে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে—"চেম্বরলেন মনে করেন যে, প্রত্যেক এম-পিই তাঁহার পত্রের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য।" * তিনি উত্তর দিবার সময়ে যে সব শক্ত কথা চেম্বরলেনকে শুনাইয়া দিয়াছেন, তাহা কেবল এই মহাত্মারই যোগ্য। —যথা—

"For what I may have written or said to Mr Montague White

* "Mr Chamberlain really seems to have reached such a point of self-complacency that he considers that anything in the shape of disapproval of any folish policy, he may deem it to be to his personal interest to adopt, is high treason, and if this delusion increases we shall have him like the Roman Emperors, insisting upon being treated as divinity

I am responsible to the house of commons, of which I am a member; to my constituents, who have done me the honour to send me there, and to the law To you I owe no sort of explanation"

এইরূপে আরম্ভ করিয়া যে সকল তীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, এরূপ একজন সাহসী লোক যদি এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিতেন, এদেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত। শান্তিস্থাপন উদ্দেশে পত্র সকল লিখিত হইয়াছিল, ইত্যাকার কথা লিখিয়া শেষে এই বীর লিখিতেছেন—

"If it is too much to hope that you will act on this suggestion, I would venture to urge that at least you should publish the correspondence between yourself & Mr Hawksley in regard to your alleged knowledge of the contemplated Rhodes-Jameson conscpiracy of 1894"

এরূপ ভাবে সত্যের ঘোষণা করিতে এ যুগে কেবল ল্যাবুসিয়রই সক্ষম। কিন্তু এদেশে এরূপ লোক নাই বলিলেই হয়। দুটী কথা এই উপলক্ষে আমাদের মনে জাগিতেছে। প্রথমতঃ চেম্বরলেন যে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পদ-গৌরবের উন্মত্ততা প্রকাশ পাইয়াছে, এবং ল্যাবুসিয়রের প্রত্যুত্তরে আভিজাত্য এবং পদগৌরবের মস্তকে পদাঘাত করা হইয়াছে। আমরা সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের কথা বলিতেছিলাম। সে সাহিত্য সত্য, স্বাধীনতা ও সাহসিকতার পবিত্র বাতাসে স্ফুজিত হয়। এদেশে জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না কেন? তাহার উত্তর এই, সত্য, স্বাধীনতা ও সাহসিকতার অভাব। সত্য কথা লিখিতে যাহারা ভীত, কুণ্ঠিত, লজ্জিত, তাহাদের দ্বারা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে না। ভল্টেয়ার, রুসো, থিওডোর পার্কার বা ম্যাট্‌সিনির লেখা পাঠ কর, দেখিবে, স্বাধীনতার কি তেজোময় স্ফুলিঙ্গ তাঁহাদের লেখা হইতে নির্গত হইতেছে। লিখিবার সময়, তাঁহারা ভাবেন নাই, কেহ তাঁহাদের লেখা পাঠ করিবে কি না, ভাবেন নাই, অর্থ সমাগম হইবে কি না,—ভাবেন নাই, কে কি বলিবে, বা কে কি করিবে? নির্ব্বাসন বা কারাদণ্ড, উপেক্ষা বা উপহাস, ঘৃণা বা নিন্দা, অত্যাচার বা নিষ্পেষণের ভয় থাকিলে তাঁহারা ঐরূপ পবিত্র সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে পারিতেন না। সহায়

"It is essentially a Chamberlain notion that the Colonial Secretary has a right to call upon M P 's to explain to him anything that they may have written" *Truth*

যায়, সম্পদ যায়, মান যায়, সম্ভ্রম যায়—জীবন যায় বা প্রাণ যায়—এ কিছুরই গণনা তাঁহাদের মনে স্থান পাইত না, যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাহা লিখিবেনই লিখিবেন। টেক্সবুক-কমিটীর মুখ চাহিয়া, বা দশজনের প্রশংসার আশা রাখিয়া, বা বিশ জন গ্রাহক চটিবেন, এইরূপ ভয়ে যাঁহারা লেখনী চালনা করেন, তাঁহাদের দ্বারা কখনও পবিত্র সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে না। যেখানে সত্যের অবমাননা, সেখানে সাহিত্য নিস্তেজ ও স্ফূর্ত্তি-হীন, যেখানে ভীরুতা, সেখানে সাহিত্য মৃতবৎ, যেখানে কাপুরুষতা, সেখানে সাহিত্য মলিন ও নিষ্প্রভ। যে নিজে মৃত, সে অন্যকে জাগাইবে কিরূপে? যে নিজে রুগ্ন, সে অন্যকে বাঁচাইবে কিরূপে? মিথ্যা, ভীরুতা, এবং কাপুরুষতার সম্মিলনে এদেশের সাহিত্য মলিন এবং নিষ্প্রভ, নিস্তেজ এবং মৃতবৎ। এ দেশকে জাগাইবে কে? তুমি বল, জাগিবে, জাগিবে, জাগিবে, আন্দোলনে জাগিবে। জাতীয় ভাবার উদ্দীপনা ভিন্ন কখনও কোন দেশ জাগিয়াছে কি? যে কোন শক্তিশালী দেশে যাও, দেখিবে, সেখানেই সাধারণকে মাতাইবার জন্য উদ্দীপনাময় জাতীয় সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। সে সঙ্গীত শ্রবণে আপামর সাধারণের শোণিত উষ্ণ হয়, মানুষ কারাবাস বা নির্ব্বাসন যন্ত্রণা এবং মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করে। ম্যাট্‌সিনির লেখা পাঠ করিবার মায়ায়, সে দিনও, কত শত শত লোক জীবন-পাত করিয়াছিল, সে কথা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। আর আজ যে উদ্দীপনা-মন্ত্রে ট্রান্সভাল মাতোয়ারা, সে উদ্দীপনাও জাতীয়ও সাহিত্য হইতে। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির দিনে ভারত জাগিয়াছিল, ইতালি, গ্রীস জাগিয়াছিল, সে দিন ফ্রান্স জাগিয়াছিল, এবং আজ ইংলণ্ড জাগিয়াছে। পাশব বলে যদি দেশ জাগিত, তবে, জর্ম্মণি ও রুষিয়া, আজ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইত। না—তাহা অসম্ভব। পৃথিবীর সকল অত্যাচার নিবা-রণের জন্য জাতীয় ভাষা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। মানুষকে পশুত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত করিতে, সাহিত্য ভিন্ন আর উপায় নাই। লেখনীর ক্ষমতা শত সহস্র ম্যাক্‌সিম্‌কে পরাস্ত করে, তাহা চিরকাল দুর্জ্জয় ক্ষমতা এ জগতে বিস্তার করিয়াছে। ধর্ম্মোত্থানের ইতিহাস পাঠ কর—সেখানেও এই কথারই পরিচয় পাইবে। মানুষকে জাগাইতে হইলে—চাই জাতীয় ভাষা, চাই—জাতীয় সাহিত্য। জাতীয় সাহিত্যকে তুচ্ছ করিয়া, দূরে ফেলিয়া, অবহেলা এবং ঘৃণা করিয়া এদেশ যদি জাগিতে পারে, তবে চির-

কালের পোষিত এই মহাসত্য—সাহিত্য ভিন্ন দেশের উত্থান অসম্ভব, অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সেই দিন, সাহিত্যের রাজ্য এই ধরা হইতে তিরোহিত হইবে এবং সেই স্থলে পাশব বলের গৌরব ঘোষিত হইবে। কিন্তু যাহা কখনও হয় নাই, তাহা কি কখনও হইবে? এইরূপ সত্যামূলক পবিত্র সাহিত্য সৃজনের পক্ষে সকলের বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক। ব্যবসাদারী, লাভলোকসান-গণনা, ভয়-সঙ্কোচ-লজ্জা যে সাহিত্যে, সে সাহিত্যকে বর্জ্জন করিয়া, খাটী সাহিত্য সৃজনের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, বড় ছোট সকলকে এক সাম্যের আসনে বসিতে হইবে। ম্যাট্‌সিনির ন্যায় বলিতে হইবে—"We cannot logically declare the children of God to be equal before God and unequal before man

ঈশ্বরের নিকট সকলে এক, মানুষের নিকটেও এক। কোন না কোন বিষয়ে প্রত্যেকজনই বড, বড়ত্বের আবার বড়াই কিসের? বিধাতার সৃষ্ট নরনারী সকলেই কোন না কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠায় বিধাতার প্রতিষ্ঠা—সকল মিলিয়া পূর্ণত্বের সৃষ্টি—মহানের উদ্ভব। কাহা-কেও বাদ দিলেই অংশ হইয়া পড়িল। সকলে মিলিয়া, সমষ্টিতে পূর্ণ হইয়া, সত্য, স্বাধীনতা এবং সাহসিকতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এবং তাহার উপরে জাতীয় সাহিত্যরূপ মহাদুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ব্যবসাদারী বুদ্ধি পরিহার করিয়া, লাভ গণনার কুহক ভুলিয়া—সেই দুর্গে নির্ভয়ে কেবল সত্যের সাধনা করিতে হইবে। সত্য—সত্য—কেবল সত্য। সত্য চির সুন্দর, চির উজ্জ্বল, চির মহিমান্বিত। সত্যে ভূষিত, সত্যে উজ্জ্বল এবং সত্যে মহিমান্বিত হইয়া এই হতভাগ্য, পরপদ-লাঞ্ছিত দেশ যদি একবার পবিত্র সাহিত্যের সেবা করিতে পারে, যাহা হওয়ার হইবে, যাহা পাওয়ার, পাওয়া যাইবে। আর যদি তাহা না হয়, এই নিমগ্ন দেশকে তুলিবার আর উপায় নাই।

রাজার দাসত্বে, ব্রাহ্মণের দাসত্বে, ধনীর দাসত্বে, আভিজাত্যের দাসত্বে এদেশের অনেক শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, এখন আর সঙ্কোচ বা ভয় করিলে চলিবে না। তরী অগাধ সলিলে যখন নিমগ্ন হয়, তখন জাত্যাভিমান, পদাভিমান বা ধনাভিমান বজায় রাখিবার জন্য পরস্পরের সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকিলে যে দশা হয়, এই পতিত, এই নিমগ্ন দেশে এখন ঐ সকল

অভিমান ধরিয়া বসিয়া থাকিলে তদ্রূপই হইবে। উচ্চ, নীচ, বড়, ছোট, সকলে না মিলিলে কখনও দাবাগ্নি নির্ব্বাণ করা যায় না। পতিত এবং নিমগ্ন যাঁহারা, তাঁহাদের আবার অভিমান কিসের? বিপদ যাঁহাদের ঘরের দ্বারে, তাঁহাদের আবার ভয় কিসের? ম্লেচ্ছের পদানত যে, তাহার আবার ব্রাহ্মণত্ব কিসের? পরাধীন যে, তাহার আবার ধনগৌরব এবং পদগৌরব কিসের? এক কথায় মৃত যে, শ্মশানের চুলীতে দাহ হইবার জন্য যে নীয়মান, তাহার পক্ষে এ সকল অভিমানের কথা শোভা পায় না। এখন, এই অবস্থায় সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া—সত্য, স্বাধীনতা এবং সাহসিকতার ভিত্তির উপর সাহিত্যের দুর্গ নির্ম্মাণে চেষ্টিত হও,—যাহার যে শক্তি থাকে, ঢালিয়া দেও। লেখক, লেখ, পাঠক, অর্থ দিয়া সাহায্য কর। যে দিন এইরূপ সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে পয়সা এবং রক্ত ব্যয় করিবে, এ দেশের লোক ধর্ম্ম করা হইল, মনে করিবে, সেই দিন উন্নতির সুপ্রভাত আসিবে। আমাদের ইচ্ছা, আর সকল আন্দোলন নিষ্প্রাণ হউক, কঠোর সাধনার রাজ্যে লেখনী আর মসী অসিরূপে বাঁচিয়া থাক্—আর বাঁচিয়া থাক্ সত্য, স্বাধীনতা, এবং দুর্জ্জয় সাহস। লেখনী এবং মসী ঘর্ষণে সত্য-বিদ্যুতের ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত পাপ ও অত্যাচার, পরাধীনতা ও অন্ধকার তিরোহিত হইবে—সুপ্রভাত আসিবে।

আশ্বিন ১৩০৭।

অনন্ত সংগ্রাম।

১৩০৬ সাল অতীত হইয়াছে, কিন্তু মানব-প্রাণে একটী মহাশিক্ষা রাখিয়া গিয়াছে। সে শিক্ষা এই—জীবন-সংগ্রামে স্বাধীনতার জন্য যশ মান, ঐশ্বর্য্য সম্পদ, অমূল্য শরীর মন সব পরিত্যাজ্য। বুয়রসেনাপতি বৃদ্ধ জুবেয়ার কোন দিন আমেরিকায় বলিয়াছিলেন,—"২০ জন সহচর পাইলে আমি স্বাধীনতা লাভের জন্য সমগ্র পৃথিবীর সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, আমার প্রতিজ্ঞা এই, হয় স্বাধীন হইব, নয় মরিব।" ১৩০৬ সালের শরৎকালে তাঁহাকে মহাপরাক্রান্ত ব্রিটিস্ সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল, অমানুষী বীর্য্যের সহিত, দুর্দ্দম্য তেজের সহিত, অসামান্য কৌশলের সহিত তিনি যুদ্ধের পর

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পৃথিবীকে বিস্ময়ে পূর্ণ করিলেন, কিন্তু হায়, অবশেষে, দেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বেই, সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অখাদ্য আহারে তাঁহার যে উদরাময় রোগ হইয়াছিল, তাহাতেই জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইলেন। মহাত্মার সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল হইল; কিন্তু শত্রুর নিকটও তিনি মহাসম্মান প্রাপ্ত হইলেন।

এই ত মানব জীবনের পরিণাম। ইহার সুখ-সমৃদ্ধির জন্য মানুষ এত লালায়িত কেন, এইরূপ মায়াবাদের কথা কেহ কেহ বলিতে পারেন। মরিবার জন্যই যাহার উদয়, তাহার আস্ফালন, তেজ গরিমা, সকলই মূর্খতার পরিচয় নয় কি? কিন্তু একথা বুঝিয়াও, কিন্তু একথা জানিয়াও মানুষ দিবারাত্রি মহাসংগ্রামে লিপ্ত। জুবেযারের কথা দূরে যাউক, তুমি, আমি, সে, সকলেই কি প্রতিনিয়ত মহাসংগ্রামে লিপ্ত নই? স্বাধীনতার স্পৃহায় মানুষ দিবারাত্রি সংগ্রামে মাতিতেছে। মাতিতেছে, খাটিতেছে, রক্তাক্ত-কলেবর হইতেছে, শেষে—জীবন পরিত্যাগ করিয়া কোন্ অদৃশ্য রাজ্যে চলিয়া যাইতেছে। কে মানুষকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সক্ষম?

সুখ, সুখ, সুখ করিয়া মানুষ দিবানিশি লালায়িত। সুখ কিন্তু চির-কালই মানুষের নিকট আকাশ কুসুম, অথবা আশা মরীচিকা। মানুষেরা বলে, সুখের জন্যই এ জগতে ঘরবাড়া, পরিবার-পরিজন-গণ্ডির মধ্যে স্বাধীন মানুষ বাস করে। কিন্তু সুখ কোথায় মিলে? ঘরে অশান্তি, বাহিরে অশান্তি,—অন্তরে রিপুর তাড়না, বাহিরে শত্রুর তাড়না—সুখ কোথায়? চতুর্দ্দিকে যেন শ্মশানের চুল্লী সকল প্রজ্জলিত। যেদিকে মানুষ ধায়, সেই দিকেই তীব্র দাহন। মানুষ যায় কোথায়?

যাহার ঘরে অনেক টাকা, তাহার সংসারের অভাব কম, কিন্তু অন্তরের অভাব, অন্তরের অশান্তি তাহার, বোধ হয়, আরো বেশী। তাহার ঘরে হয়ত পুত্র কন্যা হয় নাই। অথবা হইয়াছিল, মৃত্যু অপহরণ করিয়াছে। তাহার পরিবার হয়ত তেমন করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারে না। অথবা তাহার বন্ধু এবং আত্মীয়েরা সকলেই কেবল টাকা টাকা করে, নিঃস্বার্থরূপে ভালবাসে না। অথবা সদা ভাব ভয়, পাছে তার টাকা যায়, বিত্ত যায়। তাহার এইরূপ নানা অশান্তি। আর যাহার ঘরে টাকা নাই, যাহাকে সংসারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিত্য চিন্তিত হইতে হয়, তাহার ভাবনা কত, ভুক্তভোগী কে না জানে? রিপুর তাড়নায় সে বিবাহ না

করিয়া পারে নাই, কিন্তু বিবাহের পরই তাহার ঘরে একটী, একটী, একটী করিয়া ক্রমাগত মানব-শিশু সকল অবতরণ করিতেছে, অভাবের কথা, রিপু শুনিল না, অভাবের কথা বিধাতার চরণেও পৌছিল না, অথবা তিনি যেন শাস্তি দিবার জন্যই একটীর পর আর একটী পাঠাইয়া ঘর সাজাইলেন। সন্তানদিগের ক্ষুধার ক্রন্দনে সদা সে অস্থির, তার আর কিছুই ভাল লাগে না। এত অভাব তার ঘরে, তবু তার ঘরেও রোগ, শোক, নিত্য উকি মারিতেছে। দুঃখ দারিদ্র্য প্রচুর আছে। তবুও সেই ঘরে রোগশোক নিত্য আনাগোনা করিতেছে। গৃহীর মুখ মলিন, দিন দিন আরো মলিন হইতেছে। আর সহ্য হয় না। হতাশ বীর-গৃহী-জুবেয়ার এইবার বুঝি প্রাণত্যাগ করে।

এইরূপ এক একটী ব্যক্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর, দেখিবে, সকলেই বলিবে,—"না, সুখ শান্তি কিছুই জীবনে পাইলাম না। খুঁজিলাম, খাটিলাম, বিষম সংগ্রাম করিলাম, কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইলাম না। দুঃখ দরিয়ায় ভাসাইবার জন্যই বুঝিবা বিধাতার এই সৃষ্টি রহস্য।"

মানবজীবন মহা সমস্যাময়। মহাসমস্যাময় নয়, মহা সংগ্রামময়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দিবারাত্রি মানুষকে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। কেন, কিসের জন্য এই সংগ্রাম, মানুষ তাহা জানে না। কোথা হইতে মানুষ আসিয়াছে, জানে না, কোথায় যাইবে, তাহাও জানে না,—আদি এবং পরিণাম কিছুই মানুষ জানে না। দিবারাত্রি যেন ভূতের ব্যাগার খাটিতেছে। কিসের জন্য বল ত? যাহাদের জন্য রক্ত জল করিতেছি, তাহারাও ফাকি দিয়া চলিয়া যাইতেছে। লোকে সুখের জন্য ঘর বাঁধিতেছে, সে ঘর ঝড়ে পড়িতেছে, আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে। আবার আশা, আবার তাহাতে ভস্ম। ক্রমাগত আশায় নিরাশা। কিসের জন্য মানুষ এত খাটিতেছে? জীবন-সমস্যা মহা প্রহেলিকাময়।

কেহ কেহ বলেন, সব মানুষ যদি ভাল হইত, তবে এই সংসারে এত দুঃখ দারিদ্র্য থাকিত না। স্বার্থ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছলনা, বঞ্চনা, হিংসা, বিদ্বেষ—এ সকল যদি না থাকিত, মানুষ সকল যদি পরস্পরের সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইত, তবে পৃথিবীতে এত দুঃখ দারিদ্র্য থাকিত না। কমুনিষ্ট ও সোসিয়ালিষ্ট দল, এই জন্য, মানব-একীকরণের জন্য সাধারণের সম-সম্পত্তি-প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। একজন যে অভাব দূর করিতে পারে না, দশের সাহায্য পাইলে অনায়াসে তাহা পূরণ হইতে পারে। তাহারা বলে,

সহানুভূতির অভাবে এই পৃথিবী মরুভূমির ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখ দারিদ্র্য, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। এ কথায় কতক সত্য থাকিলে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সহানুভূতি দিন দিন এজগতে এত দুষ্প্রাপ্য হইতেছে কেন? মানব-প্রেম, দিন দিন মানব-বক্ষ হইতে তিরোহিত হইতেছে কেন? পরার্থের স্থানে স্বার্থচিন্তা দিন দিন মানব-অন্তরে বদ্ধমূল হইতেছে কেন? একজনের ভাল, অন্যের সহ্য হয় না কেন? একজনকে অপদস্থ করিতে অন্যে দলবদ্ধ হয় কেন? এত দলাদলি, মারামারি রক্তারক্তি কেন? তুমি বাল্যকাল হইতে একজনকে প্রতিপালন করিয়াছ, বুকের রক্ত জল করিয়া মানুষ করিয়াছ, ভাবিয়াছিলে, বার্দ্ধক্যে সে তোমাকে দুঃখ দারিদ্র্যের কষাঘাত হইতে রক্ষা করিবে, কিন্তু হায়, সে স্বাধীন হইয়াই তোমার বুকেই অগ্রে ছুরিকাবিদ্ধ কবিবার জন্য ব্যস্ত। কেন এরূপ হইল? তুমি যাহার উপকারেব জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলে, আজ সে-ই তোমার সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর। যাহার নিকট যত আশা, সেইখানে তত নিরাশা॥ কেন এরূপ হইল? কৃতজ্ঞতা কোথায়? এ জগতে আর কি রামের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা আছে? কমুনিষ্ট সোসিয়ালিষ্টদিগেব আশা কি কখনও পূর্ণ হইবে? হায়, মানুষ পৃথক হইবার জন্যই যেন দিবানিশি ব্যস্ত। এ পৃথিবী যেন ভীষ্মের শবশয্যা। একীকরণ কোথায়? স্বার্থের তাড়নায়, স্বাতন্ত্র্যেব গঞ্জনায় সব দূব, দূব, অতি দূর। কত আঘাত প্রতিনিয়ত মানুষকে সহ্য করিতে হইতেছে, কে তাহার ইতিহাস লিখিতে পারে?

আশার ধারেই নিবাশা। বাল্যকালে মহা পিপাসা ছিল, ধার্ম্মিক হইব। কত চেষ্টা, কত সাধনা করিলাম। হইলাম, দিন দিন যেন পশু। বাল্যকালে জ্ঞানপিপাসা বড প্রবল ছিল, যেরূপে হয়, জ্ঞান উপার্জ্জন করিব, আশা ছিল; এমন জীবনের শেষ অঙ্কে পৌছিয়া দেখিতেছি, দিন দিন যেন মহা মূর্খ হইতেছি। এতদিনের এত চেষ্টা, সব যেন পণ্ড হইয়া গিয়াছে। বাল্যকালে আশা করিতাম, আর কিছু না পারি, মানুষকে হৃদয় ঢালিয়া ভালবাসিব, বুকের রক্ত দিয়া মানুষের সেবা করিব। এখন ঠকিয়া, শিখিয়া, মানব-ঘৃণার পথেই পাদচারণা করিবাব জন্য যেন অগ্রসব হইতেছি। একজন বন্ধু বলেন—"তোমাকে মিসানথ্রোপ হইতেই হইবে, হয় আজ, নয় কাল।" আমি মহাদর্পে বলিয়াছিলাম, "কখনই না, বিধাতা নিশ্চয় আমাকে রক্ষা করিবেন।" কিন্তু এখন অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিতেছি, হায়, কোন্

পথে চলিয়াছি? প্রতারিত হইয়া হইয়া এখন কি মানব-ঘৃণা নরককেই আমার গতি হইবে? বিধাতাকে সভয়ে ডাকিতেছি এবং রক্ষা করিতে বলিতেছি। কিন্তু মনের গতি থামে কই? গতি চলিয়াছে, অবিরাম, অবিশ্রাম। দেবাসুরে মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে।

এইরূপ অন্যের কথা এবং নিজের কথা, যাহার কথা ভাবি,সকল সম্বন্ধেই এই এক কথা—আশা এবং নিরাশার মহাসংগ্রাম। জীবন-ব্যাপিয়া এই সংগ্রাম চলিয়াছে। এক দিনের জন্যও বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। কবে বলত যুদ্ধের অবসান হইবে।

আফ্রিকার মহা সমর থামিতেছে না বলিয়া কত দুঃখ করিতেছি, কিন্তু ঘরে ঘরে, হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রতিনিয়ত মহাসংগ্রাম চলিতেছে। শান্তিতে অশান্তিতে, সুখে দুঃখে, পাপে পুণ্যে, স্বার্থে নিঃস্বার্থে, হিংসায় অহিংসায়,—আশায় নিরাশায় প্রতিনিয়ত মহাসংগ্রাম চলিয়াছে! হায়, হায়, হায়, কি উপায় হইবে?

অনন্তের রাজ্যে অনন্ত সংগ্রাম। অনন্তের ছায়ায় মানব প্রাণ অনন্ত আশায় গঠিত। অনন্ত আশার ধারেই অনন্ত নিরাশা। অনন্ত পিপাসা মানুষের কখনও মিটিবার নহে, তাই যেন অনন্ত সংগ্রাম চলিয়াছে। বুঝিবা জীবন-লীলার শেষ দিন পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম চলিবে। কিম্বা তাহারও পরে চলিবে কিনা, কে জানে? প্রতারিত হইতেছি প্রতিনিয়ত, হারিতেছি, অহরহ, কিন্তু তবুও আবার অগ্রসর হওয়ার জন্য আয়োজন করিতেছি। পরিণাম মানুষ যদি ভাবিতে পারিত, কখনও এরূপ করিত না। শ্মশানে বসিয়াই মানুষ নব আশার স্বপ্ন দেখিতেছে। ট্রানস্ভ্যাল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রাজ্য, কিন্তু আজ মহা সমরে মাতিয়া পরিণাম ভুলিয়াছে, ক্ষমতা ভুলিয়াছে, শক্তি ভুলিয়াছে। ঠিক আমাদেরও দশা এইরূপ। প্রতিনিয়ত পাপ-সংগ্রামে পরাজিত হইয়াও, আবারও পুণ্য সংগ্রামের জন্য মাতিতেছি। দুঃখ দারিদ্র্যের সংগ্রামে বারম্বার পরাজিত হইয়াও আবার সুখ শান্তির সংগ্রামের জন্য লালায়িত হইতেছি। যেন ইহাই শান্তি, ইহাই পরিণাম, ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই মুক্তি। এমনই মত্ততা॥

সতাই ১৩০৬ সালে এই শিক্ষা পাইয়াছি, অনন্ত সংগ্রামের মত্ততা কেবল পবিত্রতামূলক স্বাধীনতা লাভের জন্য। মানুষ কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে ভালবাসে না,—দুঃখের না, পাপের না, দারিদ্র্যের না, শোকের

না।—না, সে কাহারও দাসত্ব করিতে চায় না। সকলের অতীত হওয়ার জন্য সে দিবানিশি সংগ্রামে মত্ত। শক্তিতে কুলায় না, সে তাহা বুঝিবে না, তুমি জ্ঞানী পণ্ডিত, তাহাকে গালাগালি দিলে কি হইবে, সে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। এই ভবের মহাসংগ্রামের মহা মত্ততায় সকলকে ঘেরিয়াছে। কেহ তাহা থামাইতে সমর্থ নয়।

বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, আমরা নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়া মরিয়া মনে করি, আর পারিব না, এইবার বুঝি যাই, কিন্তু আবারও যেন কে মাতাইয়া তোলে! ১৭ বৎসর নব্যভারত দেশের সেবা করিয়াছে,—পাইয়াছে কি?—অপযশ, নিন্দা, তিরস্কার, ভ্রুকুটী, অবহেলা—কত কি!! একজনের আদর পাইয়া থাকিলে দশজনের ঘৃণা পাইয়াছে। সহানুভূতির অভাবে জাতীয় ভাষার ক্ষেত্রটা যেন মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। সময়ে সময়ে লোকের নিকট তীব্র ব্যবহার পাইয়া ভাবিয়াছি, আমাদের যৎসামান্য শক্তি লইয়া কেন এই মাতৃসেবারূপ পবিত্র তীর্থে যাইবার চেষ্টা করিতেছি? কেন ভ্রান্তিতে মজিতেছি? আমরা কি মাতৃসেবার যোগ্য? আত্মশুদ্ধি নাই, পাণ্ডিত্য নাই, বুদ্ধি নাই, পবিত্রতা নাই, নিঃস্বার্থতা নাই—জ্ঞান নাই, বিবেচনা নাই, আমরা যৎসামান্য ব্যক্তি কেন এই বৃহদ্ব্যাপারে হাত দিয়াছিলাম? বড় বড় যোদ্ধারা যেখানে হতমান, আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কেন আশা করিয়া সেদিকে অগ্রসর হই? শরীরের রক্ত জল করিয়া খাটিলাম, অনুরোধে বহুবৎসর কাগজ দিয়া, অর্থাভাবে নিষ্পেষিত হইয়া পত্রের উপর পত্র লিখিলাম, কত হাতে পায়ে ধরিলাম, কিন্তু তেমন ফল পাইলাম কই? কতজন নীরবে কাগজগুলি আত্মসাৎ করিলেন। সহানুভূতি পাইলাম যদি শতকরা ২০ জনের, গালাগালি পাইলাম আশী জনের। তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে কোন প্রবন্ধ ছাপাইব না, এরূপ পরাধীনতার কবুলিয়ত লিখিয়া দিয়া চিরকাল কাগজ পাঠাইতে রত থাকি নাই, আমাদের ইহা বড় অন্যায়! মূল্য চাওয়া বিষম বেয়াদবি। তাঁহারা টাকা দিতেও বাধ্য নন! কাগজ ফেরত দিতেও বাধ্য নন্। * জাতীয় ভাষার উন্নতি কল্পে সকলের সাহায্য

* এইরূপ অবস্থা, বোধ হয়, এদেশের অনেক সম্পাদকেরই। ইণ্ডিয়ান নেশন বলেন—Somehow or other though agitation is every day extending, charity is continually shrinking within narrower and narrower limits * * The legitimate boast of a patriotic citizen should be not that he has spent so

চাওয়া মহা ভ্রান্তি! সহানুভূতি পাইব, ভালবাসা পাইব, উপকার পাইব, এইরূপ আশা করাই মহা ভ্রান্তি। এই রূপ আশা যে করে, সে কি মানুষ? তাহার দ্বারা কি জগতের কোন কাজ হইতে পারে, এই চিন্তা এখন সমুপস্থিত। যে ক্ষেত্রে সহানুভূতি ও অর্থাভাবে বঙ্গদর্শন গেল, আর্য্যদর্শন গেল, বান্ধব গেল, জ্ঞানাঙ্কুর গেল, নবজীবন গেল, প্রচার গেল, ভারতীর সম্পাদক ৫ বার পরিবর্ত্তিত হইল, সেই ক্ষেত্রে শক্তিহীন আমাদের দ্বারা কি এই পবিত্র কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পাবে? যিনি যতই চেষ্টাই করুন, জাতীয় ভাষার উন্নতি কল্পে এদেশে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় সাধারণের সাহার্য্য ও সহানুভূতি কখনও পাইবেন না। এদেশেব বড বড লোকেরা মনে করেন, জাতীয় ভাষার উন্নতি ভিন্নও দেশের উন্নতি হইবে। সাহিত্য-সম্মিলন সহানুভূতি উদ্দীপনের জন্য যত চেষ্টাই করুন, এই নির্ম্মম বঙ্গ মরুভূমিতে তাহা হইবে না। হতাদর, নিষ্পেষণ, দারিদ্র্য লেখকদের কিছুতেই ঘুচিবে না,—বাঙ্গালা ভাষার আদর বাড়িবে না। কিন্তু এই ঘোর নিরাশার মধ্যে কে যেন আবার আমাদিগকে মাতাইবার জন্য আয়োজন করিতেছে। ফাল্গুন গেল, চৈত্র গেল,—বৈশাখ আসিল। নববর্ষে কে যেন আবার বলিতেছে,—'না, বিরাম, বিশ্রাম ভাগ্যে নাই,—মরিয়া, মরিয়া, মরিয়াও সংগ্রাম করিতে হইবে।' যখন এইরূপ আদেশ শুনি, তখন ত শক্তির কথা আর মনে থাকে না, তখন অসামান্তের ছেলে যেন অসামান্য হইয়া যায়। আদর পাইয়া ভালবাসে সকলেই, আদর না পাইয়া ভালবাসিতে পারিলেই ত সুখ। যে আমাকে চায় না, আমি তাহার হইতে পারিলেই ত মানুষ হইয়া যাইতে পারি, কে যেন অন্তরে দিন রাত্রি এরূপ কথা বলিতেছে। কিছু প্রত্যাশা না রাখিয়া জীবন চালিয়া সংগ্রাম কর—কে যেন কেবল এরূপ কথা বলিতেছে। অযোগ্যের প্রতি এত শক্ত আদেশ। গোলা নাই, গুলি নাই, সহায় নাই, সম্বল নাই, কি পরিণাম, জানা নাই, তবুও সংগ্রামে মাতিতে হইবে! যাহাদের অনেক আয়োজন, তাহারা দিক কাঁপাইয়া, বিউগেল বাজাইয়া গৌরব, মহত্ব, কৃতিত্ব,—সকলের সকলত্ব ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু হতবুদ্ধি, নিঃসম্বল বৃদ্ধ কৃপার আজ নীরবে

much on agitation, but that he has spent so much for the public weal being Is the Bengalee fortunate enough to realise all its subscription? If not, will it be good enough to tell the world how many patriotic delegates are to be found among the defaulters?"

The *Indian Nation*, April 23, 1900

দেহ বিসর্জ্জনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।। ফ্রান্সে মহাত্মা ল্যামিনে যেমন স্বাধীনতার জন্য দেহবিসর্জ্জনের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন, আজ উৎসর্গ-মঞ্চে দাঁড়াইয়া ক্রুগারও তেমনি অপেক্ষা করিতেছেন। মরিবে সকলেই, কিন্তু স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া মরি‍বে কে? বিধাতার আদেশ, সর্ব্বস্বান্ত হইলেও ব্রত পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। সেনাপতির আদেশ, সংগ্রামক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। নিজ ইচ্ছা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সেনাপতির হাতে পুত্তলিকাবৎ আমরা নাচি এবং খেলি। মহা মত্ততা দেখিয়া জগৎ হাসুক, আমরা মায়ের সন্তান, পাপ পরাধীনতার সংগ্রামে জয়ী হইয়া মাতৃ-ক্রোড়ে উঠিয়া যাই। মা আনন্দময়ী আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। অভাব আছে, তাহা থাকুক, নিঃস্বম্বল ব্যক্তি কেবল মাতৃ-কৃপাসম্বলে মাভৈ মাভৈ রবে জীবন-সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ মন্ত্রে দীক্ষিত হউক। মা আনন্দময়ীর লীলা-রহস্যের জয় হউক।

বৈশাখ, ১৩০৭।

দ্বৈতাদ্বৈত চিন্তার অনুশীলন।

সকল কথা, সকল সত্য, সকল শাস্ত্রের মূল আমি। আমিত্বের বিকাশ হইতে কথা, সত্য ও শাস্ত্র। আমিত্বের প্রসার, বিকাশ ও বিস্তৃতি ভিন্ন কিছুরই অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। আমি না থাকিলে আমার নিকট কিছুই নাই—সব শূন্য। আমি আছি বলিয়াই আমার নিকট সব অস্তিত্ববান।

আমি কি, আমি কে? আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় যাইব? কত দর্শন কত ভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু অকূলের কূল নির্ণয় করিতে পারে নাই। আমিত্বের উদয় এবং তিরোধান কেহ জানে না, বুঝে না—কেহ দেখে নাই, কেহ স্পর্শ করে নাই, কেহ অনুভব করে নাই। সকল ইন্দ্রিয় এখানে পরাস্ত। পড়িবামাত্র মানব-শিশুর যে শ্বাস চলিতে আরম্ভ হইল—মৃত্যুর সময় সেই শ্বাস বন্ধ হইল,—কে আসিল, কে গেল—চিরকাল মহা সমস্যাময়। কোথা হইতে আসিল, কোথায় গেল—চিরকাল মহা সমস্যাময়। কোন্ ব্যাখ্যা সমীচীন? কোন্ টীকা প্রত্যক্ষ সত্যমূলক? অকূলের কূল নির্ণীত হয় নাই—হইবে না,—হইবার নয়। আমিত্বের মহাবীজে অনন্তেরই মহা আভাস। তুমি বল সান্ত, সান্ত, সবই

সান্ত, কিন্তু আমি অণু পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া এই চৈতন্যময় মানব বীজের মূলে সর্ব্বত্রই কেবল অনন্তের আভাস পাই। আমি বলি—সবই অনন্ত,—সান্ত বা পরিমিত কিছুই নাই।

জড় বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিয়াছে, জড় অবিনশ্বর ;—মনোবিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিয়াছে, চৈতন্যও অবিনশ্বর। মানুষ জড় ও চৈতন্যের সংমিশ্রণ, সুতরাং মানুষও অবিনশ্বর। পঞ্চভৌতিক দেহ মৃত্যুর পর পঞ্চ ভূতে বিলীন, কিন্তু চৈতন্য কোথায় লুকাইল? পাখী কোন্ অদৃশ্য জগৎ হইতে আসিয়াছিল, কোথায় গেল, কেহই জানে না। অবিনশ্বর চৈতন্য কোন্ রাজ্যে প্রস্থান করিল, কল্পনার কথা বাদে দিলে, কেহই ঠিক বলিতে পারে না। মহাসমস্যা, মহা প্রহেলিকা। যদি বলিতে পারিত, তবে আমিত্বের সোপান অবলম্বন করিয়া অনন্তের আভাস পাওয়া যাইত না। সান্ত মানুষে, অনন্তের মহা-মিলন।

সান্ত মানুষে যেমন অনন্তের মহামিলন, এই সান্ত মানুষেই, তেমনি, দ্বৈতাদ্বৈতের মহা ব্যাখ্যা। আমি মাটীর পুতুল, আমি সোণার পরী। আমি যখন পাপের পথে ঘুরি, পাপ চিন্তা, পাপ আহার, পাপ পান করি, তখন আমি মাটী তুল্য,—অথবা মাটী অপেক্ষাও হীন এবং নীচ। মানুষের অকার্য্য কি আছে? পাপের সংসারে মানুষকে অন্বেষণ কর, দেখিবে, পশুর পশুত্বও তুলনায় ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। আমি সে সকল পাপের কাহিনী আর বিবৃত করিব না। পাপের সংসার—মোহের মহান্ধকারে আচ্ছন্ন, সৎ, চিৎ আনন্দ-সূর্য্যের প্রকাশ সেখানে নাই। সেখানে কেবল অসুর, পিশাচ, নররূপী সয়তান বাস করে। সে দ্বৈতপুরা। আমি যখন নররূপী সয়তান, তখন শ্রেয় বা বিবেক আমার নিকট প্রকাশিত হয় কি? ডুবিতে ডুবিতে এমন অন্ধকারময় প্রদেশে আসিয়াছি, যখন আর দেবধামের কোন কিছুর সাক্ষাৎ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখন আমি পৃথক, তখন আমি নরক, তখন আমি দ্বিত্বে বিহার করিতেছি। স্বর্গের বাণী কচিৎ শুনিলেও তাহা গ্রাহ্য করি না, আমি তখন অহংময়। আমি বলি, আমি চলি, আমি করি—তখন আমি সর্ব্বেসর্ব্বা। আমার প্রতি কথায় গরল, প্রতি পদনিক্ষেপে নরক, প্রতি কার্য্যে পাপ। এ হেন অবস্থায় আমি দ্বিত্বের রাজ্যে স্বামিত্বের বিজয় নিশান উড়াইতেছি। কিন্তু দৈব কোন ঘটনায়, কোন প্রক্রিয়ায়, কোন লীলায় এই আমিত্বের কখন কখন আবার রূপান্তর হয়। যে নর-

হত্যার লিপ্ত ছিল, সে কখনও আবার নরসেবায় প্রবৃত্ত ; যে ইন্দ্রিয়াসক্তিতে ডুবিতেছিল, সে কখনও আবার সংযমের পথে ফিরিতেছে,—যে নরকের পথে মরিতেছিল, সে কখনও আবার স্বর্গের অন্বেষণ করিতেছে। মৃত্যু সদা এই সংসারে বিচরণ করিয়া মোহের জাল ছিন্ন করিতেছে—মানুষকে যেন সদা সতর্ক করিতেছে। মানুষ একদিন, দশ দিন, এক বৎসর, বা দশ বিশ বৎসর ভুলিতে পারে, কিন্তু চিরকাল ভুলিয়া থাকিতে পারে না। ভুলিতে চায় সে, কিন্তু তবুও পারে না। কে যেন সদা তাহাকে জাগাইতে চেষ্টা করিতেছে। পতনের পর উত্থান হইবেই হইবে,—কেহ চিরপতিত থাকিতে পারে না। দ্বৈতের ভিতরে অদ্বৈতের মহাপ্রকাশ।

দ্বিজত্ব পায় নাই, পুনর্জন্ম হয় নাই, এই সংসারে এমন মানুষের কল্পনা করা যায় না। জগাই মাধাই নবদ্বীপের জঙ্গলে দস্যুগিরি করিয়া ফিরিত, হঠাৎ অদ্বৈতের প্রকাশে রূপান্তরিত ; বাল্মীকি নরহত্যা করিয়া অরণ্যে জীবন কাটাইতেন, অদ্বৈতের আবির্ভাবে তিনি হঠাৎ মহাকবি। এক সময়ের সল, পল হইলেন, এক সময়েব আগষ্টাইন, সেণ্ট হইলেন। এক সময়ের গর্ব্বিত নিমাই পণ্ডিত, সময়ান্তরে প্রেম ভক্তিতে নমিত শ্রীচৈতন্য ; এক সময়ে যিনি সূত্রধরের পুত্র যিশু, অন্য সময়ে তিনি মানবের উদ্ধারকর্ত্তা খ্রীষ্ট। মহম্মদ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, স্বর্গের আলোক হঠাৎ তাঁহার মস্তকে অবতীর্ণ হইল। শ্রীচৈতন্য কখনও কখনও বলিতেন, "মুই সেই," খ্রীষ্ট বলিতেন, "I and my father are one,—" এ কোন্ অবস্থায় ? দ্বৈতের রাজ্যে চৈতন্য এবং খ্রীষ্ট, শচী ও মেরীনন্দন, কিন্তু অদ্বৈতের রাজ্যে উভয়েই আত্মহারা আর একটা কিছু। আমি, আমি, আমি—মাটীর পুতুল, পাপের কীট ; সময়ান্তরে এই আমি, স্বর্গের পরী, সোণার চাঁদ। আমি কখন শুধু আমিই, আবার কখনও যেন আর এক রাজ্যের জীব। আমি দ্বৈত, পাপের পথে, আমি অদ্বৈত—পুণ্য বা স্বর্গের পথে। আমি কে ? আমার ভিতরে যখন পাপ কিলবিল করিতেছে,—ইন্দ্রিয় বা রিপুর তাড়নায় যখন আমি অস্থির, তখন আমি স্বর্গভ্রষ্ট, দেবত্বভ্রষ্ট অসুর, আমি তখন পৃথক। এই আমার ভিতরে যখন পুণ্যের আবির্ভাব, সংযমের কশাঘাতে যখন মোহাসক্তির বন্ধন রজ্জু ছিন্ন, আমি যখন ধীর এবং স্থির—যখন দয়া, প্রেম, পুণ্য, জ্ঞান ও সেবায় নিষ্কাম মহাযোগী, তখন আমি কে ? তখন আমি চিতের অংশ ; অংশ নই, আমিত্ব তখন চিন্ময়ত্বে বিসর্জ্জিত হইয়াছে—তখন অদ্বৈত

শক্তি-সিন্ধুতে তরঙ্গ উঠিতেছে, তখন পৃথিবীর দ্বৈত অসুরের বিনাশ সাধন হইয়াছে।

কাল অনবরত মানুষের মস্তকে কিছু চাপাইয়া যাইতেছে। সময় কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কেহ জানে না, কিন্তু ইহা সকলেই জানে, সময় কিছু না কিছু মানুষকে দিয়া যাইতেছে। সময় দিয়া যাইতেছে বলিয়াই মানুষ অতীত বংশের সঞ্চিত সত্য জ্ঞান পুণ্য রাশির উত্তরাধিকারী। বংশ পরম্পরায়, কত জ্ঞান, কত ভাব, কত শিক্ষা, কত অভিজ্ঞতা মানুষের মস্তকে চাপিতেছে। কালের সংগ্রাম বড ভীষণ সংগ্রাম। মানুষ মায়া মোহের অধীন হইয়া মজিয়া থাকিতে চাহিলেও, সময় তাহা দিতেছে না। সময়—বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর প্রৌঢ়, প্রৌঢেব পর বার্দ্ধক্য আনিতেছে। মানুষ ইচ্ছা বা চেষ্টা না করিলেও, সময় তাহার মস্তকে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা চাপাইয়া দিতেছে। সময়ের পীড়নে মানুষের জ্ঞান, পুণ্য, ভাব, অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও রিপু নিস্তেজ হইতেছে, মস্তিষ্ক শিথিল হইতেছে, স্মৃতিশক্তি হ্রাস হইতেছে, সে ক্রমে ক্রমে বলবীর্য্য, ক্রমে ক্রমে শক্তি সৌন্দর্য্য, ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি ও সংসারাসক্তি হারাইতেছে—সে যেন দিন দিন কেমন হইতেছে। মানুষের সাধ ও ইচ্ছা অনেক—কিন্তু হায়, সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে না হইতে, সে সাধ মিটিতে না মিটিতেই চিত্ত নিস্তেজ, ইন্দ্রিয় শ্লথ, অঙ্গ পরিম্লান হইয়া আসিতেছে। ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে, তাহার বাসনা, তাহার কামনা, তাহার আসক্তি, তাহার পাপানুরাগ,—কি জানি কেন, কমিয়া আসিতেছে। অপূর্ণ পিপাসা, কি জানি কেন, আপনা আপনি হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সে আগে কত বাক্যুদ্ধ করিত, এখন সহস্রবার উত্তেজনা করিলেও একটী কথাও বলিতে চায় না; পরনিন্দায় তাহার কত উল্লাস ছিল, এখন হাজার উত্তেজনা করিলেও কাহারও নিন্দা করিতে সে চায় না, সে আগে কোন মানুষের ভাল দেখিতে পারিত না, হিংসা-বিদ্বেষে জর্জ্জরিত ছিল, এখন সে সকলের উন্নতি দেখিলে কত উল্লসিত হয়, সে আগে কাম ক্রোধ ও লোভের উত্তেজনার জন্য না করিত, এমন কাজ নাই; এখন সব ঝটিকা যেন থামিয়া আসিতেছে—দিন দিন সে আসক্তিহীন, কামনাহীন, বাসনা-রহিত,—কি জানি কেমন এক প্রকার কোন্ রাজ্যের লোক হইয়াছে। তুমি তাহার সহস্র নিন্দা কর,সে ফিরিয়াও চাহে না, তুমি তাহার কত অনিষ্ট করিতেছ,

সে একবারও তাকায় না,—সে সে দিন দিন যেন কেমন হইতেছে। দেব-দূত সময়, মানুষকে, ঘটনা, অবস্থা, শোক দুঃখের ভিতর ফেলিয়া নিষ্পেষিত করিয়া এমন একটা অবস্থায় শেষে উপস্থিত করে, পূর্ব্বের মানুষ যেন আর নাই। পূর্ব্বের মানুষকে অন্বেষণ কর,আর এ সংসারে তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে না। বাল্যে যে ছিল, যৌবনে সে নাই, যৌবনে যে ছিল, বার্দ্ধক্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এক অবস্থায় মৃত্যু, অন্য অবস্থায় পুনর্জন্ম, সংসারের নিত্য ঘটনা। নবজীবন লাভ করিতে করিতে, শেষে, বার্দ্ধক্যে আমিত্বের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইতেছে,—ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলন হইতেছে—এক মহতী ইচ্ছা তাঁহাকে যেন পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। স্বতন্ত্র মানুষ মরিয়া গিয়াছে, চিৎরাজ্যে অদ্বৈতের উদয় হইয়াছে। বন্ধু তুমি কি বল?

বয়স করে কি?—বয়স শোক দুঃখের শীতল বারি সিঞ্চনে আসক্তির প্রজ্জ্বলিত আগুন নির্ব্বাণ করে। এই সংসার যেন শিক্ষালয়। কর্ম্মবন্ধনে ফেলিয়া, খাটাইয়া, কোন্ মহামায়া যেন মানুষকে নির্ব্বাণের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এই সময়ে কেবল কাজ, কেবল কর্ম্ম। মানুষ অবিরত খাটিতেছে, ছুটিতেছে, একটুও বিরাম নাই। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কত খাটুনী, ঘর বাড়ী পরিবারের জন্য কত খাটুনী, সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য কত খাটুনী। খাটিতে খাটিতে মানুষ পরিশ্রান্ত, তবুও খাটুনির বিরাম নাই। দ্বৈত অবস্থায় কর্ম্মবন্ধন মহা বন্ধন,—এই বন্ধনমুক্ত না হইলে আসক্তির রজ্জু ছিন্ন হয় না। অমুক্ত অবস্থায়, এইরূপে—একটু ভালবাসিলাম, তৃপ্তি নাই, আরো বাসিলাম, তবুও তৃপ্তি নাই। একটু জ্ঞান চর্চ্চা করিলাম, তৃপ্তি নাই। আর একটু চর্চ্চা করিলাম, তৃপ্তি কিছুতেই মিলিল না। ক্রমাগত হাটিতে ছুটিতে খাটিতে লাগিলাম। অনন্তের পথে অনন্ত খাটুনি। যাইতে যাইতে, খাটিতে খাটিতে—শেষে, অবশেষে, হায় একি তত্ত্বে আসিয়া পৌঁছিলাম? পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, ভাই বন্ধুর ভালবাসার পথে হাটিতে হাটিতে, শেষে, এক অনন্ত প্রেমের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত। জ্ঞানের চর্চ্চা করিতে, শেষে, এক অকূল জ্ঞানসাগরে আসিয়া উপনীত। মনুষ্যত্বের পথে হাটিতে হাটিতে, শেষে, মানুষ দেবত্বে উপনীত। বয়সের পরিপক্কতার সহিত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের পরিপক্কতা উপস্থিত। অসম্পূর্ণতা —পাপ, মোহ, আবিলতা ঘুচিতে ঘুচিতে, শেষে পূর্ণত্বের দিকে অভিযান। তবুও যদি তুমি এহেন মানুষকে দ্বৈত পদবীতে বসাইতে চাও, আমি নাচার।

বৃদ্ধের স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়াছে,—চিন্ময়ত্বে তাহার সকল স্বাতন্ত্র্য, সকল রিপু, সকল ইন্দ্রিয় নির্ব্বাপিত,—সে এখন অদ্বৈতের ভিতরে সুষুপ্ত। ইহাকে মানুষেরা না বুঝিয়া মৃত্যু নামে অভিহিত করে। হায়, না বুঝিয়া কত ক্রন্দন, কত হাহাকার করে॥ আমি বলি দ্বৈত মানুষ এখন অদ্বৈত সিন্ধুতে নিমগ্ন। মহা যোগ, মহা সমাধি, মহামিলন। পিতা পৃথক, পুত্রও পৃথক,—পুত্র পিতার রাজ্য, সৎসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া কত বিপথে ঘুরিল, এখন আবার পিতার চরণতলে উপস্থিত,—এখন পিতা পুত্রের মিলন হইয়াছে, এক ইচ্ছা, এক জ্ঞান, এক তত্ত্ব, এক সত্তা, এক ধর্ম্মে একাকার। এখন, এহেন অবস্থায়ও, যে পার্থক্য দেখে, সে গভীর সৃষ্টি-রহস্য মোটেই বুঝে নাই।

দ্বিত্ব-বোধ, ভোজের বাজি, লীলার বুদ্‌বুদ, চক্ষের ভেল্কি, উহা কিছুই নয়, উহা কিছুই নয়। পাপ-বোধের পরও আমি পাপের পথে চিরকাল ঘুরিব, মরিব, পচিব, এ অধিকার আমার মোটেই নাই। দশ বৎসর, নয় বিশ ত্রিশ বৎসর। একজন আমার পশ্চাতে লাগিয়া আছেন, যিনি অনবরত আমার লাগাম টানিয়া ধরিতেছেন। সাধ্য কি আমার যে আমি ক্রমাগত মরণের পথে চলিব? আমার শোণিত অবিরত শিরায় শিরায় চলিতেছে, আমার সাধ্য নাই, রোধ করি, আমার চক্ষের পলক নিমেষে নিমেষে পড়িতেছে,আমার সাধ্য নাই থামাই, পাকস্থালীতে ভুক্ত আহারের হজম হইতেছে, সাধ্য নাই, কর্ত্তৃত্ব করি, আমার স্নায়ু সকল অবিরত বিদ্যুতের ন্যায় নানা বার্ত্তা মস্তিষ্কে বহন করিতেছে, সাধ্য নাই, আমি রোধ করি। কাহারও দুঃখ কষ্ট দেখিলে আমার কান্না পায়, বিপদ দেখিলে ভয় আসে, সাধ্য নাই আমি রোধ করি। আমি কি পারি, আমি কি বা করি? দেখিতে চাই একটা, দেখি আর একটা, করিতে চাই একটা, করিয়া বসি আর একটা। আমার বুকের ভিতরে কে যেন অনবরত কেমন একটা স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, আমি ত কিছুতেই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিলাম না। সংসার আমাকে কিনিতে চাহিল, আমি বিক্রীত হইলাম না। পাপ চিরদাসত্বে আমাকে উৎসর্গ করিতে চাহিল, আমি অনুৎসর্গই রহিলাম,—ভাই বন্ধু, স্ত্রী পুত্র, আমাকে এটা সেটা ধরাইয়া মজাইয়া রাখিতে চালিল, আমি মজিতে পারিলাম কই? কে যেন আমাকে সদা কেমন একরূপ করিতে চাহিতেছে। তোমরা, সমস্ত সংসার, চাও একরূপ করিতে, তিনি চান আর

একরূপ করিতে। আমি কি করিব বল, আমার ক্ষমতা কোথায় যে ফিরি ? আমার অসার আমিত্ব, অক্ষম স্বামিত্ব। যিনি আমাকে ধরিয়াছেন, তিনি তোমাকে তাঁহাকে কি ভুলিয়া রহিয়াছেন ? না—তাহাও অসম্ভব। তিনি তোমাকে তুমিত্বে, আমাকে আমিত্বে, তাহাকে তিনিত্বেই লইয়া যাইতেছেন। মানুষ কত কোটী বৎসর চেষ্টা করিল,দশ জনকেও মিলাইতে পারিল কি ?—একরূপ করিতে পারিল কি ? বিধানই তাহা নয়। প্রতি বৃক্ষের সহস্র পাতা সহস্র প্রকার, মানব পরিবারের কোটী সন্তান, কোটী প্রকার। প্রতি বস্তু বা জীবই বিশেষত্বে পূর্ণ, কাহাকে কে উপেক্ষা করিবে ? এইরূপ যদি না হইত, অনন্তের আভাস কেহ পাইত না। অনন্তের আভাস দিবার জন্য কে যেন এইরূপ বিধান করিতেছেন। আমি অনন্তের ছেলে, অনন্তের বিন্দু ধরিয়াই, অনন্তের আদেশে অনন্তের পথে চলিলাম, কাহারও সাধ্য হইল না, আমাকে বাঁধিয়া রাখে ? তুমি বল, এটা কর, সেটা কর ;—আমি তোমার প্রচারিত পথে যাইতে চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না,—কেন না, আমার শক্তি নাই, আমি শক্তিহারা জড়ভরত। বৃথা আমাকে তিরস্কার কেন কর ভাই ? কত চিকিৎসক এ জগতে আছে, কিন্তু প্রতিদিন কোটী কোটী লোকের দেহত্যাগ হইতেছে, কে রাখিতে পারে ? ঈশার ঘাতকের হাতে মৃত্যু, শ্রীচৈতন্যের সমুদ্রে পতন—অপরিহার্য্য ঘটনা। রাজা মরিতেছেন, প্রজা মরিতেছেন, মহাধনী মরিতেছেন, নিতান্ত দরিদ্র যে, সেও মরিতেছে। বিধান্ স্বতন্ত্র কি ? এক সূর্য্য, এক চন্দ্র সকলকে আলোক প্রদান করে, এক বায়ু সকলকে সুশীতল করে, এক জল সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করে ;—বিধান স্বতন্ত্র কি ? কেহ স্বর্ণপাত্রে, কেহ বা গণ্ডূষে জল পান করে, তৃষ্ণা নিবারণ দুয়েরই হয়। বিধান, এক ভিন্ন দুই নয়, গতি এক ভিন্ন বহু নয়,—পাত্রানুসারে আলোক ও জলকে পৃথকরূপ দেখাইলেও, তাহা একই আলো, একই জল। ভেল্কি বা ভোজের বাজি দেখিয়া যে ভোলে, বৃথা যে অহঙ্কারে ফোলে, প্রকৃতি-তত্ত্ব সে মোটেই বুঝে নাই।

মূল কথা, আমি, তুমি, তিনি—সকলেই এক স্থানে পৃথক পৃথক, আবার আর এক স্থানে একাকার। জীবনে রূপান্তর, মরণে একাকার ; অথবা সীমায় রূপান্তর, অসীমে একাকার। কত নদী হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া কত নামে পরিচিত হইল, কিন্তু যখন বঙ্গ উপসাগরে মিলিল, তখন সব একাকার। ভেদ কোথায়, বন্ধু বলত ? আমার জীবন-ইতিহাসেও

আমার কতরূপ, কত বিভিন্ন প্রকৃতি,—কখন আমি অসুর, কখনও সুর, কখনও দস্যু, কখনও দেবতা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে—যখন মরণের পথে পাপ সকল নির্ব্বাণ, ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয় বা রিপু সকল নিস্তেজ, তখন ক্রমে ক্রমে স্বামিত্ব ও আমিত্বের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আমাকে পূর্ণ রূপে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। একটী, একটী, একটী করিয়া যখন পাপ বলিদান হইতে লাগিল, তখন শত দিক হইতে শত প্রকারে পুণ্যের অভ্যুদয় হইতে লাগিল; শেষে একদিন জগত বিস্ময়ে দেখিল, "আমিত্ব" বলিয়া যে একটা দিগ্বিজয়ী অসুর ছিল, সেটা কোন্ নির্ব্বাণপুরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, সেখানে এক পুণ্যময় দেবতার লীলা প্রকটিত হইয়াছে, দেখিল, দেবাসুর সংগ্রামে এক মহাশক্তির জয় হইয়াছে। তখন বহু লোকে কেবল সেই শক্তিরই জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। হায়, আত্মপ্রশংসা ভুলিয়া কবে সব মানুষ সেই মহা শক্তির—সেই অদ্বৈত শক্তির জয় ঘোষণা করিতে রত হইবে। শক্তি কি আর আছে? এক শক্তি—পূর্ণ শক্তি—সকল, সর্ব্বস্বগ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। ভাই ভক্তির সহিত, আকাশ কাঁপাইয়া বল—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" দ্বৈতজ্ঞান কেবল ভোজের বাজি—অদ্বৈতের প্রকট লীলা মাত্র, ভাই বল, এক শক্তি, এক ধর্ম্ম, এক জ্ঞান,—বল—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

ফাল্গুন, ১৩০৭।

কুমারী ম্যানিং।

মানুষ বড় কিসে, প্রেমে না জ্ঞানে?—দয়ায় না কথায়?—সেবায় না বক্তৃতায়? শিশু মাতৃপ্রেমে প্রতিপালিত, রোগী দয়ারূপিণী শুশ্রূষায় সঞ্জীবিত, পাপে পতিত, তাপে জড়িত, দুঃখ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত, বিপদ-জালে বেষ্টিত জীব কেবল মানব-সেবায় সমুত্থিত ও সুরক্ষিত। জ্ঞান যদি হয় পিতৃশক্তি, প্রেম তবে মাতৃশক্তি। কে না জানে, মাতাই এ জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

আমরা ইংলণ্ডের অনেক গৌরব, অনেক মহত্ত্বের কথা সর্ব্বদা পাঠ করিয়া থাকি। বাহুবলে ইংলণ্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, ইহা এখন সর্ব্ববাদীসম্মত কথা। কিন্তু বাহুবল পাশব বল ভিন্ন আর কিছুই নয়। লর্ড কিচনার ষোড়শ সহস্র

দরবেশ বধ করিয়া এবং মেহেদীর মৃত শবের লাঞ্ছনা করিয়া আপন অঙ্গে যে কালিম-কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন, তাহা কেবল পাশব বলেই সম্ভব। নেপোলিয়ন ও সিরাজের প্রতি অবিচারও পাশব বলের অক্ষয় কালিমা-কীর্ত্তি। তাহাতেই যদি ইংলণ্ড বড় হইত, বিধাতার বিধানে আমরা আজ ইংরাজ জাতির পদানত হইতাম না। ভারত সাম্রাজ্যও ইংলণ্ডের হইত কি না, সন্দেহ। ইংলণ্ডের প্রেমের দুর্জ্জয় শক্তিতে এই ধরা অনুপ্রাণিত, তাই আমরা ইংরাজের পদানত। যদি পাশব বলে ইংলণ্ডের সহস্র লোক মাতোয়ারা, প্রেমের বলে মাতোয়ারা লক্ষ লোক। পৃথিবী ব্যাপিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারের জন্য যে সকল নরনারী সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়া অম্লান চিত্তে দেহ বিসর্জ্জন, সুখ বিসর্জ্জন দিতেছেন, তাঁহাদের প্রেমে জগৎ ক্রীত। কি অমানুষী শক্তি, কি মোহকরী বিদ্যা, কি দুর্জ্জয় প্রভাব। জগতের যাহা জয় হয় নাই, কালে, বিলাসে এই প্রেমের বিনাশ না হইলে তাহাও বিজিত হইবে। ধন্য ইংলণ্ড।

আমরা এই ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের নব বর্ষারম্ভে এক পুণ্যবতী মহিলার কথা নানা সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছিলাম। ঐ সময়ে তিনি এই ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি কে, পাঠকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে কি? তিনি কুমারী ম্যানিং। কুমারী কলেট, কুমারী মেরি কার্পেণ্টারের উপযুক্তা শিষ্যা কুমারী ম্যানিং। ভারতবর্ষ কুমারী ম্যানিংয়ের পদধূলিতে ধন্য হইয়াছে।

কুমারী ম্যানিং কে, পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। মুলারের নাম পাঠক শুনিয়াছেন, বুথের নাম শুনিয়াছেন, ম্যানিং আবার কে? এই সকল ব্যক্তিরই কীর্ত্তি আছে, কীর্ত্তিকাহিনী আছে। কুমারী ম্যানিংয়ের কীর্ত্তিও নাই, কীর্ত্তি-কাহিনীও নাই। আমরা তাঁহার জীবন-কাহিনী জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। তিনি তাহা জানাইতে চাহেন না। তিনি সঙ্কোচ ও লজ্জার আবরণে সব ঢাকিয়া সকলের পশ্চাতে বসিতে, সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইতে চাহেন। তিনি গোপনে থাকিতেই ভালবাসেন। লোকের মুখে নিজ প্রশংসার কথা শুনিলে লজ্জায় তাঁহার বদন-মণ্ডল আরক্তিম হয়। কোন বিশেষ বন্ধুও তাঁহার জীবনের কাহিনী জানিতে পান নাই। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বন্ধুবর আনন্দ মোহনের জীবন-বিবরণ পাইতে এবং লিখিতে পারেন, কিন্তু কুমারী ম্যানিংয়ের কাহিনী অকৃত্রিম ম্যানিং-বন্ধু বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও পান নাই। বহুকাগজেই তাঁহার আগমনবার্ত্তা সানন্দে, কৃতজ্ঞতার সহিত ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু জীবনের

কথা কেহই লিখিতে পারেন নাই। কুমারী ম্যানিং পাগলা কানাইর এই বাক্যের যোগ্য—

"চোক মেলিলে আঁধার দেখি, চোক বুজিলে সলক হয়।"

অথবা—ম্যানিং বাহিরে মৃতা, ভিতরে জীবিতা। ইহা প্রেম, ইহা দয়া, ইহা সেবা। প্রেম, দয়া এবং সেবার বাহ্য মূর্ত্তি কেহ কখনও দেখিয়াছে কি? বিদ্যাসাগরকে রাস্তায় দেখিয়া কেহ বুঝিত কি যে, বিদ্যাসাগর যাইতেছেন। ম্যানিং পাশ্চাত্য-জগতের দয়ার অবতার বিদ্যাসাগর।

এদেশের নিরাশ্রয় বিধবাদিগের জন্য একদিন মহাত্মা বিদ্যাসাগরের হৃদয় কাঁদিয়াছিল। বিধবা-ভবন, বিধবা-পোষণ, বিধবার উদ্ধার, বিধবার শিক্ষা—বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান কাজ ছিল। এখন অনেকে প্রকৃত মহত্ত্বের কথা বাদ দিয়া বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। হ্যামলেটকে বাদ দিয়া হ্যামলেট অভিনয় যেমন, ইহাও তেমনি। বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব, মহত্ব, সজীবতা কোথায়? যখন তিনি বিধবার জন্য অশ্রু ফেলিতেছেন এবং বিধবার কষ্ট দূর করিবার জন্য যশ, মান, ধন সম্পত্তি—সব অম্লান চিত্তে বিসর্জ্জন দিয়া সকলের ঘৃণা, তিরস্কার এবং লাঞ্ছনা মস্তক পাতিয়া লইতেছেন, তখনই বিদ্যাসাগরকে আমরা দেখি। এই বঙ্গ প্রদেশে মূক ও বধিরবিদ্যালয়ের জন্য অনেক টাকা উঠিতেছে, অনাথাশ্রমের জন্যও অনেক অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। ভাল কথা, সুখের চিত্র। কিন্তু বিধবাদের—অনাথা, পরিত্যক্তা, নির্য্যিতা, ঘৃণিতা, অস্পৃশ্যাদের জন্য কে ব্যথিত-হৃদয় হইয়াছিলেন? এই বঙ্গে কার হৃদয় কাঁদিয়াছিল? এক এক বিদ্যাসাগর ভিন্ন আর কেহই নহেন। আজ তিনি স্বর্গে। বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"কোন সৎকার্য্যেই লোকের উৎসাহ পাইবার আশা নাই। বরং তিরস্কার, ঘৃণা, বিদ্বেষ বোঝায় বোঝায় পাইবেন। আমি বিধবাদের বাড়ীতে বাসি বলিয়া লোকেরা আমার চরিত্রে দোষ দিতেও ছাড়ে নাই।"

সময়ে সময়ে আমাদের এমনই ইচ্ছা হয়, থাকে ত এই সব লোকই থাকুক না কেন, বাঁচে ত এই সব লোকই বাঁচুক না কেন। কথা, বক্তৃতা সব নিবিয়া যা'ক, সব বাহ্যাড়ম্বর বিসর্জ্জিত হউক—এই ধরায় বাঁচিয়া থাকুক, কেবল দয়া, কেবল প্রেম, কেবল সেবা। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে কি? বড়মানুষের বাহাদুরী, আস্ফালন, আড়ম্বর গিস্ গিস্ করি-

তেছে,—প্রেম-দয়া-পাদপের সুশীতল ছায়া কোথায় পাইবে? দরিদ্রের উপেক্ষা, দরিদ্রের নির্যাতন, দরিদ্রের ভর্ৎসনা—চতুর্দ্দিকে; অনাহারে লোক মরিতেছে ত লক্ষ লক্ষ মরিতেছে, অশিক্ষায় ডুবিতেছে ত লক্ষ লক্ষ লোক ডুবিতেছে, কুজ্ঞান কুসংস্কারে মজিতেছে ত লক্ষ লক্ষ লোক মজিতেছে। কে ধরে, কে তুলে, কে বাঁচায়? এ ধরা শ্মশান,—এ পৃথিবী নির্ম্মমতার মহা মরুভূমি।।

এই বিশাল মরুভূমিতে কুমারী ম্যানিং-প্রমুখ মহিলা এবং ব্যক্তিগণ একমাত্র শান্তির ওয়েসিস। ইঁহাদের পুণ্যের কথা স্মরণে পাষাণ ফাটিয়া জল পড়ে। আমরা অধম, আমাদের প্রাণও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। মানুষ নিজের সুখের জন্য সদা লালায়িত, ইঁহারা নিজের সুখ কি, জানেন না, বুঝেন না। কিসে জগতের কল্যাণ হইবে, লোকের মঙ্গল হইবে, এই ভাবনাতেই সদা ইঁহারা বিভোর। ম্যানিং জাতীয় ভারত-সভার সম্পাদিকা, ভারতের মহিলাগণের উন্নতি ও শিক্ষা এই সভার বিশেষ লক্ষ্য। ইংলণ্ড এবং ভারতের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয়, তাহাই প্রধান কাজ। ম্যানিং সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মিয়াছেন, বিবাহ করেন নাই,—এখন বৃদ্ধা, আজীবন পর-সেবা ব্রতে দীক্ষিতা হইয়া খাটিয়াছেন। খাটিয়া খাটিয়া এখন জীবন-সন্ধ্যায় উপনীতা। এই পুণ্যবতী মহিলা, জীবন-সন্ধ্যায় ভারতে পদার্পণ করিয়া ভারতভূমিকে পবিত্র করিয়াছেন। তাঁহার দয়াব্রতে, প্রেম-ব্রতে ভারতের নরনারী দীক্ষিত হইলে ভারত ধন্য হইবে, পুণ্যভূমিতে পরিণত হইবে। কিন্তু তাহা কি কখনও হইবে।।

চৈত্র, ১৩০৫।

ভারতের দুর্ভিক্ষ-সমস্যায় জাতীয় মহাসমিতি।

অনুরাগী দলের আনন্দ-হিল্লোল এবং বিরাগীদলের নিন্দা-প্লাবন মস্তকে বহন করিয়া, এবার কলিকাতা নগরে, জাতীয় মহা-সমিতির দ্বাদশ অধিবেশনের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। আমরা পূর্ব্ব হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, এবারকার দারুণ দুর্ভিক্ষের জন্য জাতীয় মহা

সমিতির অধিবেশনের একান্ত প্রয়োজন। আশা করিয়াছিলাম, নিরন্ন, ক্ষুধা-কাতর অসংখ্য নরনারীর রক্ষা-ব্রত গ্রহণ করিয়া মহাসমিতি সর্ব্বসাধারণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইবেন। মনে করিয়াছিলাম, এই মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জাতীয় মহাসমিতি স্বীয় অস্তিত্ব-প্রতিষ্ঠার সুন্দর, অক্ষয়, অটল কাবণ-ব্যূহ রচনা করিবেন। কিন্তু বুঝিয়াছি, সকল আশা বৃথা। এখন বুঝিতেছি, দরিদ্রগণের প্রোথিত অস্থি-স্তূপের উপর, বাহ্যাড়ম্বর, কথা, উপদেশ ও বক্তৃতা রূপ অক্ষয় ভিত্তিতে মহা সভা এদেশে দাঁড়াইয়া থাকিবে! অহো দুর্ভাগ্য!

আমরা জাতীয় মহা সমিতির অকৃত্রিম বন্ধু। বন্ধুর নিকটও মানুষ মত-বিরুদ্ধ উপদেশ শুনিতে চাহে না। কোন কথার প্রতিবাদ করিলেই মানুষ শত্রু বলিয়া মনে করে। পূর্ব্বে জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধে কয়েকবার আমরা কিছু লিখিয়াছিলাম বলিয়া নিন্দিত এবং তিরস্কৃত হইয়াছিলাম। অনেকে আমাদিগকে জাতীয় মহা সমিতির শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তা করুন। এই ভারতের উন্নতির জন্য যিনি যে কোন সৎকাজে ব্রতী, তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র। সকল সৎকাজের সহিতই আমাদের প্রাণের যোগ। দূরে থাকি, আর কাছে থাকি—সকল কাজের সাফল্যের জন্যই বিধাতার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাকি। কিন্তু কি জানি কেন, কাজের পরিবর্ত্তে বৃথা জল্পনা, হিতৈষণার নামে প্রতারণা, ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামী দেখিলেই আমাদের প্রাণ অস্থির হয়। এই মহা সভার মহা আনন্দের ব্যাপার দেখিয়া কত লোকের নাকি উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এই হতভাগ্য আমাদের কেবল অশ্রুপতন হয়। এবার পীড়ার নিদারুণ কষাঘাতে প্রথম তিন দিন সভায় যাইতে শক্তি ছিল না। চতুর্থ দিনে যাইতে পারিয়াছিলাম। যখন এক একজন প্রবীণ বক্তার মঞ্চ-আরোহণের সময় "হিপ্ হিপ্ হুররে" রবে চতুর্দ্দিক আন্দোলিত হইতেছিল, তখন কি জানি কেন, আমাদের কেবলই দীর্ঘনিঃশ্বাস নির্গত এবং অশ্রুপতন হইতেছিল। অনেকক্ষণ, স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, ভারতের প্রবীণ ব্যক্তিগণ মিলিয়া যাহাকে মহাসভা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা যেন অস্থায়ী বক্তৃতাব উচ্ছ্বাস তরঙ্গ মাত্র। বুঝিলাম, মহা ব্যাপার নয়, যেন মহা ছেলেমী। বাঙ্গালীদিগকে বম্বের পার্সী সম্প্রদায় কথা-সর্ব্বস্ব জাতি• বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীর

অনুকরণে ভারতের কর্ম্মদক্ষ অন্যান্য জাতি সমূহও কি বাক্যবাগীশ হইয়া উঠিবে ?

একটী গল্প শুনিয়াছি। এক বন্ধুর একটী ছোট ছেলে একদিন প্রাঙ্গণে কতকগুলি বালি স্তূপাকার করিয়া তদুপরি একটী ঝাঁটার কাটী পুতিয়া বাড়ীর সকল লোককে ডাকিয়া বলিয়াছিল—"দ্যাখ এসে আমি কি করেছি"। এই অদ্ভুত ব্যাপার মানুষকে না দেখাইলেই নয়। বাড়ীর লোকেরা বালকের এই ক্রীড়া দেখিয়া হাসিয়া আকুল। জাতীয় মহা সমিতির এই কথা-সর্ব্বস্ব-ব্যাপারটাতেও আমাদের মনে সেইরূপই ভাব উদিত হয়। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা কোন কাজ করিবে না, কেবল উপদেশ দিবে। জলে ডুবিয়া লোক মরিতেছে দেখিলে বিদেশে লোক আনিতে সংবাদ পাঠাইবে। আগুনে বাড়ী পুড়িয়া যাইতেছে যখন, তখন কমিটী ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসিবে। এবার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে মহাসমিতির ঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতা এবং উপদেশ পড়িয়া আমাদের এই সকল কথাই মনে হইতেছে। মহা অপদার্থতার মহা মেলা—হৃদয়হীন হুজুগপ্রিয় লোকের মহা হুজুগ—সম্মান প্রত্যাশী লোকের স্বার্থ জাল-বিস্তার। হা ভগবান, এ দেশের উদ্ধার তুমি এমন সকল লোকের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছ।।

মহা সমিতিতে এবার প্রতিনিধি বড় অল্প উপস্থিত ছিলেন—বড় জোর ৮০০। এজন্য কেহ কেহ টিটকারী দিতেছেন। ইহাতে শক্তি-লঘুতার পরিচয় নাই। ৮০০ লোকের মধ্যে শতটী লোকও যদি প্রকৃত হৃদয়বান, চরিত্র-বান, স্বার্থ-হীন দেশ-হিতৈষী থাকেন, তাঁহাদের শক্তি অপরিমেয়। একা ম্যাট্‌সিনি যদি একটা দেশ স্বাধীন করিতে পারে, শত অযোধ্যানাথ কি তাহা পারেন না ? অবশ্যই পারেন। কিন্তু অযোধ্যানাথের ন্যায় প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী এ দেশে বড়ই বিরল। এই যা দুঃখ। সুরেন্দ্র নাথ হিতবাদীর সাহায্যে নৃত্য করেন, কি আনন্দ মোহন সঞ্জীবনীর সাহচর্য্যে উল্লাস করেন, তাহা শোভা পায়, কেননা, তাঁহারা যাহাই হউন, দেশের বড় লোকত বটেন। এক সময়ে লর্ড ক্রসের ভারত কাউন্সিল-বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকিলেও, তাঁহারা আজ কাউন্সিলে বসিয়া "মাননীয়' উপাধি পাইয়াছেন ত, তাঁহাদের পক্ষে সকলই শোভা পায়। কিন্তু তুমি, আমি, সে, যাহারা কখনও দেশের জন্য ভাবে না, যাহারা এক মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়াকে পাপ মনে করে, যাহারা আত্মীয় পোষণকে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া রূপ মহাপাপ মনে

করিয়া, একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা সর্ব্বনাশের মূল ভাবিয়া বিচ্ছিন্নতার রাজ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মহাসুখে আছে, তাহারা যদি এহেন মহারথীগণের সহিত নৃত্য বা উল্লাস করে, তবে তাহা সাজে কি? যাত্রার সং বলিয়া কি মনে হয় না? হিতৈষণার ভেক্সান-সাজ পরিলে হিতৈষণা গজাইতে পারে, কেহ কেহ বলেন। তাহা অসম্ভব। ময়ূরপুচ্ছ পরিয়া কখনও কাক ময়ূর হইতে পারে না। না—কখনও ভেক ধরিয়া, ভস্ম মাখিয়া ভণ্ড ভক্তসন্ন্যাসী হইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে অনেকের ক্রন্দন শুনিয়াছি—কি পরক্ষণেই দেখিয়াছি, যে চরিত্রহীন, সে সেইরূপ চরিত্রহীনই রহিয়াছে। কন্‌গ্রেস্ মণ্ডপ পরিত্যাগের পর অনেক প্রতিনিধিকে দেখিয়াছি, পূর্ব্বে যেরূপ সৎকাজের উপহাস-প্রিয় ছিলেন, সেইরূপ উপহাস-প্রিয়ই আছেন। এমন লোক সকল দ্বারা দেশ উদ্ধার হয় কি? তুমি ভাই আশা কর, তোমার পদধূলি দাও, মস্তকে লই। আমাদের একজন জমীদার বন্ধুকে প্রতি বৎসর প্রতিনিধি হইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছি। তিনি সহৃদয়, পরোপকারী, প্রজারঞ্জক, ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি, তিনি প্রতিবারেই বলেন—"আমি কি প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য? দেশের কথা কি ভাবি, দেশের জন্য কি করি যে, প্রতিনিধি হইব?" এবারও তাঁহাকে প্রতিনিধিরূপে সভায় উপস্থিত করিতে পারি নাই। তাঁহার এই কথাটী যখনই ভাবিয়াছি, তখনই প্রাণ ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে। ভাবিয়াছি, প্রকৃত হিতৈষণা এই খানে। কিন্তু অনেক প্রতিনিধি কিরূপ দরের লোক? কন্‌গ্রেসের বন্ধু, বুকে হাত দিয়া বলত?

এসকল কথা বলিতেছি কেন? যে ব্যক্তি যেমন, তাহার কাজও তেমনি। বাক্যবাগীশ কাজ দেখিলেই ভয় পায়। বক্তৃতা করা যার ব্যবসায়, বক্তৃতান্তে তার হিতৈষণা আর থাকিবে কেন? যে ব্যক্তি তামাসা দেখিতে, বক্তৃতা শুনিতে থিয়াটারে বা সভায় যায়, তামাসা বা বক্তৃতা অন্তে তাহাকে আর কে পাইবে? এবারকার জাতীয় সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে দুইজন বন্ধুকে বলিয়াছিলাম যে, এবার দুর্ভিক্ষের জন্য কলিকাতা, বম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান সহরে দুর্ভিক্ষ-কমিটী গঠন করিয়া মহাসমিতির দরিদ্রসেবাব্রত গ্রহণ করা উচিত। আমাদের দেশের একজন সহৃদয় ব্যক্তি কন্‌গ্রেসের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট এসংবাদ লোক দ্বারা পাঠান হইয়াছিল, তিনি হৃদয়বান ব্যক্তি, কিছু চেষ্টাও করিয়া-

ছিলেন, শুনিয়াছি, কিন্তু হইলে কি হইবে—প্রধান পাণ্ডাদের আসরে তাঁহার চেষ্টা পরাস্ত হইয়াছে। "রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত, দরিদ্রের জন্য চেষ্টা করিবে? উহা যে রাজনীতির বাহিরের কাজ!। বিলাতে টেলিগ্রাম পাঠাও, দুর্ভিক্ষের জন্য গবর্ণমেণ্টে লেখ, তার-পর মহাসুখে নিদ্রা যাও। কে এখন সুখসেব্য আহার নিদ্র পরিত্যাগ করিয়া, জীবন-সার বক্তৃতা বিসর্জ্জন দিয়া দরিদ্রের পাছে পাছে বেড়াইবে? মূর্খের চিৎকার শুনিও না, মহাশান্তিতে নিদ্রা যাও এবং মধ্যে মধ্যে জাগিয়া জাগিয়া, উঠিয়া উঠিয়া গবর্ণমেণ্টের কাজের সমালোচনা করিও এবং উলু-বেড়েতে প্রজাসভা ডাকিয়া হই-হুই রই-রই করিও।। কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রজা রক্ষা করুক, অন্নাভাবে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে, গবর্ণমেণ্টের রক্ষা করা কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্ট করুন, আমরা বক্তৃতা করি আর সুখে নিদ্রা যাই।। আমাদের নিদ্রা কেহ ভাঙ্গিও না। আমরা কংগ্রেসে যাইব না, একসময়ে অভিমান করিয়াছিলাম, দেখ কত কষ্টে সে অভিমান ত্যাগ করিয়াছি। আমাদের ন্যায় স্বার্থত্যাগী কি আর আছে। আমাদিগকে এখন বিপুল পরিশ্রমান্তে একটু বিশ্রাম করিতে দাও।" অনেকের মুখে এইরূপ কথা শুনিতেছি। এরূপ করিয়াই নাকি ভারত জাগিবে।। অহো দুর্ভাগ্য! জাতীয় মহাসমিতির মহা ধূমধামের অধিবেশনের পর ক্রমাগত ভাবিতেছি হায়, এ কি হইল? শুনিতেছি, ইতিমধ্যে নাকি দেড়লক্ষ লোক অনাহারে ভারতে মরিয়াছে। মহাসমিতি চেষ্টা করিলে দশ-সহস্র লোকের প্রাণ কি রক্ষা করিতে পারিতেন না।। অথবা কাজ করে, এমন লোক কোথায় মিলে? হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বক্তাগণ নীরব হইয়াছেন, কাজ করে কে? এখন ভাবিতেছি, যেমন সব লোক লইয়া মহাসমিতি গঠিত, তাহাদের উপযুক্ত কাজই হইয়াছে। দয়াশূন্যবীর, মায়াশূন্য বক্তা, হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর মহাসম্মিলনের মহাফল—"বিলাতে লর্ড মেয়রকে চাঁদা সংগ্রহের জন্য টেলিগ্রাম কর।" এরূপ হৃদয়হীন প্রস্তাব এখন কেবল এই ভারতবর্ষেই শোভা পায়। ইহা ঠিক কাজই হইয়াছে। যা কিছু বুঝিবার ভুল আমাদের এবং যা কিছু কপালের দোষ এই দগ্ধ দুঃখী দরিদ্রদিগের। জন সংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্যের প্রধান হেতু, এবার ভারতের ত্রিশ কোটী লোকের দশ কোটী লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করুক, আগামী বৎসর "অমরাবতীতে" তাহাদের অস্থিরাশির উপর দাঁড়াইয়া মহাসভা প্রায়শ্চিত্ত এবং স্বস্ত্যয়ন

করিবেন। সুরেন্দ্রনাথের জয় হউক, রণদের জয় হউক, তদুপরি মহাত্মা সিয়াণীর জয় জয়কারে দেশ পূর্ণ হউক, মহাসভার মহাকাজ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সকলে হরি হরি বল।

মাঘ, ১৩০৩।

পৌনঃপুনিক অভিনয়।

যে উনবিংশ শতাব্দীকে লোকেরা স্বাধীনতার শতাব্দী বলিত, সেই উনবিংশ শতাব্দী সেদিন অনন্ত কালগর্ভে, অতীতের নির্ব্বাণ-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছে। বিংশের নব দুন্দুভিধ্বনিতে পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, উনবিংশ শতাব্দী কি বাস্তবিকই স্বাধীনতার শতাব্দী ছিল ?

ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি, গারফিল্ড, থিওডোর পার্কার, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, উইলবারফোর্স, ব্রাইট এবং গ্লাডোষ্টোনের আবির্ভাব-শতাব্দী এক হিসাবে যে স্বাধীনতার শতাব্দী, সে কথা সত্য, কিন্তু অনাবিল সত্য কি না, সে সম্বন্ধে এখন গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইতালী স্বাধীনতা পাইয়াছে, দাস-প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে পৌরহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে, এবং স্ত্রীলোকেরা অধিক অধিকার পাইয়াছেন, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু এই শতাব্দীতেই মিসর সমর, ফিলিপাইন সমর, বুয়র সমর, বলিতে কি, চীনের সর্ব্বনাশ সাধনে সপ্তরথীর সমবেত চেষ্টার অভিনয় হইয়াছে, এ কথা যখন ভাবি, তখন নেপোলিয়ন বা সিজর, আলেকজান্দর বা তৈমুরকে পরিম্লান বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীকে আর স্বাধীনতার শতাব্দী বলিতে ইচ্ছা হয় না। যে শতাব্দীতে ষোড়শ সহস্র নির্দ্দোষী দরবেশ বধ করিয়াও মেহেদীর মৃত দেহের অবমাননা করিয়া কিচনার মহা সম্মান "লর্ড" উপাধিতে এবং স্বাধীনতা-লোলুপ সহস্র সহস্র লোকের শোণিতপাত করিয়া রবার্টস্ মহা গৌরবান্বিত "আরল" উপাধিতে ভূষিত হইলেন, সেটা কি আসুরিক শতাব্দী নয় ? হায়, নিরপরাধ ফিলিফাইনবাসীদিগকে অধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে সচেষ্ট ম্যাকিন্‌লি * আজ কত সম্মানে ভূষিত, এবং মানব জাতির চিরবন্ধু

* প্রবন্ধ লেখার অনেক পরে দাতাকর হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ম্লানমুখে নির্ব্বাচনমঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণের পথে নীরবে প্রস্থান করিতেছেন! জাপানকে—নবোত্থিত জাপানকে কতরূপে কতজনে প্রশংসা করে, কিন্তু হায়, এই জাপানই কি চীনের সর্ব্বনাশের মূল কারণ নয়? জাপান, প্রকারান্তরে, আজ সপ্তরথীর দ্বারা চীনের সর্ব্বনাশ সাধনের পথে যে লীলা প্রকট করিলেন, সে লীলাব যুগকে অধীনতার করাল মূর্ত্তি না বলিয়া থাকা কষ্টকর। আর হতভাগ্য বুয়রগণ যে শতাব্দীতে স্বাধীনতা হারাইয়া ধনে প্রাণে ধ্বংসের মুখে প্রবেশ করিতেছে, সে শতাব্দীর কথা ভাবিতেও কষ্ট পাই। সকল দিকেই দেখিতেছি, আভিজাত্যের, ক্ষমতা-প্রিয়তার, সাম্রাজ্য ও প্রভুত্ব বৃদ্ধির চেষ্টা। মহামতি গ্লাডোষ্টোনের চেষ্টাতেও এই শতাব্দীতে আইরিশগণ স্বায়ত্তশাসন পান নাই, ইহা ভাবিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাদৃত বিষয়ের কিছু আলোচনা করি। রাজনীতির কথা বা রাজার কথার আলোচনা করিবার অধিকার হইতে আমরা এক প্রকার বঞ্চিত। যে শতাব্দীতে ভারতে সিডিসন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সে শতাব্দীর ন্যায় স্বাধীনতা-অপলাপকারী শতাব্দী এদেশে আর হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি বিদ্যাসাগর এবং রামমোহন। একজন বিধবা-বিবাহ প্রচলন কবিতে চেষ্টা করিয়া স্ত্রী জাতির মহদুপকার সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, অন্য জন নানা উপধর্ম্ম, ত্রিত্ববাদ বা তেত্রিশকোটীবাদের স্থলে, আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ সংস্থাপনে চেষ্টা করিয়া, সর্ব্ব-প্রকার পরাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। উভয়েই, এজন্য, ঘোরতর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। উভয়েই স্ত্রী জাতির মহদুপকারের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং সতীদাহ নিবারণ এই শতাব্দীর বিশেষ ঘটনা। সর্ব্বপ্রধান ঘটনা রামমোহনের একেশ্বরবাদ প্রচার। ব্রাহ্মধর্ম্মের উত্থান যে পৃথিবীর মধ্যে এই শতাব্দীর কি মহাব্যাপার, কালে তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। সকল বিচ্ছেদ, সকল দুর্নীতি, সকল উপধর্ম্মের স্থলে—মধুর মিলন, শান্তি ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠা এই শতাব্দীতে হইয়াছে। আত্মার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা,—বিলাতে ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্ম প্রচার, ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার—এই শতাব্দীর কি সুমঙ্গল ঘটনা অন্তরে ডুবিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। এমারসন, কারলাইল, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, পার্কার,

ম্যাট্‌সিনি, সকলের হৃদয় এই মহা ধর্ম্মানুপ্রাণনে পবিত্র। আত্মা মুক্ত বায়ুর ন্যায় মুক্ত—কাহারও অধীন নয়, একমাত্র পরমাত্মার অধীন,—পরবর্ত্তীকালে মহাত্মা কেশবচন্দ্র এই ভাবতে এই কথাটী বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া সকল ধর্ম্ম, সকল শাস্ত্র, সকল তত্ত্বের সমন্বয় করিয়া জগতের মহা কল্যাণকর অতি সুন্দর ধর্ম্ম বিধান-তত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। এক ঈশ্বর, এক ধর্ম্ম, এক নীতি—এক তত্ত্ব—সকল মানব এক পিতার সন্তান, সকল পরিবার এক,—ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ—সকলেই ভাই ভাই। বিচ্ছেদ নাই, কেবল মিলন, বিদ্বেষ নাই, কেবল শান্তি, পাপ সন্তাপ নাই, কেবল পবিত্রতা। কি সুন্দর এবং কি পবিত্র তত্ত্ব। দল থাকিবে না—সকল দল ভাঙ্গিয়া একাকার হইবে—মহানের সিংহাসন তলে সকল জাতিত্ব, সকল বৈষম্য, সকল ভেদ-বোধ তিরোহিত—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সম আসনে সমভাবে উপবিষ্ট হইবে। এই মধুর সংবাদ পাইয়া জগৎ নাচিয়া উঠিল। কত কি বিচিত্র লীলা প্রকটিত হইল, ভাবিতে এবং লিখিতেও শরীর মন পুলকে পূর্ণ হয়। কিন্তু কালের কি দুর্জ্জয় প্রভাব! বিদ্যাসাগরের স্বর্গারোহণের পর হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের কথা দিন দিন ঘৃণার বিষয় হইতেছে,—বিধবা বিবাহের কথা বাদ দিয়া লোকেরা বিদ্যাসাগর মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর!! আর ৬০।৭০ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে, রূপান্তরে দলাদলি, জাতিভেদ, ধনী দরিদ্র-ভেদ ইত্যাদি কত কি দেখা যাইতেছে। যত দিন যাইতেছে, ততই ব্রাহ্মসমাজ ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। কোন দল ধর্ম্মকে পোষাকরূপে ব্যবহার করিতে চাহেন, কোন দল ধর্ম্মকেই সার করিতে চাহেন। কোন দল, বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর, কোন দল উশৃঙ্খলতার পথে স্বাধীনভাবে চলিতে সচেষ্ট। সে সকল মর্ম্মভেদী কথার বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, তবে কেবল এই মাত্র বক্তব্য—একতা ও মিলনের ধর্ম্মে যে মহা বিচ্ছেদের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, এ কথা এখন আর কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

মিলন ও একতার আর এক মধুর বাণী শুনাইয়াছিলেন, মহাত্মা হিউম। জাতীয় মহাসমিতি ভারতের মিলনের অতি পবিত্র ক্ষেত্র। কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এখানেও, অতি অল্প কালের মধ্যেই দলাদলি ও বিদ্বেষবহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছে।

এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজ আত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া কি স্বর্গীয় তেজেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। গুরু মানি না, নেতা মানি না, পুরোহিত

মানি না, উপধর্ম্ম মানি না, জাতিভেদ মানি না,—কেবল মানি বিধাতাকে,—তাঁহার সন্তান সব মানুষ ভাই ভাই,—ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, বিধাতার চরণ-সিংহাসন-তলে সকলে ভাই ভাই। কি সুন্দর বাণী! স্বর্গ যেন এই ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অভেদ-সিংহাসন-তলে শত শত নরনারীর মধুর সম্মিলন—কি মধুর চিত্র! কিন্তু হায়, ক্ষমতাপ্রিয়তা, আভিজাত্য, পৌরোহিত্য, ধনের গরিমা কি সংসারকে স্বর্গে পরিণত হইতে দিবে? দরিদ্রকে সদ্ভাবের মালা উপহার দিয়া একতা ও সাম্যের সিংহাসনতলে বসাইয়া স্বর্গের মহিমা-গীতি কি গাইতে দিবে? না—তাহা সুদূর-পরাহত।

ব্রাহ্মসমাজ, সমাজ-সংস্কারের মেরুদণ্ড। আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়া শেষে নূতন ঐশ্বর্য্যের ভিত্তিতে প্রোথিত জাতিত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হইতেছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নূতন পৌরোহিত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছেন,—পৌত্তলিক অনুষ্ঠান ও পূজা প্রণালীর জাল ছিন্ন করিয়া নানারূপ নব নব অনুষ্ঠান ও পূজা প্রণালীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা, বিবাহ-সমস্যা। হিন্দু সমাজ যে কন্যাপণে অবসন্ন, ব্রাহ্মসমাজ সেই কন্যাপণের হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার করিবেন, আশা ছিল। কিন্তু হায়, অল্পে অল্পে, জাতিভেদের সঙ্গে সঙ্গে, কন্যাপণও, রূপান্তরে, প্রকারান্তরে, এই সমাজে দেখা দিতেছে। পূর্ব্বে কাহাকে কাহাকে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে দেখিতাম, এখন ক্রমে ক্রমে প্রতিবাদও লোপ পাইতেছে। পূর্ব্বে বংশগত মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি ছিল, এখন ধনগত মর্য্যাদার দিকে অধিক আকর্ষণ দেখা যাইতেছে। চরিত্র তুচ্ছ, ধর্ম্ম তুচ্ছ, নীতি তুচ্ছ, পবিত্রতা তুচ্ছ—সার বস্তু ঐশ্বর্য্য এবং অর্থ। পদ ও ঐশ্বর্য্যের খাতিরে বিশিষ্ট ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণও, যাহারা ধর্ম্ম বা নীতির কোন ধার ধারে না, তাহাদিগের হস্তে কন্যার্পণ করিতেছেন, এবং অন্য দিকে যে ছেলেরা ধার্ম্মিক, তাঁহারাও পদ ও ঐশ্বর্য্যের খাতিরে সুযোগ্যা পাত্রী উপেক্ষা করিয়া অযোগ্যা গ্রহণ করিতেছেন। চরিত্রের বিশুদ্ধি এবং ধর্ম্মানুরাগ এখন আর যেন তেমন গুণের মধ্যে ধর্ত্তব্য নয়, পদ হইলেই হইল। ঐশ্বর্য্যের ভেল্কিতে চতুর্দ্দিকের লোক আকৃষ্ট। দেখিতেছি, এইরূপে, অনেক ব্যক্তিই, এখন, কালের দুর্জ্জয় পরাক্রমে আত্ম সমর্পণ করিতেছেন। বড় বড় মহারথী আকর্ষণ করিতেছেন, অসহায় ব্যক্তিগণ আকৃষ্ট হইতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে 'বিবাহিত, অনেক

বিলাত-প্রত্যাগতের গৃহ ধর্ম্মানুষ্ঠান-বর্জ্জিত—ব্রাহ্মসমাজের সহিত যেন কোন সংশ্রবই নাই। এ সকল বিষয় প্রতি ধার্ম্মিক ব্যক্তির গভীর চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। কারণ, ধর্ম্ম না থাকিলে মানুষ পশুত্বে উপনীত হইবে;—ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা রূপ মহা অধীনতাব মহানীশা আরম্ভ হইবে।

আর একটী সমস্যা—ধনী দরিদ্র সমস্যা। সম্ভ্রান্ত বংশের একজন দরিদ্র ব্যক্তি একজন ধনী ব্রাহ্মের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। দৈব দুর্ব্বিপাকে তাঁহার কাশীর উদ্বেগ হইলে তিনি ধনীর গৃহে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তি উঠিয়া গেলে, ধনী অন্যের সমক্ষেই অকথ্য ভাষায় ঘৃণা বর্ষণ করিলেন। আর একদিন, আব একজন সম্ভ্রান্ত দরিদ্র ব্যক্তি জুতা পায়ে দিয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ কবিয়াছিলেন বলিয়া, রাস্তার জুতা ঘরে নিবার জন্য তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। এইরূপ ঘৃণার দৃষ্টান্তেব কথা পূর্ব্বে অনেক শোনা যাইত। লাটভবনে জুতার অসম্মানেব কথা বিদ্রূপ গল্পের মোহিনী ভাষায় এখন ঘোষিত হইয়া থাকে। এখনও বড বড রাজা রাজড়াব ঘরে এরূপ অসম্মানের কথা শুনা গিয়া থাকে। কিন্তু সাম্যের ক্ষেত্র ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এরূপ হইতেছে, ইহা বডই দুঃখের কথা। এই জন্যই বুঝিবা, ব্রহ্মমন্দিরের মধ্যে রেল-চিহ্নিত বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপবেশন করেন। ফরাসিদেশে, বর্ত্তমান যুগে, ব্যাসিলাস্ থিওরির প্রাবল্যে কত যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য লীলাব অভিনয় হইতেছে, শুনিলে হাঁসি পায়। কিছু দিন পূর্ব্বে ইলেকট্রিসিটির সংস্পর্শের কথা তর্কচূডামণির বক্তৃতায় বিশেষ রূপ শুনা যাইত। দরিদ্রের মলিন বস্ত্র বা জুতার সংস্পর্শে কি ব্যাসিলাস বা কি ইলেকট্রিসিটি দেহে প্রবেশ করিবে, এই ভয়েই কি বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিগণ সতর্ক হইতেছেন? অথবা আভিজাত্য এবং ধন-গৌরবের মত্ততায় তাঁহারা উন্মত্ত হইতেছেন, আমরা ভাবিয়া ঠিক পাইতেছি না। দরিদ্রের প্রতি এইরূপ ঘৃণা ও উপেক্ষা সমাজে বদ্ধমূল হইলে, সমাজের মঙ্গল নাই। এক দিন একজন ব্রাহ্ম সিবিল সার্জ্জন বলিয়াছিলেন, "একথা এখন প্রকাশ্য ভাবে বলিতেও সঙ্কোচের কোন কারণ নাই যে, ব্রাহ্মসমাজ উচ্চ এবং নীচ—দুই বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে।" আর একদিন কয়েকজন সুশিক্ষিত চরিত্রবান উপাধিধারী যুবক বলিতেছিলেন—"বিলাত-প্রত্যাগতদিগের এক শ্রেণীর মধ্যে মদ্যপান অল্পে অল্পে প্রবেশ করিতেছে, ইহাতে আশ্চর্য্য হন কেন? ধর্ম্ম ও নীতি কি সকলেই মানিয়া চলিবে?"

এই সকল কথা সত্য হইলে, ইহা অতি শোচনীয় অবস্থা। হিন্দু সমাজের যে সকল দুর্নীতিকে এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজ বর্জ্জন করিয়াছিলেন, আভিজাত্যের প্রভাবে এখন ক্রমে ক্রমে সেই সকল দুর্নীতি কি অল্পে অল্পে এই সমাজে প্রবেশ করিবে? এবং অর্থের মোহিনী শক্তি মন্ত্রে, ঔষধ মুগ্ধ অহির ন্যায়, দরিদ্র প্রতিবাদকারীদিগকে স্তব্ধ করিয়া যা-তাব অভিনয় চলিবে। বড় বড় ধার্ম্মিক নাকি এখন দশ বিশ টাকার খাতিরে, মদ্যপান চলিতেছে বা কল্লাপণ প্রশ্রয় পাইতেছে দেখিয়াও, নির্ব্বাক থাকেন। যদি তাহা সত্য হয়, তবে আর আশা কোথায়?

পৌরোহিত্যের সমস্যা দিন দিন আরো কঠিন হইয়া উঠিতেছে। এখন অনেক স্থলে উপাসনার প্রারম্ভে শুনা যাইয়া থাকে, উপাসনা করিবেন কে? এ সমাজের লোকেরা ও সমাজের লোকের নাম শুনিলে ভ্রুকুঞ্চিত করেন, ও সমাজের লোকেরা এ সমাজের লোকের নাম শুনিলে বিরক্ত হন? ঈশ্বরের উপাসনা যেভক্তই করুন, তাহাতেই যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য নয় কি? ভক্ত মাত্রই আদরের পাত্র নন কি? ইনি বেদিতে বসিবেন, কি তিনি বসিবেন, সে সংবাদে প্রয়োজন কি? ইহা ত আর বক্তৃতা বা প্রবন্ধ নয় যে, ক্ষমতা অনু-সারে বিচার চলিবে? প্রকৃত সরল উপাসনা যিনিই করুন, তাহাতেই প্রকৃত উপাসকের মন আকৃষ্ট হওয়া উচিত। তুমি ভাল কি তিনি ভাল, সে বিচার করিতে বসিলে, বিসপ বা পোপ বা গুরু পুরোহিত মানার আর বাকী রহিল কি? একজন মহাত্মা এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "যদি গাড়ীর নীচেই পড়িতে হয়, তবে ছ্যাকড়া গাড়ীর নীচে পড়িব কেন, চেরিয়টের নীচেই পড়িব। অবতার বা গুরু পুরোহিত মানিতে হইলে যাকে তাকে মানিব কেন, অতি পূজ্য খ্রীষ্টকেই ধরিব।" চতুর্দ্দিকে নানা গুরু পুরোহিতের অভ্যুদয়ে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। একটু ভক্তির পথে যিনি অগ্রসর হন, তাঁহারই একটা কিছু হইয়া পড়িতে ইচ্ছা। এইরূপে পূজ্য বিজয়কৃষ্ণ গেলেন, রামকুমার গেলেন, শিবনারায়ণ গেলেন, ভিতরে ভিতরে আরো কত জন কিছু একটা হইবার চেষ্টায় আছেন। কতক লোক কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা করিবে, অন্য লোক সাংসারিক কাজ করিবে, এরূপ হইলে পৌরোহিত্য এবং সমাজে পশুত্ব না জাগিয়াই পারে না। ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধন ভিন্ন সমাজের মঙ্গল নাই;— এবং আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ ভিন্ন পশুত্ব বিনাশের আর উপায় নাই।

আশা করা বৃথা। পৃথিবীর গতি অবিরাম প্রভুত্বপরায়ণতা এবং আভিজাত্যের দিকেই চলিয়াছে। বৃথা ক্রন্দন, বৃথা আন্দোলন, বৃথা চীৎকার। কালের ধর্ম্মই যেন এই—ঐশ্বর্য্য এবং অর্থবল, প্রভুত্ব এবং শারীর বল সকলকে পরাজয় করিয়া প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেই করিবে। ধর্ম্মকথা—পোষাক পরিচ্ছদের ন্যায় একটা রাখিতে হয়, তাই রাখা, মর্ম্মস্পর্শী অভেদবাদের কথা, বা অনাবিল স্বাধীনতার কথা বলিতে চেষ্টা করাই বুঝি বা ভ্রান্তি ॥ ভাই, তুমি বল কি?

বলিবার কথা অনেক, কিন্তু বলিবার স্থান নাই, অধিকার নাই। বলিতে ইচ্ছাও হয় না। এখন একাকীত্বের গহন বনে যাইতে ইচ্ছা। সত্য কথা বলিলে, রাজ আইন ভ্রুকুটী দেখায়, সমাজের বিধি ব্যবস্থা ভয় দেখায়, বন্ধুদের ভালবাসা বিরক্তিতে পরিণত হয়। তাহাদের মতে মত দিয়া, প্রশংসায় প্রশংসা ঢালিয়া, মদ্যপায়ীর মদ্যপান, অত্যাচারীর অত্যাচার এবং ব্যভিচারীর ব্যভিচারের পোষকতা করিতে পারিলেই লাভ আছে, সম্মান আছে, প্রশংসা আছে। তাহাতে উপাধি মিলে, সমাজের উপরকার দশজনের সঙ্গে এক আসনে স্থান পাওয়া যায়—আর শুনিয়াছি, টাকাও নাকি অনেক মিলে। আর স্বাধীন ভাবে সত্য ঘোষণা করিলে হয় জেল, নয় নিষ্পেষণ, নয় বন্ধুবিচ্ছেদ, নয় কদর্য্য গুপ্ত-নিন্দা, অপরিহার্য্য অদৃষ্ট লিখন। কাগজ চালান, এদেশে খোসামুদীর একটী ব্যবসা হইয়া উঠিতেছে। এরূপ অবস্থায়, এরূপ সময়ে, শত শতাব্দীর সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে কে অগ্রসর হইবে? অগ্রসর হইলেই বা শুনিবে কে? কঠোর এবং সত্য শ্রবণে, হায়, অনেকেই আজ কাল অনিচ্ছুক।

আমি ভাবিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম এবং প্রার্থনা করিতেছিলাম, এ ধরার অত্যাচার এবং অবিচার, অসত্য এবং অধর্ম্ম নিত্যই যখন নূতন ভাবে পুনরভিনীত হইতেছে, তখন এ সকল দেখিতে আর বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ কি? বয়স বাড়িতেছে, কিন্তু জ্ঞান বাড়ে না, মস্তকের কাল কেশ শ্বেত হইল, কিন্তু ভক্তিতে নত হয় না, দাঁত পড়ে, মাংস শিথিল হয়, কিন্তু আসক্তি কমে না, বিশ্বপ্রেমের উদয় হয় না, রিপুর নিষ্পেষণ দূর হয় না,—পাপের বন্ধন ছিন্ন হয় না,—মহাপরাধীনতার রাজ্য যেন চির অসমাপ্ত। হাটিয়া হাটিয়া কতদূর আসিলাম—কিন্তু কেবলই পরাধীনতা! রাজা বলেন, তুমি আমার আইনের অধীন, ধনী বলেন, তুমি আমার

ক্ষমতার অধীন, সমাজ বলেন, তুমি আমার বিধির অধীন, পরিবার বলেন, তুমি আমার ভালবাসার অধীন, আমার রিপুরা বলে, তুমি আমাদের শাসনের অধীন। মুক্ত হইতে না পারিলে, সকল আসক্তির জাল কাটিতে না পারিলে, অতীন্দ্রিয়, অকথিত, অদৃষ্ট পরমাত্মার পথে চলিব কিরূপে? হাটিয়া হাটিয়া, খাটিয়া খাটিয়া পরিশ্রান্ত, পরিম্লান হইলাম, কিন্তু অধীনতার রাজ্য শেষ হইল না—যেন চির অসমাপ্ত। আমার চক্ষু কেবল কুদৃষ্টিপাতই করে, লেখনী কেবল কুকথাই লেখে, হাত কেবল কুকার্য্যেই রত থাকে, পা কেবল কুপথেই চলিতে চায়। কু-য়ের রাজ্য যেন চির অসমাপ্ত। মহাপরাধীনতার মহান্ধকারে ডুবিয়াছি, যাই কোথা? আলো কই? একাকীত্বের গহন বনে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ কই? পাপ মোহের ত্রাসে প্রাণ-মন মলিন ও নিষ্প্রভ। আমি করি কি, যাই কোথা। জীবন শেষ হইয়াও হয় না কেন? যদি "সু"য়ের রাজ্যে পৌঁছিতে পারিতাম, তবে বুঝি বা আমার দাসত্ব ঘুচিত—আমি মুক্ত হইতে পারিতাম। "সু"য়ের প্রতিষ্ঠার জন্য কত চেষ্টা, কত আয়োজন করিলাম, কিন্তু তিনি ত ফিরিয়াও এ দীনের প্রতি চাহিলেন না। যদি বা কখনও চাহিলেন, আমাকে ধরিলেন না, যদি বা ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া এই অস্পৃশ্যকে ধরিলেন, আমাকে মজাইলেন না,—যদি বা কখনও একটু একটু মজাইলেন, আমাকে একেবারে বিশ্ব-প্রেমসাগরে ডুবাইলেন না। যদি ডুবাইতেন, তবে বুঝিবা "কু"য়ের অসমাপ্ত রাজ্যে আমাকে আর আসিতে হইত না। বুঝি বা, আমাকে চাপিতে চাপিতে, আমার আমিত্বকে নিষ্পেষিত করিয়া "তিনিত্বে"র অপরাজিত সিংহাসন চির প্রতিষ্ঠিত করিতেন। আমিত্বের বিনাশ না হইলে অধীনতার অসমাপ্ত রাজ্য হইতে চিরবিদায় লাভের আর উপায় নাই, সেই জন্য "সু"মহানের নিকট নিত্য প্রার্থনা, বয়স যেমন আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, তিনিও যেন সেইরূপ আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে করিতে, আমাকে চাপিতে চাপিতে—আমিত্বের বিনাশ সাধন করিয়া তিনিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ভবের নিত্য অবিচার ও অত্যাচারময় অধীনতার অসমাপ্ত রাজ্য হইতে নচেৎ আর উদ্ধারের উপায় নাই। হায়, তিনি কি এ দীনকে কৃপা করিবেন না?

মাঘ, ১৩০৭।

আসা ও যাওয়ার পথ।

"Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return Thither"
Bible

অনন্তের মধ্যে দুটী বিন্দু—আসা এবং যাওয়ার দিন,—সময়-সাগরের দুটী তরঙ্গ—জন্ম এবং মৃত্যু। আমিত্বময় ভবসংসারে উত্থান পতনের জটিল প্রহেলিকা,—জীবনবিজ্ঞানের সার সত্য—নীরস, কঠোর, কর্কশ। অকূলে কূল, অথবা কূলে অকূল। জানিলেও যেন অজ্ঞাত, ভাবিলেও যেন অচিন্ত্য। বুঝি না, জানি না, এই দুটী কথাই যেন মানব-ললাটের দেব-দত্ত রাজটিকা।

একদিন প্রত্যূষে অকূল সাগর-তটে দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয় দেখিতেছিলাম,—আর এক দিন গোধূলিতে সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছিলাম। মহা উষার প্রদীপ্ত কিরণমালা ছুটিতে ছুটিতে একের আগমন-বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত করিতেছিল, মহা প্রদোষের নির্ব্বাণ-নিমগ্নোমুখ কিরণমালা যাইতে যাইতে অন্যের কি যেন শেষ কাহিনী গাহিতেছিল। উভয়ই অস্পষ্ট, অব্যক্ত, স্নিগ্ধ, মধুর, কোমল। সুন্দরত উভয়ই অতি সুন্দর। দেখিয়া দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলাম, কিন্তু তত্ত্ব বুঝিয়াছিলাম অতি অল্পই।

মাতৃ-অঙ্কে নবজাত শিশুর মধুর এবং কোমল হাসি দেখিয়াছি, মায়ের হাসিতে হাসি মিশাইয়া কতই হাসিয়াছি। শ্মশানের চুলিতে সেই শিশুকে সময়ান্তে তুলিয়া দিয়া মাতা গভীর ক্রন্দন রোলে গগন পূর্ণ করিতেছেন, তাহাও দেখিয়াছি এবং তপ্ত অশ্রুকণায় অশ্রু মিশাইয়া কত কাঁদিয়াছি। হাসি এবং কান্না উভয়ই আকাশের বায়ু গ্রাস করিয়াছে, পৃথিবীর কোনই উপকার হয় নাই। ইহাকেই বলে, শুষ্ক জীবন-প্রহেলিকা।

আমি আমারই কথা বলিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত, তুমি তোমারই কথা বলিবার জন্য লালায়িত। 'আমি, আমি, আমি' লইয়াই জগৎ অস্থির। আমিত্বের প্রসার, আমিত্বের বিস্তৃতি, আমিত্বের প্রতিষ্ঠা, ইহা ভিন্ন যেন এই পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। সে বলে আমাকে মূর্খ, আমি বলি, তাহাকে মূর্খ, সে বলে আমাকে পাগল, আমি বলি তাহাকে পাগল। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। নিজের মন্দ টুকু পাগলের পাগলও ভাবে না, চিন্তা করিতে পারে না। সকলেই মনে করে, আমি জগতের মধ্যে বুদ্ধিতে, বিদ্যায় এবং ধনে শ্রেষ্ঠ, আমার সমান আর কেহই নাই। এই যে আমিত্বের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার,—ইহা কতক্ষণ, কতদিন? অনন্তের মধ্যে

ছুটী বিন্দুতে নিবদ্ধ। অনন্তের তুলনায় তাহা মুহূর্ত্ত হইতেও ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। তবুও মানুষের অহঙ্কার, তবুও মানুষের গরিমা, তবুও মানুষের বাসনার তাড়না। প্রহেলিকা নয় ত কি ?

আমি আসিয়াছি, একটী বিন্দু অবলম্বন করিয়া, যাইবও একটু বিন্দুতে মিলাইয়া, উলঙ্গ হইয়া আসিয়াছি, উলঙ্গ হইয়াই যাইব, পৃথিবীর কিছুই সঙ্গে যাইবে না। পিতার এক বিন্দু শুক্র এবং মাতার এক বিন্দু শোণিত মিলিয়া মিশিয়া আমি-বিন্দুর সৃষ্টি, আর ঐ শুক্র-শোণিতের সম্বন্ধ ছাড়িয়া নিরাকার বিন্দুতে আমি-বিন্দুর পরিসমাপ্তি! সকলেরই এইরূপ দশা। কে আসে, কে থাকে, কে যায়, কে গেল, বল দেখি ? কোথা হইতে আগমন, কোথায় তিরোধান বল দেখি ? তুমি খুব বড় পণ্ডিত, অহঙ্কারে জগৎ কাঁপাইয়াছ, বল ত, কোথায় কোন্ পথে চলিয়াছ ? এখানে সব শাস্ত্র নিরুত্তর, সব জ্ঞান নির্ব্বাক, সব পাণ্ডিত্য নীরব। প্রহেলিকা নয়ত কি ? ইথর-তত্ত্ব, প্রোটোপ্লাজম তত্ত্ব, সব তত্ত্ব ঘাটিয়া নাড়িয়া শেষে মানুষ বালক হইতেও অজ্ঞান। প্রহেলিকা নয় ত কি ?

আমি একদিন ভাবিতেছিলাম, ঈশ্বর না থাকিলে আমার পরিণাম কি ? ঈশ্বরতত্ত্ব অজ্ঞেয়, দুর্জ্ঞেয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? সসীম প্রাণী আমি সেই তত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে অধীর হই—কিছুই শেষ নিরূপণ করিতে পারি না। ভাবিতেছিলাম, যদি ঈশ্বর না ছিলেন, আমি কোথা হইতে আসিলাম ? কেবল একদিন কেন, কত দিন এইরূপ কত কথা ভাবিয়াছি। ভাবিয়া ভাবিয়া কত কাঁদিয়াছি, কত অস্থির হইয়াছি। ছুটিয়া ছুটিয়া নদীর ধারে যাইয়া বসিয়াছি, বিজন অরণ্যে যাইয়া একাকী বসিয়াছি—বসিয়া না বুঝিয়া না বুঝিয়া কতই কাঁদিয়াছি। পৃথিবীর কোন বন্ধু সে সব আত্মকাহিনী জানেন না। ঈশ্বর না থাকিলে, আমি কি করিয়া আছি ? ঈশ্বর না থাকিলে আমি কি করিয়া বাঁচি ? ঈশ্বর না থাকিলে, মানুষ সংসার-মমতায় জড়িত হইয়াও, কি করিয়া আর সব মায়া বিসর্জ্জন দিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে ? নিয়ামক এবং চালক কেহ না থাকিলে, এত মায়া বিসর্জ্জন দিয়া কি যাইতে পারিত ? এই সুখপূর্ণ পৃথিবী, ইচ্ছায় কি কেহ বিসর্জ্জন দিতে পারিত ? আসিয়াছি কি নিজের ইচ্ছায় ? রহিয়াছি কি নিজের ইচ্ছায় ? যাইব কি নিজের ইচ্ছায় ? নিজের ইচ্ছা ভ্রূণের ছিল না। নিজের ইচ্ছা আসন্ন মৃত্যু রোগীর নাই।

কে যেন আনিয়াছে, কে যেন লইয়া যাইবে। পুতুল নাচের পুতুলের ন্যায় কে যেন সূতা ধরিয়া নাচাইতেছে। মানুষ কি ইচ্ছা বর্জ্জিত জড়-প্রকৃতিক নয়? ভাই, তুমি কি বল?

আমার নিজের ইচ্ছা থাকিলে আমি এই পাপ তাপ পূর্ণ পৃথিবীতে আসিতাম না। আসিয়া কি করিয়াছি? কেবল দুঃখ কষ্টের বোঝা মাথায়, শোকতাপের যন্ত্রণা হৃদয়ে এবং ইন্দ্রিয়ের অত্যাচার শরীরে সহিয়াছি ও ধারণ করিয়াছি। হায়! বাল্যে যাহাদের অমিয় মাখা মুখ দেখিয়া ভুলিয়াছিলাম, তাঁহারা আজ কোথায়? এই নির্ম্মম সংসার-প্রান্তরে আমাকে ফেলিয়া, কোথায় সেই মাতৃমূর্ত্তি, কোথায় সেই পিতৃমূর্ত্তি!! তাঁহাদের কথা প্রাণে জাগিলে আমার আর কিছুই ভাল লাগে না। আমি যেন কেমন হইয়া যাই! আমি কেন এত দুঃখ কষ্ট সহিতে আসিলাম? আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া আসি নাই। আমি অনেক বড় বড় লোকের পুস্তক পড়িয়া দেখিয়াছি, কেহই বলেন নাই যে, মানুষ ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছে। মানুষ জন্মের পূর্ব্বে ইচ্ছা-বর্জ্জিত। আবার অন্তিম কালে?—দীপ-নির্ব্বাণের সময়? শেষ মুহূর্ত্ত—ঐ নিঃশ্বাস বয়-বয়-আর-বয় না, এইরূপ শেষ সময়ে, যখন সমস্ত পৃথিবীটা আমার নিকট না থাকার ন্যায় হইবে, যখন সব পরিত্যাগ করিতে হইবে, সেই সময়েও মানুষ ইচ্ছা-বর্জ্জিত। আসিয়াছি ইচ্ছা-বর্জ্জিত অবস্থায়, যাইতেও হইবে, ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া। ইচ্ছার খেলা কত দিন তবে? যতদিন এই ভবে, ততদিন।

জন্ম মৃত্যু দুই বিন্দুর মধ্যেই কেবল জীবনলীলা—ইচ্ছার রাজত্ব। দ্বৈত-ভাবের বিকাশের অবস্থা, স্বাধীন ইচ্ছার খেলা, পাপ-পুণ্য-বোধ,—যা কিছু দর্শনের লীলা চাতুরী, সব এই জীবনলীলায়। কেহ বলেন, মানুষ স্বাধীন, কেহ বলেন, অধীন। কেহ বলেন, কেবল দ্বৈতভাবই স্বাভাবিক, কেহ বলেন, অদ্বৈত জ্ঞানই সার। কেহ বলেন, জীব ও ব্রহ্ম এক, কেহ বলেন, জীব ও ব্রহ্ম পৃথক। মায়াবাদ, জড়বাদ, শক্তিবাদ, সব বাদের লড়াই এই জীবন-লীলায়। মানুষ উঠিতেছে, বসিতেছে, নাচিতেছে, পড়িতেছে। মানুষ মানুষকে তৃণের ন্যায় হেয় জ্ঞান করিতেছে। কত, কত, কত সুখ অন্বেষণ করিতেছে। কত, কত, কত জঘন্য কাজও করিতেছে। বুঝিবা, এই জীবন-কালই মানুষের সর্ব্বনাশের কাল। আমি যদি মানুষ না হইতাম, আমি তোমার মনে এত কষ্ট দিতাম না। আমি যদি না থাকিতাম, এত পাপের

সেবা, এত অধর্ম্মের চর্চ্চায় জীবন কাটাইতাম না। জন্মিয়া অবধি এই পর্য্যন্ত কত গর্হিত কাজ করিয়াছি, ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়! হিংসা-বিদ্বেষে জর্জ্জরিত, কাম ক্রোধে শিথিল-অঙ্গ, অধর্ম্মের লীলাক্ষেত্রে আমি কি না করিয়াছি!! অথচ লোকের প্রশংসার জন্য লালায়িত হইয়াছি কত! আমি হইলাম কত হেয় এবং ঘৃণিত, কিন্তু বাসনা এই, লোকে আমাকে ভাল বলুক, লোকে আমাকে বড় বলুক। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত, সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়—২৪ ঘণ্টায় কত মুহূর্ত্ত—এই কত মুহূর্ত্তে কত নরকের রচনা করিয়াছি। এই উদয়-অস্ত জীবনে কত শত সহস্রবার হইয়াছে। কত সহস্র রকম নরক-রচনা করিয়া তাহাতে ডুবিয়াছি। তুমি আমাকে কি ছাই প্রবোধ দিবে, অসারের অসার মানুষ, আমি অতলে ডুবিয়াছি, আমাকে উদ্ধার করিবার শক্তি তোমার নাই। পাপীর শক্তি কোথায় যে পাপীকে উদ্ধার করিবে? তুমি পার না। তোমার সে ইচ্ছাও নাই। তুমি তুলিবার ছলনায় আরো ডুবাইবার অবসর অন্বেষণ করিতেছ। উঠাইতে পারে না কেহ, জানে না আরো কেহ। উঠাইতে ইচ্ছা নাই, বুঝিবা কাহারও। ডুবাইতেই সকলের সাধ। তা-ধেই তা-থেই নৃত্যের তালে ভুলাইয়া দিবা-রাত্রি মানুষ মানুষকে ডুবাইবার আয়োজন করিতেছে। নরহত্যার শোণিতে দেশ এবং রাজ্য প্লাবিত। পিতৃ বধ, মাতৃ-বধ, ভ্রাতৃ-বধ, বন্ধু-বধ, স্বামী-বধ, স্ত্রী-বধ—বধের যূপকাষ্ঠে মহা আনন্দের রোল সমুত্থিত। ভালবাসায় ভুলাইয়া ভুলাইয়া মানুষ মানুষকে বধ করিতে ছুটিতেছে! ইহাকেই বলে সংসার-লীলা, স্বাধীনতার যুগ, দ্বৈত জ্ঞানের চরম অবস্থা! হা, বিধাতঃ, কি দেখিলাম, কি করিলাম!!

সমস্ত দিন ছুটাছুটি করিয়া এখন সায়ংকালে মাতৃ-ক্রোড় অন্বেষণ করিতেছি। কিন্তু মাতৃ ক্রোড় কোথায়? শ্মশানের আগুনে পৃথিবীর শেষ স্নেহ-কণা ভস্মীভূত হইয়াছে। কিন্তু ঐ দেখ জগজ্জননী পথ-ভোলা পিতৃ-মাতৃহারা ছেলেকে অবশেষে ডাকিতেছেন। কি জন্য পাঠাইয়াছিলেন, জানি না, এখন কেন জানি ক্রোড়ে তুলিবার জন্য ডাকিতেছেন। ঐ ডাক শুনিয়া আমি এখন আত্মহারা, সংসারহারা, স্নেহহারা, মমতাহারা, ইচ্ছা-হারা শিশু-প্রকৃতিক হইতে চাই। অদ্বৈত জ্ঞানে যে সুখ শান্তি, দ্বৈত জ্ঞানে তাহা পাই নাই। শিশু যখন ছিলাম, সকলকেই আপন ভাবিতাম, কেহ পর ছিল না, কিছু মন্দ ছিল না। আমি ইচ্ছা-বর্জ্জিত ছিলাম। আমি দ্বৈত

জ্ঞানে বিষ্ঠা চন্দন, ভাল মন্দ ভেদ বুঝিয়াছিলাম যে দিন, সেই দিন হইতেই আমার সর্ব্বনাশের আরম্ভ। কেহ আপন নাই, সব পর পর—সব ভেদ পূর্ণ, সব পৃথক, সব বিষাক্ত। ভাল বোধ ছিল না—কাহারও ভাল বুঝিতে ও ভাল দেখিতে পারিতাম না। ভাল দেখিলেই কষ্ট হইত। বিবেক-বাণী, আদেশ, যে সকল ধর্ম্মের কথা শুনিয়াছিলাম, সে সকল বিমল সৎপথে, ধর্ম্মের পবিত্র পথে সব সময়ে আমাকে রাখিতে পারে নাই। আমি একবার তাহাদের কথা শুনিয়াছিত দশবার নিজের ইচ্ছার কথা শুনিয়াছি। শুনিয়া, স্বেচ্ছার পথে পাদচারণা করিয়া করিয়া এত মলিন, এত অসার, এত দুর্ব্বল, এত নিস্তেজ, এত স্ফূর্ত্তিহীন হইয়াছি। আমি যখন ইচ্ছা-বর্জ্জিত ছিলাম, তখন আমার মুখের হাসি বিমল ছিল, চোখের জ্যোতি স্নিগ্ধ ছিল, হাতের কাজ পবিত্র ছিল, মুখের ভাষা মিষ্ট ছিল—শরীরের কান্তি অপূর্ব্ব ছিল। যাহা ভাল, বুঝিবা সে সবই ছিল। ঊষার স্নিগ্ধতার সেই মাধুর্য্য, আমি যৌবনসূর্য্যের তীব্র প্রাখর্য্যে ভস্ম করিয়াছি। আমি কি ছিলাম, এখন কি হইয়াছি। জীবনলীলার কি তীক্ষ্ণ সম্মোহ।

শিশু ছিলাম, এখন আবার শিশু হইতে চাই। উদয়ের কোমলতা, অস্তের স্নিগ্ধতায় মিশাইতে চাই। যাহা ছিলাম, তাহাই আবার হইতে চাই। হইতে পারিব কিনা, কে জানে? উলঙ্গ হইয়া আসিয়াছিলাম, উলঙ্গ হইয়াই আবার যাইতে চাই। আমি পৃথিবীর নিকট বিদায় লইতে চাই। রিপুর উত্তেজনা, ইন্দ্রিয়ের তাড়না, ক্ষুধা তৃষ্ণার যাতনা,—সব ভুলিতে চাই। আমি বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় পরিজন সকলের মায়া না-রঞ্জনা-নদীতে ভাসাইয়া দিয়া মায়া-বর্জ্জিত, ছায়া বর্জ্জিত, কায়া ও বাসনা-বর্জ্জিত হইতে চাই। পারিব কি না, কে জানে? তোমরা হাসিও না, আমাকে পারিতেই হইবে। তোমাকেও এই সব করিতে হইবে। পারা বা না পারা— এ সব কথা এখানে নাই। ইহা স্বাধীনতার যুগ নহে, ইহা স্বাধীনতা-বিসর্জ্জনের যুগ। একে একে চুল পাকিতেছে, আমার কথা শুনিতেছে না, একে একে একে দাঁত পড়িতেছে, আমার আহারের তৃপ্তি বিধানের জন্য অপেক্ষা করিতেছে না। একে একে একে আমার ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইতেছে, কত মিনতি করিয়া আর একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছি, তাহা শুনিতেছে না। আমার চক্ষু দৃষ্টি-শক্তি হারা, কর্ণ শ্রবণ-শক্তিহারা, মস্তিষ্ক-স্মৃতি-শক্তি-হারা হইতেছে। আমার ইচ্ছা কাহাকেও বাধা দিতে পারিতেছে

না। একে একে কত কত প্রিয় জন, কত কত ভালবাসার জন অদৃশ্য রাজ্যে পলায়ন করিতেছে, আমার ইচ্ছায় কেহই দাঁড়াইতেছে না। আমার ইচ্ছায় আর কিছুই হইতেছে না। "একটু দাঁড়াও, নয়ন ভরিয়া দেখি," একথা কেহ শুনে না। কোন্ অদৃশ্য, অননুভূত, অপরিজ্ঞাত শক্তির ইঙ্গিতে আমাকে ইচ্ছা-শক্তি-হারা হইতে হইতেছে! আমার সকল আভরণ অল্পে অল্পে খসিয়া পড়িতেছে। সকল বসন, লজ্জাকে ফাঁকি দিয়া, অঙ্গ হইতে স্খলিত হইবার জন্য প্রস্তুত। শক্তি কি আমার আছে যে আমি পারিব, আমি করিব? আমাকে বাধ্য হইয়া ইচ্ছা-হারা হইতে হইবে। বলত, মৃত্যুকে ভালবাসে কে? অথচ সকলকেই মরিতে হইবে। আমার ইচ্ছা এখন অস্পষ্ট ভাষায় নিয়ত বলে, "থাক্ তুই থাক্, আমি যাই। এতদিন ছিলাম, এখন সন্তানের কাল ফুরাইয়াছে, আমাকে যাইতেই হইবে। থাক্ তুই থাক্, আমি যাই।" সকলের "যাই, যাই, যাই"—রবে আমার প্রাণ সদা বিভোর, উচাটন। যাই-যাই-যাই-গঞ্জনা আর সহিতে পারি না। সকলেই বলে—যাই, যাই, যাই। এত কাল যে অঙ্গকে এত খাওয়াইলাম, পরাইলাম, সাজাইলাম, সেও বলে—যাই যাই যাই। বন্ধু বান্ধব সকলেই বলে—যাই যাই যাই। হায়, দিন দিন যাইতেছে কত জন। কত শত বন্ধু নিকট হইতে দূরে, অতি দূরে, অতি দূরে কোন্ অদৃশ্যপুরে কে জানে, গিয়াছেন। যে সব দাঁত পড়িয়াছে, সে সব আর বসিবে না। যে সব চুল পাকিয়াছে, সে সব আর কাল হইবে না। শিথিল ও নিস্তেজ অঙ্গ আর সতেজ হইবে না। যাই-যাই যাই-রবে আমার প্রাণ বিভোর। কাহাকেও আর রাখিবার শক্তি নাই। কাহাকেও আর রাখিবার উপায় নাই। মহামায়ায় মহা লীলা আরম্ভ হইয়াছে। পলায়িত শিশুকে মহামায়া অবশেষে ধরিয়াছেন।

ভাল মন্দের তরঙ্গাঘাতে জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন দেহে, এখন সূর্য্যাস্তের সময়, অকূল সংসার-সাগর-তটে দাঁড়াইয়া নির্ব্বাণের শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। যিনি ছিলেন, যিনি আছেন, যিনি থাকিবেন, যিনি ধরিয়াছেন, তিনি আমাদের সহায় হউন। আমরা নিবিতে নিবিতে একেবারে নিবিয়া যাই। আর বলিব কি, তিনিই, কেবল তিনিই এই শেষ কালে আমাদের সহায় হউন। পৃথিবীর সকল অসার কামনা ও বাসনা ধূলিতে মিশাইয়া যাক্। আজ নববর্ষে সকলে বল, জয় সচ্চিদানন্দ হরে।

বৈশাখ, ১৩০৬।

পরিণয়োপহার।

কন্যা-বরণ।

২০শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩০২

"পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দ্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহু কল্যাণমীপ্সুভিঃ।
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
মনু ৩,৫৫ ও ৫৬।

আজ এই বিশেষ দিনে, বিধাতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক, পরলোকস্থ পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সকল আত্মীয়দিগের আশীর্ব্বাদ ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণের অনুরাগ ও ভালবাসা মস্তকে লইয়া তোমাকে, আমরা, এই দরিদ্র পরিবারের উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সকল আত্মীয় বন্ধু সম্মিলিতভাবে, সাদরে, সস্নেহে প্রফুল্লচিত্তে বরণ করিতেছি। তুমি বিধাতাকে প্রণাম করিয়া আমাদের কথা শ্রবণ কর।

অনেক দিন কাছে কাছে থাকিয়া তুমি এই পরিবারের ছোট বড়, সকলের দোষগুণ জানিয়াছ। জানিয়াছ, আমরা দরিদ্র, অজ্ঞান, এ সংসারে নিন্দিত এবং ঘৃণিত। জানিয়াছ, প্রেম, বিশ্বাস ও ভক্তি অর্জ্জন আমাদের জীবনের ব্রত; লক্ষ্য—মাতৃধাম, চির-বাঞ্ছিত সচ্চিদানন্দ-ধাম। জানিয়াছ, সংসার-গত জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আমরা ধর্ম্ম গত জীবন লাভে প্রয়াসী। জানিয়াছ, আমরা সামান্য ভাবে থাকি, সামান্য কাজ করি;—দেশ-সেবা, নরনারীর সেবার জন্য আমরা সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া দরিদ্রকুটীরে থাকিতেই ভালবাসি। এ পরিবারের লক্ষ্য, বলিয়াছি, মাতৃধাম। সেই মাতৃধামে যাওয়ার উপায় প্রেম-পরিবার সংগঠন করা। রাস্তা হইতে, পল্লী হইতে জগন্মাতার ছেলে মেয়ে কুড়াইয়া আনিয়া আমরা বাল্যকাল হইতে প্রেম পরিবার গঠনের চেষ্টা করিতেছি। আমাদের বসনের পারিপাট্য ও ভূষণের চাকচিক্য নাই, আহার বিহারের জাঁকজমক নাই—সামান্য খাই, সামান্য ভাবে থাকি। সর্ব্বজন আদৃত এই মহাসহরের মধ্যে এই দরিদ্র পরিবার ষোড়শ বর্ষ কেবল বিধাতার কৃপাবলম্বনে জীবন ধারণ করিতেছে। আমাদের সম্বল কেবল প্রার্থনা। যাহা নাই, তাহা পাই কেবল প্রার্থনায়। এ সকলই তুমি জান। বিধাতার কৃপাই আমাদের পান আহার, বসনভূষণ,

সকলই। এ সকল জানিয়াও তুমি এই দরিদ্র পরিবারের সহিত একাত্মক হইতে অভিলাষিণী হইয়াছ, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা বিচ্ছিন্ন-পরিবার-প্রথার বিরোধী,—সুখ দুঃখে, সম্পদ বিপদে আমরা সকলে এক প্রাণে বদ্ধ হইতে চাই, বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বর্গে যাইতেও অভিলাষী নই। এ সকল কথাই তোমাকে বলিয়াছি, তবুও তুমি আমাদের ঘরে আসিতেই প্রস্তুত হইয়াছ, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। তুমি যাহাকে স্বামী রূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, যখন তাহার বয়স চারি মাস, তখন তাঁহার পরমারাধ্যা মা স্বর্গে গমন করেন। সেই হইতে মাতৃস্থান অধিকার করিয়াছেন, চিন্ময়ী জগজ্জননী আদ্যাশক্তি। তাঁহাকে ধরিয়া, তাঁহার কোলে শুইয়া, তাঁহার কৃপায় লালিত পালিত হইয়া যে ব্যক্তি এত বড় হইয়াছে, তাঁহাকে ভালবাসিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চিন্ময়ী মাকে ভালবাসিতে হইবে, এ সকল জানিয়াও তুমি যখন এই কুলে মিলিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, তখন আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আমরা আজ সানন্দে, সাদরে, সোৎসুক চিত্তে, আশা-পূর্ণ হৃদয়ে তোমাকে বরণ করিতেছি। তুমি প্রসন্ন চিত্তে, আমাদের সামান্য উপহার গ্রহণ কর এবং তৎসহ আমাদের ভালবাসা, অনুরাগ, শুভাশীর্ব্বাদ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ কর। তুমি প্রসন্ন হইলে জগৎ প্রসন্ন হইবে, পিতৃকুল, মাতৃকুল প্রসন্ন হইবেন, স্বর্গে দেবতারা এবং মর্ত্ত্যে নরনারী প্রসন্ন হইবেন। তুমি প্রসন্ন হইলে, আমাদের বিশ্বাস, বিধাতা প্রসন্ন হইবেন। তুমি এই দরিদ্র পরিবারের সকলের প্রতি অনুরাগিনী হও, সকলকে ভালবাসার সহিত আপনার জন বলিয়া গ্রহণ কর। পরকে আপন জ্ঞান করা বড়ই দুরূহ কাজ, অথচ বিধাতার ইচ্ছাই এই, এই পৃথিবীতে পরকে আপন করিতেই হইবে, পরের সহিত মিলিতেই হইবে। স্ত্রীপুরুষের মিলন ভিন্ন মানব পূর্ণাঙ্গ হয় না। পূর্ণাঙ্গ মানবই ধর্ম্মলাভে অধিকারী। বহু নদীর একীকরণ হইলে তবে সাগরের উৎপত্তি, বহু হৃদয়ের সম্মিলন হইলে তবে মহাচৈতন্যসাগরের আবির্ভাব হয়। ঈশ্বর কল্পনার বস্তু নন্, তিনি প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত, মানব-সম্মিলন-ধামে। অথবা মানব-সম্মিলন-ধামই তিনি।

শিক্ষা এই,—এক, দুই, তিন, চারি, ক্রমে শত, ক্রমে সহস্র, ক্রমে লক্ষ, ক্রমে কোটি, ক্রমে অনন্ত। সান্তে আরম্ভ, অনন্তে পরিণতি। স্বামীকে ভালবাসিতে চাহিলে স্বামীর আত্মীয়দিগকেও তৎসহ ভালবাসিতে হইবে,

তারপর আত্মীয়দিগের আত্মীয়দিগকে, তৎপরে তাঁহাদের আত্মীয়দিগকে, এইরূপে সীমা অসীমে ধাবিত হইবে। ভালবাসা যাহারা পায় নাই, ভালবাসা যাহাদের কথায়, তাহারা একথা বুঝে না; তাহাদিগকে একথা বুঝানও কঠিন। ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেই এক, দুই, তিন, ক্রমে শত সহস্র, লক্ষ, কোটি, শেষে অনন্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিতে হইবে। মুখে ভালবাসা ভালবাসা করে, অথচ সম্মিলনধামে যে পৌঁছে নাই, সে প্রতারক, সে অনুদার, সে পরশ্রীকাতর, সে হিংসা-বিষ-জর্জ্জরিত।

প্রেম চিরস্থায়ী,—ধ্রুব, অটল, অচল। প্রেম সাধকেরা এই জন্য অটল, অচল, ধ্রুব। পৃথিবী চূর্ণ হইয়া গেলেও প্রেম সাধকের মত ও মন পরিবর্ত্তিত হয় না। প্রেম-শিক্ষার এক এক বিভাগের জন্য এক এক জন আদর্শের প্রয়োজন। সেই আদর্শ, এক পিতা, এক মাতা, এক স্বামী, এক স্ত্রী। এক চন্দ্র, এক সূর্য্য, এক ধর্ম্ম, এক ঈশ্বর। বিধাতার ইচ্ছা বুঝিয়া, এক পিতা, এক মাতা, এক স্বামী, এক স্ত্রীতে অনন্তকাল ভক্তিমান ও অনুরাগী থাকিলে তবে প্রেম কি, বুঝা যায়। প্রেম কেন্দ্র ঠিক থাকিলে তবে অনন্তের দিকে যাওয়া যায়। ভালবাসার চাঞ্চল্য ধর্ম্মপথের মহাবিঘ্ন। জীবনে, মরণে, অনন্তকাল স্বামী স্ত্রী একাত্মক হইয়া প্রেম-সাধন করিবে, এই আশায় আশান্বিত হইয়া তোমাকে আমরা বরণ করিতেছি, আশীর্ব্বাদ করি এবং বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায়, তুমি প্রেম-পথে অনন্তকাল স্থির, অটল, অবিচলিত থাক। প্রার্থনা করি, তুমি যে কুলে একাত্মক হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ, চিরকাল সেই কুলে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায়, অটল হইয়া থাক। সেই কুলের প্রাণ মন তোমার প্রাণমন হউক, সেই কুলের হৃদয় শরীর তোমার হৃদয় শরীর হউক, সেই কুলের সুখ সম্পদ, যশ গৌরব, দুঃখ বিপদ, তোমার সুখ সম্পদ, যশ গৌরব, দুঃখ বিপদ হউক; সেই কুলের প্রেম পুণ্য, ধর্ম্ম কর্ম্ম তোমার প্রেম পুণ্য, ধর্ম্ম কর্ম্ম হউক। এই কুলের ইচ্ছাসাগরে তোমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা মিলিয়া একাকার হউক। তুমি পূর্ণাবয়বে অনন্তকালের জন্য একীভূতা হও।

বড় কঠিন কথা, বড় কঠিন সমস্যা। কঠিন তাহাদের পক্ষে, যাহারা কেবল আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে, সহজ তাহাদের পক্ষে, যাহারা সমস্ত ভার ঈশ্বরের শক্তির উপর বিন্যস্ত করে। বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিবে, আমাদের আশা ভরসা কেবল বিধাতার কৃপা! ব্রহ্মকৃপা আমাদের যোগ

তপস্যা, ব্রহ্মকৃপা জ্ঞান কর্ম্ম, ব্রহ্মকৃপা পান আহার। ঐ ব্রহ্মকৃপা-সরসীতে আজ স্নাত হইয়া সংসারের ভয় ভাবনা, মান অভিমান, ঘৃণা বিদ্বেষ, অনুদারতা সঙ্কীর্ণতা, এক কথায় সংসারের সকল কলুষরাশি ধৌত করিয়া, ঐ আকাশের চাঁদের ন্যায় নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক হও, পদ্মপুষ্পের ন্যায় কোমল ও স্থায়ী সৌরভযুক্ত হইয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন কর, বৃক্ষের ন্যায় কষ্ট সহিষ্ণু ও উদার হও। শুভ্র বসন, এদেশে, পবিত্রতার নিদর্শন, আমরা তাই আজ তোমাকে শুভ্র বসন, শুভ্র সুগন্ধি ও শুভ্র পুষ্প উপহার দিয়া বরণ করিতেছি। তুমি আজ হইতে শুভ্র, নির্ম্মল ও পবিত্র হও। তুমি আজ হইতে উদার, বিনীত, সংযত ও মিষ্টভাষিণী হও। ব্রহ্মকৃপায় স্নাত হইয়া আমাদের বরণ-মালা ইত্যাদি তুমি সাদরে গ্রহণ কর, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শুভ ইচ্ছা, শুভ কামনা তুমি গ্রহণ কর। বিধাতা আমাদের সকলের মস্তকে আজ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাদর আবাহন ও গ্রহণ।

২৯শে মাঘ, মঙ্গলবার—১৩০২ সাল।

* * *—* * *,

আমরা আজ সপরিবারে ও সবান্ধবে মিলিয়া, সস্নেহে, সমাদরে, সপুষ্পে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া, তোমাদিগকে এই পরিবারে আহ্বান ও গ্রহণ করিতেছি। তোমরা এত দিন, সংসার-প্রান্তরের এ-পথে সে পথে, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, লক্ষ্য-হারা হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলে, এত দিন পরে, বিধাতার অযাচিত করুণায়, অতুল দয়ায় তোমরা সম্মিলিত হইয়া পরস্পরকে ধর্ম্মপথে সহায় পাইয়াছ, বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ করিয়া, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, একাত্মক হইবার ব্রত লইয়াছ, তোমাদের পবিত্র যুগল-মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা বিশেষরূপ আনন্দিত হইয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে বিশ্বপতিকে আজ অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। বিধাতা তোমাদিগের জীবন-পথের সহায় হউন এবং তোমাদিগের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করুন।

জগতের অন্তরালে দুই শক্তি, প্রকৃতি এবং পুরুষ,—জ্ঞান আর প্রেম, চিৎ আর আনন্দ। দুই মিলিলেই পূর্ণাঙ্গ হয়। দুই শক্তি যতদিন পৃথক্, তত-

দিন অপূর্ণ, ততদিন দুর্ব্বল, ততদিন অপটু, ততদিন অক্ষম, ততদিন অন্ধ। দুই মিলনে মহাবল সৃজিত হয়। দুই মিলিলেই পূর্ণাঙ্গ সত্তার উদ্ভব হয়। সেই মিলন, একীকরণ। যদি দূর-দূর-ভাব থাকে, যদি সঙ্কোচ থাকে, যদি পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস থাকে, তবে সেই মিল হয় না। এই দুই শক্তিরই বিশেষত্ব আছে, এক অন্যকে নিন্দা করিতে পারে না, এক অন্যকে পরিহার করিয়া চলিলে সংসার চলে না। কেন না, দুই একেরই শক্তি। এজগতে কিন্তু দুই শক্তিতে চিরকাল বিবাদ চলিয়া আসিয়াছে। সে বিবাদের মূল, সঙ্কীর্ণতা ও অহঙ্কার। তোমরা যদি মিলিয়াছ, তবে আমরা আশা করি, মিলনের এই দুই অন্তরায় তোমরা অন্তর হইতে চিরদিনের জন্য উৎপাটন করিয়া ফেলিবে। সঙ্কীর্ণতা ভুলিবে, অহঙ্কার ভুলিবে, অবিশ্বাস ভুলিবে, তবেই পূর্ণাঙ্গ মিলন হইবে। যে মিলন অনন্তকাল-স্থায়ী, আমরা সেই মিলনের কথা বলিতেছি। যে মিলনে ব্রহ্ম-যোগ ও ব্রহ্ম-লাভ সহজ হয়, আমরা সেই মিলনের কথা বলিতেছি। বিবাহ মানুষের পরিণাম নয়, বিবাহ লক্ষ্য-পথে যাওয়ার অবলম্বন মাত্র। বিবাহ করিয়া যাহারা তাহা ভুলিয়া কেবল সংসারের সুখ অন্বেষণ করে, তাঁহারা প্রতারিত হয়, তাঁহারা দুবৎসর দশ-বৎসর পরেই সংসারকে বিষময় জ্ঞান করে, এক বিবাহের পর আবারও পুনঃ পুনঃ বিবাহের জন্য ব্যস্ত ও অধীর হয়। মিলন, লক্ষ্য পথে যাওয়ার উপায় মাত্র। লক্ষ্য, প্রতি মানুষের সৎ বা অনন্ত জীবন লাভ, অথবা ব্রহ্ম-যোগ। মনে রাখিবে, ব্রহ্মযোগের জন্য বিবাহ। আশা করি, তোমরা তাহা কখনও ভুলিবে না। লক্ষ্য ভুলিয়া, উপায় লইয়া যাহারা মজে, তাহারা রোগ শোক, দুঃখ দারিদ্র্য, বিপদ বিষাদময় পৃথিবীতে নানা অশান্তির আগুনে দগ্ধ হয়। তোমরা উভয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। এ পৃথিবী কেবল সুখময় পুষ্পশয্যায় শোভিত নহে, কণ্টকময়ও বটে। সাবধান, সাবধান, কদাচ লক্ষ্য ভুলিবে না।

নরনারী মিলিয়া যখন পূর্ণাঙ্গ হয়, তখন অপূর্ণতা, দুর্ব্বলতা, অপটুতা, অক্ষমতা চলিয়া যায়, তখন মহাশক্তি অবতীর্ণ হয়। মানুষের ক্ষমতা কি জন্য, জান কি? বিশেশ্বরের বিশেষ সেবার জন্য। বিশ্বপতি আপনি বিশ্বের মঙ্গল সাধনের জন্য অস্থির, মানুষকেও বিশ্ব-সেবার অধিকারী করিয়াছেন। মানব জীবন পাইয়া যে ব্যক্তি পরের ভাবনা আপনার ন্যায় না ভাবে, তাহার ও পশুর জীবনে কোনই পার্থক্য নাই। প্রকৃত মানুষ সে, পরের জন্য যাহার

প্রাণ কাঁদে। পরের ভাবনা, পরের চিন্তাকে যে ব্যক্তি আপনার করিতে পারে, সে-ই মহাপ্রেমের অধিকারী। প্রেম, কথাটা শূন্যার্থক তাহার নিকট, যে অন্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আপনার হৃদয়কে অপরের হৃদয়ে ঢালিয়া দেওয়াতেই সুখ। কোন কামনা না রাখিয়া যে ব্যক্তি অন্যের প্রাণে ডুবিতে পারে, সে-ই বুঝিয়াছে, প্রেম কি ? কোন স্বার্থ না রাখিয়া যে ব্যক্তি পরের শুভকামনা করিতে পারে, সে-ই জানে, ভালবাসা কি ? অনিষ্টের পরিবর্ত্তে ইষ্ট, ঘৃণার পরিবর্ত্তে সদ্ভাব, বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে যে ব্যক্তি সদিচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইয়া, অম্লানচিত্তে অপরের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, সে-ই বুঝিয়াছে, প্রেম কি ? পশুরাও নিজেরা সুখে খায়, সুখে বিচরণ করে, সুখে ইন্দ্রিয় চালনা করে। নিজের সুখ অপরের জন্য বিসর্জ্জন দেওয়াতেই মনুষ্যত্ব। পরিবার-সেবা, সমাজ সেবা, দেশ-সেবায় যে প্রেমের আরম্ভ, বিশ্ব-সেবায় সেই প্রেম যখন পরিণত হয়, তখনই —কেবল তখনই ব্রহ্ম-যোগ সম্ভব। আর যে সকল ব্রহ্মযোগের কথা এ জগতে শুনা যায়, তাহা কল্পনা-মূলক। আমরা আজ বিধাতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক, আমাদের সমগ্র হৃদয় তোমাদের হৃদয়ে ঢালিয়া, এই অনুরোধ করিতেছি, তোমরা আমাদিগের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, পরিবার-সেবা, সমাজ-সেবা, দেশ-সেবা-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ব-সেবা ও ব্রহ্মযোগের জন্য প্রস্তুত হও। আমরা আশা করি, আমরা যাহা সাধন করিতে পারি নাই, তোমরা বিধাতার কৃপায়, নবজীবনে, বিশ্ব-সেবার সেই সকল অঙ্গ সাধন করিয়া এ পরিবারের, এ সমাজের, এ দেশের, এ বিশ্বের আদর্শ হইবে।

এই অসাধ্য সাধনে, নিজদিগের শক্তির উপর মোটেই তোমরা নির্ভর করিবে না। ব্রহ্মকৃপাই একমাত্র শক্তি, যাহাতে সকল অসাধ্য সাধিত হয়। ঐ কৃপা সরসীতে অবগাহন কর, সাধন সহজ হইবে। অবনত মস্তকে তোমরা উভয়ে, করযোড়ে ব্রহ্ম কৃপাপ্রার্থী হইয়া দিবানিশি চাহিয়া থাকিবে। তিনি কৃপাময়, তিনি দয়ার সাগর। তাঁহার নিকট অনন্যগতি হইয়া যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায় ; এ কথা বিশ্বাস করিবে। সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করিবে, তবেই সাধন সহজ হইবে। অনন্যগতি হইয়া কেবল প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনায় সকলই পাইবে।

এই পরিবার, এই ব্রাহ্মসমাজ, এই বঙ্গপ্রদেশ অভাব-সাগরে ভাসিতেছে।

আমরা অনেক আশা করিয়া তোমাদিগকে আজ সাদরে গ্রহণ করিতেছি, দেখিও যেন এ পরিবার, এ সমাজ, এ দেশের মুখ তোমাদের দ্বারা উজ্জ্বল হয়। দেখিও, তোমাদের পুণ্যময় আদর্শ-জীবন দেখিয়া যেন আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। তোমরা আমাদের সকলের শুভাশীর্ব্বাদ সাদরে গ্রহণ করিয়া আমাদিগের হৃদয় ও মন অধিকার কর। সকলকে নবভাবে আপনার করিয়া লও। স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থ-ব্রত শিক্ষা কর। সকলের আশীর্ব্বাদ ও শুভকামনা মস্তকে লইয়া, নববলে বলীয়ান্ হইয়া, নব দাম্পত্য জীবন যাপন কর, এবং দিন দিন ব্রহ্মযোগে যোগী হও। বিধাতার মহান্ ইচ্ছা তোমাদের যুগল-জীবনে পূর্ণ হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিবাহের উপদেশ।

(শ্রীমান্ * * * ও শ্রীমতী * * *)

রাঁচি, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩০৮।

* * *, বিধাতার অযাচিতা এবং অপরাজিতা দয়ায় আজ তোমাদের দুটী প্রাণ এক হইয়াছে—পুষ্পদলের দুই নীরবিন্দু মিলিয়া গিয়াছে, ঝরণার দুটী ধারা এক ধারায় পরিণত হইয়াছে,—কি পূর্ব্ব দৃশ্য ! আমরা, তোমাদের আত্মীয়বর্গ এ দৃশ্য দেখিয়া ধন্য হইতেছি। একের জ্ঞান, অপরের প্রেম ;—একের প্রতিভা, অপরের কোমলতা , একের ন্যায়, অপরের দয়া , একের ধর্ম্মানুরাগ, অপরের সেবা,—মিলিয়া, মিশিয়া কি এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। রূপে অপরূপ মিলিয়াছে—পুরুষ ও প্রকৃতি আজ সম্মিলিত। স্বর্গ হইতে অজস্র ধারায় আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে ; মর্ত্ত্যের নরনারীর শুভ ইচ্ছা অর্পিত হইতেছে। জয় বিশ্বপতির জয়। আজ তোমরা প্রাণ ভরিয়া বল, ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

তোমরা জান, দাম্পত্য জীবন, অতি মধুর জীবন। তোমাদিগের এত দিনের কামনা এবং প্রার্থনা আজ পূর্ণ হইয়াছে, ইহাতে তোমরা কত আনন্দিত। কিন্তু জান কি, কেন দাম্পত্যজীবন এত মধুর ? এই বিবাহমণ্ডপ, আত্ম-ত্যাগের এক অপূর্ব্ব ক্ষেত্র। এতদিন তোমরা নিজ নিজ স্বার্থ, নিজ নিজ কামনা, নিজ নিজ ইচ্ছা লইয়া জগতে বিচরণ করিতেছিলে।

আর আজ কবিলে কি ? নিজের স্বার্থ, কামনা ও ইচ্ছা,—মধুময় জীবন অপরকে উৎসর্গ করিয়া যাইতেছ। "আমার হৃদয় তোমায় হউক, তোমার হৃদয় আমাব হউক"—এ প্রতিজ্ঞা আত্ম-ত্যাগের মহামন্ত্র,—বড় কঠোর, বড় কঠিন। দিতে আসিয়াছিলে, দিতেছ, নিতে আসিয়াছিলে, নিতেছ। এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ, আত্মত্যাগ। আত্মত্যাগে সিদ্ধ হইয়াছিলেন মহাদেব, তিনি এ দেশে মহাযোগী বলিয়া বিখ্যাত। আত্মত্যাগে সিদ্ধা হইয়াছিলেন, গৌরী, তিনি এদেশে সতীর আদর্শ। শিবনিন্দা শুনিতে অসমর্থা হইয়া তিনি মৃত্যুকে চুম্বন কবিয়াছিলেন, সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের মহানৃত্য এ দেশের কাহিনীতে এক অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর কাহিনী। প্রেম-মন্ত্রের গূঢ় রহস্য আত্মত্যাগে। আপনাকে যিনি রক্ষা করেন, তিনি পরের হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করিতে অক্ষম। নিজত্ব বিসর্জ্জন দিয়া হৃদয় শূন্য করিতে হয়। সেই হৃদয়ে অন্যকে বসাইতে হয়। নিজের মান অভিমান, বিদ্যা বুদ্ধির গরিমা, বিলাস বাসনার কামনা, পাপ প্রলোভন, সব বিসর্জ্জন দিয়া পবিত্র ও নির্ম্মল হইতে হয়। তোমরা এ সকল বিসর্জন দিতে পারিয়াছ কি ? যদি পাবিয়া থাক, দাম্পত্য-জীবন কেন এত মধুর, তাহা বুঝিবে ; আর যদি সে সকল হৃদয়-পুটলিতে বাধিয়া থাক, বিবাহের নবীনত্ব ঘুচিলে বুঝিতে পারিবে, দাম্পত্য-জীবন কত তিক্ত। জ্ঞান বড, কি প্রেম বড, কেহ মীমাংসা করিতে পারে নাই। পুরুষ শ্রেষ্ঠ, কি প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ, তাহাও অমীমাংসিত। তোমরাও, নিজেদের নিজত্বের অভিমান আজ এই আত্মত্যাগ ক্ষেত্রে পরিত্যাগ কর ; বিশ্বপতি তাহাব সাক্ষী থাকুন। আর সাক্ষী থাকুক, এই সংসার। দুই নদী মিশিয়া একাকার হইয়া যাক্—ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা মিশিয়া একাকার রূপ ধারণ করুক। তোমাদেব আদর্শ-প্রেম-সলিলের স্নিগ্ধতায় এই উষ্ণ ধরা সুশীতল হউক।

ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার কথা বলিতেছিলাম। * * * এবং * * *, তোমা-দিগকে আমি ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গার ন্যায় আজ বুঝিতেছি। ভারতের দুই বিভিন্ন প্রদেশ উর্ব্বরা করিয়া, সুশীতল ও সরস করিয়া, এই দুই নদী মিলিয়া যেখানে পদ্মা নাম ধারণ করিয়া বিশাল বক্ষ হইয়াছে, আমি সেই সুন্দর সঙ্গম-স্থান দেখিয়াছি। মিলনের পর কতকদূর—এই দুই নদীর জলের বর্ণ-পার্থক্য বুঝা যায়, কিন্তু শেষে দুইয়ের জল একবর্ণ, একধর্ম্মবিশিষ্ট,—একাকার। আহা, তাহার জল কত গভীর, কত স্নিগ্ধ, কত সুশীতল, কত

মধুর! সেই জল পান করিয়া কত লোক নীরোগী হয়, ঐ বিশাল-বক্ষের সুশীতল বায়ু সেবনে কত ব্যাধি-যন্ত্রণা তিরোহিত হয়;—কত তৃষার্ত্তের তৃষ্ণা দূর হয়, কত অনুর্ব্বরা জমী উর্ব্বরা হয়। কেবল কি তাহাই? ঐ বিশাল উদার বক্ষে কত বংশের কত সঞ্চিত পাপরাশি বিধৌত হইয়াছে, কে না জানে? কত বংশের কত কলঙ্ক-হলাহল-রাশি পদ্মা হজম করিয়া মহা-যোগিনী বেশে আজ শোভিতা। লোকে দুর্নাম করিয়া তাহার কীর্ত্তিনাশা নাম রাখিয়াছে, কিন্তু আমি বলি, পদ্মার প্রকৃত মাহাত্ম্যই পাপপ্রক্ষালনে। আজ দুই বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ব্রহ্মপুত্র ও ব্রহ্মকুমারী মিলিয়াছে,—ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার মহামিলন হইয়াছে,—দুই বিভিন্নপ্রদেশ ও দুই বিভিন্ন বংশ একাকার হইয়াছে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য। আমরা দেখিতে চাই—ঐ পদ্মার ন্যায়, দিনে দিনে, তোমাদের বিশেষত্ব, বিভিন্নত্ব ঘুচিয়া একবর্ণ, একধর্ম্ম, এক-হৃদয়—একাকার ভাব আসুক, এবং তোমাদের সেই উদার এবং বিশাল হৃদয়ের সুস্নিগ্ধতায় উত্তাপ যাক্, তৃষ্ণা যাক্, সন্তাপ যাক্—এই বঙ্গের পাপ-রাশি বিধৌত হউক। জগৎ সুশীতল ও মধুময় হউক।

নিজের সুখ অন্বেষণে যাহারা ব্যস্ত, এ জগতে তাহারা ঘোরতর অসুখী; এ সংসার তাহাদের পক্ষে যেন মৃগতৃষ্ণিকা। ধরি ধরি করিতেই জীবন যায়, ধরা যায় না। ধন বল, যৌবন বল, এ সকল কদিনের? আমি লিখিয়া দিতে পারি, আজ যাহা আছে, দশ বৎসর পর আর তাহা থাকিবে না। সব যেন পদ্মপত্রের জল, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে তাহা স্থানান্তরিত, রূপান্তরিত হয়। অচঞ্চল, নিত্য, ধ্রুব সত্য এ জগতে কি, তাহা জান কি? তাহা এজগতে আত্মত্যাগ। যে কিছু চায় না, সে সব পায়। যে আপনাকে অর্পণ করে, সে জগৎকে পায়। আপনাকে ভুলিলে তবে জগৎকে চেনা যায় —জগৎকে চিনিলে তবে জগন্ময় যিনি, তাঁহাকে পাওয়া যায়। লোকে বলে, নিরাকারকে ধরা যায় না। আমি বলি, নিরাকারের সাকার মূর্ত্তি, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। চিন্ময়ীর এই দিব্য মূর্ত্তি অন্তরে বাহিরে ধ্যান করিয়া জগতের সহিত একাত্মক হওয়াতেই প্রকৃত সুখ। সম্ভব নয় যে, ক্ষুদ্র মানব ক্ষণস্থায়ী জীবনে জগতের সকলকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু হৃদয় যদি বিশাল হয়,—ইচ্ছা যদি মহান ও উদার হয়, সকলকেই আপনার বলিয়া ধারণা করা যায়। সাধনার পথে, আমি এই ধ্রুব সত্য পাইয়াছি,—আমরা ও জগৎ একাত্মক;—আমরা ও জগৎ,

একে স্থিত, একে রক্ষিত, একে সঞ্জীবিত। এই অমূল্য সত্য সাধনে তোমাদের যুগল রূপ জগতের সহিত একাকার হউক। জগতের সুখ, তোমাদের সুখ হউক; জগতের মঙ্গল, তোমাদের মঙ্গলের বস্তু হউক, তোমরা জগতের এবং তৎসহ জগন্ময়ীর অতুলরূপে বিসর্জ্জিত হও। পদ্মার অতুল স্নেহ-বর্ষার প্লাবনে পূর্ব্ব বঙ্গ ভাসিয়া যাক্।

* * *, তুমি হও কায়া, * * *, তুমি হও ছায়া। * * *, তোমার পিতা চরিত্রের আদর্শে পূর্ব্ববঙ্গকে মধুময় করিয়াছেন, আজ তুমি পিতৃকুলের সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কায়া রূপ ধারণ কর। * * *, তোমার পিতা মধুময় সুস্নিগ্ধ প্রকৃতিতে পশ্চিমবঙ্গকে সুস্নিগ্ধ করিয়াছেন, তুমি সেই প্রকৃতিতে অনুপ্রাণিতা হইয়া আজ ছায়া রূপ ধারণ কর। প্রকৃতির দুই রূপ কায়া ও ছায়া, ব্রহ্মপুত্র ও ব্রহ্মকন্যা, আজ মিলিয়া দুই কুলের মুখ উজ্জ্বল করুক; এবং মিলিয়া, একাকার হইয়া, সকল আত্মীয় ও সকল নরনারীর স্নেহাশীর্ব্বাদ লইয়া, বঙ্গকে সুশীতল করিয়া, ঐ মহা প্রেম-সাগরের দিকে ধাবিত হউক। স্বতন্ত্র ইচ্ছা, স্বতন্ত্র কামনা, স্বতন্ত্র রূপ—আজ মিলিয়া যাক্। পৃথিবী মধুময় হউক।

তোমাদের পিতা মাতা তোমাদের নিকট কি চান? আমরা আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ কি চাই? আর কিছুই নয়—কেবল এই চাই, তোমাদের জীবন পুণ্যময় ও মধুময় হউক, তোমাদের আদর্শে এই ধরার পাপ সন্তাপ-রাশি বিদূরিত হউক,—বিধাতার পবিত্র সিংহাসন এই জগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমরা সংসারকে প্রেম ও সেবা বলে আয়ত্ত করিতে করিতে শেষে অকূল প্রেমসাগরে মিলিত হও। তোমরা তাঁহার সংসার এবং তাঁহার সহিত একাত্মক হও। বিধাতা তাহাই করুন, বিধাতা কেবল তাহাই করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সৌভাগ্য ও অহঙ্কার।

সৌভাগ্য, ব্রহ্ম কৃপা-সিঞ্চিত অমৃত, অহঙ্কার মানব-স্বেচ্ছা-সমুৎপন্ন গরল-রাশি,—এক দেবাদ্বৈতের লীলা, অন্য মানব-দ্বৈতের ক্রীড়া। দেবাসুরের মহামিলন, সৌভাগ্য এবং অহঙ্কার। সৌভাগ্য পাইয়া যে বিধাতাকে বিস্মৃত হয়, তাহার পরিণাম অন্ধকারাবৃত।

(১)

শোভারাম ঘটক বংশানুক্রমে দরিদ্র ব্যক্তি। বাল্যে সকল দিন উদরের অন্ন যুটিত না, অনেক সময়েই অন্যের পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্র তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিত। ঘৃণা ও উপেক্ষা দরিদ্রের চির সহায়, এই সকলই শোভারামের ভাগ্যে মিলিত। তাঁহার হৃদয়ে একটু দয়া ছিল, তাহাও সকলে ঘৃণার উত্তেজনায় উপেক্ষা করিত। তাঁহার হৃদয়ে একটু কৃতজ্ঞতা ছিল, লোকেরা কত ভাবে কত কথাতেই তাহার নিন্দা করিত। লোকেরা বলে, দরিদ্র যে, তাহার হৃদয়-ঘরে কোন প্রশংসার বস্তু থাকিতে পারে না। সকলের উপেক্ষা, ঘৃণা ও অবহেলায় শোভারাম বাল্য কাটাইলেন।

(২)

যৌবন মানুষের বিশেষ কাল,—কে দরিদ্র, কে ধনী, যৌবন ইহা গণনা করে না। সকলের নিকটেই তাহার আগমন। সে সকলকেই সাজায়, শোভারামকেও কিছু কিছু সাজাইল, কিন্তু তবুও, তাহাকে কন্যা দিতে কোন লোক অগ্রসর হইল না। অন্তরের উত্তেজনায় শোভারাম কঠোর অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। দুঃখীর বন্ধুও নাকি পৃথিবীতে দুই একজন মিলে, তাঁহারা এই সময়ে, শোভারামের বিশেষ সহায় হইলেন, শোভারামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মানবের ঘৃণা যেখানে বর্ষিত হয়, কি জানি কেন, বিধাতার কৃপা-আশীর্ব্বাদ সেখানে অবতরণ করে। দেবতার আশীর্ব্বাদে, দেখিতে দেখিতে, শোভারাম পরীক্ষার পর পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। সকলের চক্ষু স্থির। প্রথম প্রথম সকলে বলিত, "একটা পরীক্ষায় ভাল হইয়াছে, উহা দৈবঘটনা, উহা কিছুই নয়, অন্য পরীক্ষায় নিশ্চয় ফেল হইবে।" সে পরীক্ষায়ও যখন শোভারাম সর্ব্বপ্রথম হইলেন, তখন লোকেরা বলিল, পরীক্ষায় পাশ হইলে কি হয়, কত বি-এ, এম-এ, এম-বি, এম ডি রাস্তায় গড়াগড়ি যাইতেছে, উহাতে কি হইবে? উপেক্ষা, উপেক্ষা—তবুও উপেক্ষা শোভারামকে ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। শোভারাম, সকল উপেক্ষা দিন দিন অতিক্রম করিতে লাগিলেন। দেবতা মানুষকে যখন ধরেন, কোন্ অসুর তাঁহাকে ডুবাইতে পারে? শোভারাম দেব-প্রসাদে উন্নতি হইতে [illegible] সোপানে বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া চলিলেন।

(৩)

ঠানদিদির গল্পে অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে, সেকালে কোন রাজার রাজ-সিংহাসন খালি হইলে রাজার হাতি পাগলের মত চতুর্দ্দিক ছুটিত। যাহার কপালে রাজটিকা দেখিত, তাহাকে পৃষ্ঠে করিয়া আনিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিত। পৈতৃক বা পরের গচ্ছিত ধনে যাঁহারা পোদ্দারী করেন, তাঁহাদের অহঙ্কারের কথার উল্লেখ করিতে চাহি না। কথায় বলে, যেখানে ধন অনেক, সেখানে অহঙ্কারও অনেক বাস করে। পোষাপুত্র রূপে যাঁহারা রাজৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া ধরাকে শরার ন্যায় জ্ঞান করেন, তাঁহাদের কথাও বলিতে চাহি না, ঘটনা চক্রে পৃথিবীতে কত অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, কে সে সকল ভাবিয়া মাথা সুরাইতে বসিবে? শোভারাম বিধাতার কৃপায় যখন সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তিনি এক জন বড় লোকের মধ্য পরিগণিত হইলেন। সৌভাগ্য হাতি তাঁহাকে রাজ-সিংহাসনে যেন বসাইয়া দিল। নাম পড়িলে টাকার ভাবনা থাকে কি? নিন্দুকের বদনে কালী ঢালিয়া, দলে দলে লোক, কাহার আদেশে কে জানে, হাজার হাজার টাকা শোভারামের ঘরে দিয়া যাইতে লাগিল। বিবাহ করিয়া শোভারাম দশ হাজার পাইলেন, বড় লোকের বড় একটা মকদ্দমায় ওকালতি করিয়া পাই-লেন পঞ্চাশ হাজার। তারপর—তারপর, টাকা একবার আসিতে আরম্ভ করিলে আর তার গতি থামায় কে? কেহ বলে শোভারাম, মাসে পাঁচ হাজার, কেহ বলে দশ হাজার রোজগার করেন। টাকা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শোভারামের পূর্ব্বের হৃদয়টুকু তিনি হারাইয়াছেন। আগে কোন দরিদ্র দেখিলে নিজের পরিবারের জীর্ণ বস্ত্র দান করিতেন, আহারের সময় কোন ক্ষুধিতকে দেখিলে, অম্লানচিত্তে তাঁহার ভাগ্যে যৎসামান্য যে আহারের জিনিস যুটিত, তাহাও বিতরণ করিতেন। আজ আর সে ভাব নাই। যে দুই জন বন্ধু পাঠের সময় তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এখন শোভারাম ভ্রমেও তাঁহাদের কথা ভাবেন না, পূর্ব্বে দিবসের অধিক সময় তাঁহাদের বাড়ী থাকিতেন, এখন তাঁহারা বাসায় আসিলেও কথা কহার অবসর পান না। কৃতজ্ঞতা নামক যে একটা দেব বাঞ্ছিত জিনিস সংসারের সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে শোভারাম আজকাল দুর্ব্বলতার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বে ভগবানের কথা শুনা মাত্র কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িত, এখন বিধাতা নামে যে কেহ ব্রহ্মাণ্ডে

আছেন, একথা তিনি মোটেই স্বীকার করেন না। যে ধনীরা এক সময়ে তাঁহাকে উপেক্ষা করিত, নিন্দা করিত, ঘৃণা করিত, এখন তাঁহারাই তাঁহার প্রধান বন্ধু। গরিবের সঙ্গে মেশামিশি করিলে জাতি যায়, কি নাকি বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় দরিদ্রের শরীরের সংস্পর্শে মনুষ্যত্ব যায়, তাঁহার ইহাই ইদানীন্তন কালের প্রধান উক্তি।

কল্পনার কথা নয়, সত্য ঘটনা লিখিতেছি। কোন কোন ঘটনার কিছু রূপান্তর হইয়া থাকিতে পারে, তজ্জন্য পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। এক কথায়, শোভারাম আজকাল কলিকাতার মধ্যে একজন বড় লোক বলিয়া পরিগণিত। এখন বেনামী করিয়া সম্পত্তি গ্রহণ, মিথ্যার সাহায্যে সম্মান লাভ, জাঁকজমকের তপস্যায় রত থাকিয়া দরিদ্রপীড়ন এ সকল তাঁহার নিত্য কর্ম। বেতন লইয়া ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া পাখা টানিতে না পারে, তাহাকে প্রহার করিলে পাপ নাই, পেটের জ্বালায় কুকুরের ন্যায় যে ভিক্ষুক দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিয়া বেড়ায়, তাহাকে অপমান করিলে অবশ্য হয় না, এখন তাঁহার মুখে নাকি এ সকল কথাও শুনা যায়। তিনি ধনী হইয়াছেন বলিয়া, পিতৃ মাতৃ কুলের কত কত আত্মীয় তাঁহার দ্বারে ঘুরিতেছে, তিনি বলেন, একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, অলসদিগের সাহায্য করিতে তিনি পারেন না। তিনি পারেন না,—আজ কাল পৃথিবীর কোন সৎ কাজ করিতে ! তবে পারেন কি ? মদ্যপান, ব্যভিচার, বৃথা গর্ব্বালাপ, পরনিন্দা, এ সকল তিনি খুব করিতে পারেন। তিনি আজকাল বড় লোক, এ সকল দোষ কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। সুতরাং সে সকল কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তুমি যদি বিরুদ্ধে কোন কথা বল, তাঁহার কোপানলে দগ্ধ হইবে।

(৪)

আমরা পৃথিবীর যে অংশে বাস করিতেছি, এ অংশে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কল্পনাদুষ্ট বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। যে দিকে চাই, সেই দিকেই এইরূপ দৃষ্টান্তের অভিনয়। মানুষের দেশ নয়, আমরা যেন পশুর রাজ্যে বাস করিতেছি। শোভারাম বাবুর আর দুটী কাজের কথার উল্লেখ করিব। যে প্রধান দুই জন বন্ধু দুর্দ্দিনে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইয়াছে, শোভারাম ভ্রমেও অন্তিম কালে তাঁহাকে দেখেন নাই, তৎপর তাঁহার পত্নীকে আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,

অন্য বন্ধুকে অপদস্থ করিতে, লাঞ্ছনা দিতে যে কত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার শেষ নাই। নানা রূপ নিন্দার আশ্রয় লইয়াও যখন তাঁহার কোনই অনিষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন তাঁহার বসতবাড়ী কিনিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিছুতেই তাঁহাকে অপদস্থ করিতে না পারিয়া শেষে সদলে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার বাড়ী কখনও যাইবেন না। এই ভাব অনেক দিন চলিয়াছিল।

(৫)

অতি দর্পে হত লঙ্কা এ কথা কি কবিত্বের কথা? রাজা রাজবল্লভের বংশধরেরা আজ কোথায় কি অবস্থায়? সিরাজ ও সীতারামের মহাপ্রতাপ আজ কোন অন্ধকারের কুক্ষিগত? বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের গৌরবরাশি আজ কোন্ সাগরে বিসর্জ্জিত? অতি দর্পে হত লঙ্কা—ইহা এই পৃথিবীর প্রতিদিনের ব্যাপার। কত সম্পদ ঐশ্বর্য্য শ্মশানের চুলী উদরস্থ করিয়াছে, কত গৌরব অহঙ্কার বিস্মৃতির জল নির্ব্বাণ করিয়াছে, কেহ সে ইতিহাস লিখিয়াছে কি? আজ যে রাজা, কাল সে পথের ভিখারী!! চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে সকল ভেল্কী শেষ হইতেছে—কাহার লীলায়, কাহার ইঙ্গিতে, কে জানে, রাজা পথের ভিখারী হইয়া বেড়াইতেছেন। হায়, হায়, হায়, শোভারামেরও আজ সেই দশা। লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কোন উপপত্নীর অন্ধ পতির ষড়যন্ত্রে তিনি মামলা মকদ্দমায় সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন, তাঁহার বাড়ী গিয়াছে, গাড়ী গিয়াছে, ঐশ্বর্য্য গিয়াছে, সম্পদ গিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ধনী বন্ধুর দল সকলেই দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বিপদে সাহায্য করিতে আজ কেহই নাই! কিন্তু পাঠের সময়ের সাহায্যকারী সেই অবশিষ্ট বন্ধু, আজও অলক্ষিতে, নানা প্রকারে তাঁহার উপকার করিতেছেন। অনুতপ্ত শোভারাম সে জন্য এখন জীবন্মৃত।

অবস্থা বা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতেই মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্ভব হয়। সুখশয্যায় শয়ন করিয়া কেহই কৃতিত্ব লাভ করিতে পারে নাই, ইহা চিরসত্য, সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য। সুকোমল সৌরভযুক্ত কুসুমে কণ্টক, মধুমাখা চাঁদে কলঙ্ক,—আলোকের ধারে আঁধার, এই জন্যই মনোরম। কিন্তু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ, আমাদের এ দেশে, হায় এই বঙ্গে, কেবলই দেবত্ব হইতে পশুত্বে, সার হইতে অসারে নমিত হয় কেন? সৌভাগ্য, মানবের চিরবাঞ্ছিত হইলেও, বিধাতার কৃপার দান চিরপ্রাপ্য

নয়,—উহা পদ্মপত্রের জলের ন্যায় সদা চঞ্চল, আজ এখানে, কাল সেখানে কত রাজা পথের ভিখারী হইয়াছে ? কত সোণাব সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কে তাহার ইতিহাস লিখিয়াছে ? দেখিতেছে সকলেই—সৌভাগ্য সদা চঞ্চল, অথচ সৌভাগ্য পাইয়া অহঙ্কৃত প্রায় সকলেই ! শোভারামের কথা গল্প নয়, ইহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ ব্যাপাব। অহঙ্কাব, আস্ফালন, বাহ্যাড়ম্বর চতুর্দ্দিকে—সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ধবাকে বিকম্পিত করিতেছে।

দুঃখ পাত্র চুম্বন না কবিলে কেহই উন্নতির সোপানে আবোহণ করিতে পারে না। মহাজনেরা বলেন, দুঃখ দাবিদ্র্যই ধর্ম্ম লাভের একমাত্র পথ। ঈশা, চৈতন্য, বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাজনবর্গ ঐশ্বর্য্যের ভ্রুকুটি পরিহার করিয়া সর্ব্বদা আত্মস্থ থাকিতে চেষ্টা কবিতেন। এই যে শস্যশ্যামলা পৃথিবী, উহা আমাদের লক্ষ্য নয়, এই যে বিলাসবাসনা পূর্ণ প্রকৃতি, ইহা আমাদের পরিণাম নয়, শিক্ষা দীক্ষার জন্য এ সকলের সৃষ্টি। কিন্তু ইহাতে মজিলে চলিবে না,—পথের জিনিস পথেই ফেলিয়া যাইতে হইবে। ঐ সকল মহাজনেরা কামিনী কাঞ্চনকে বিষবৎ পবিত্যাগ করিতেন। কেহ কেহ বলেন, প্রলোভনেব মধ্যে থাকিয়া প্রলোভনকে জয় কবিতে পারিলেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মে। কথাটা অঠিক নহে। দুঃখেব বিষয়, উপরোক্ত মহাজনবর্গও প্রলোভনকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন। প্রলোভনে আত্মসমর্পণ করিলে সে মানুষকে আপনার করিয়া লয়, মনুষ্যত্বের আশা সুদূরপবাহত হইয়া পড়ে। আরম্ভে সকলই সুন্দর, পরিণতিতে সকলই যেন কুৎসিৎ। এই পৃথিবীতে কত কোটী কোটী সুকোমল পবিত্র বালককে যৌবন-দস্যু প্রমত্ততায় মাতাইয়া মবণের পথে লইয়া গিয়াছে, কে জানে ? আগমনের দিনে সকলেই পবিত্র—সুন্দর, মনোহর, সবল, তিরোধানের দিনে—প্রায় সকলেই অপবিত্র, কুৎসিৎ, অহঙ্কৃত, অসবল, সংসার-বিষে জর্জ্জরিত। প্রলোভন জয় করা ভাল কথা, কিন্তু জয় করিতে পাবিয়াছে কত জন ? বিষয়-সম্ভোগ ঘৃণার বস্তু নয়, কিন্তু বিষয়-সম্ভোগে অহঙ্কার জন্মে নাই, মোহ উপস্থিত হয় নাই, পঙ্কিলতায় চিত্ত পঙ্কিল হয় নাই, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। শোভারামের দৃষ্টান্ত চতুর্দ্দিকে।

এক সময়ে ভাবিতেছিলাম, কেন বা প্রলোভন, কেন বা পতন ? আমি প্রলুব্ধ না হইলে মরিতাম না, তাহা ঠিক, কিন্তু প্রলোভনের বস্তু কেন চতুর্দ্দিকে ? রক্ত মাংসের আবরণে আমিত্বের বীজ বপন করিয়া মহা চক্রী কি

মহা খেলা খেলিতেছেন!। মানুষকে ডুবাইবার জন্যই কি এই সকল আয়োজন? না—তাহা নয়। মানুষকে উন্নতর চরম সোপানে তুলিবার জন্য বিশ্বপতির এই পবিত্র আয়োজন, কিন্তু মানুষ মহেশ্বরের মহা ইচ্ছা না বুঝিয়া, স্বাধীন ইচ্ছায় গরল উৎপন্ন করিয়া তাহা পান করিয়া মরে? শাণিত ক্ষুর দ্বারা ক্ষৌরি না করিয়া ক্ষৌরিক নরহত্যা করিলে ক্ষুর-প্রদাতার দোষ হইতে পারে না। ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলাইয়া, দাতার আনুগত্য স্বীকার করিলে আর বিঘ্ন ঘটে না। সম্পদও যাঁহার, বিপদও তাঁহারই প্রদত্ত, সুখ দুঃখ একেরই হস্তের জিনিস। আমি কেন সুখে উৎফুল্ল, দুঃখে বিমর্ষ,—একে অহঙ্কৃত এবং অন্যে নিরাশ হইব? যাহা হইবার, হউক, আমি নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত, অনাসক্ত থাকিতে পারি যদি, তবে মরণ বা পতন আমার কি করিবে? কিন্তু হায়! ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলন তেমন সোজা কথা নয়। অনেকবার মরিলে, তবে সে আসুর-বিজয়ী শক্তি জন্মে। একবার, দুবার নয়, শত শত বার মরণের পর তবে নব জীবন-লাভ সম্ভব। বারম্বার শিশুর পতন হইলে তবে হাত পা শক্ত হইবে, শিশু হাটিতে শিখিবে। আমাদিগকে অনন্ত জীবনের পথে চালিত করিবার জন্য বহুবার ফেলিয়া ফেলিয়া, বিশ্বপতি, আমাদিগকে শক্ত করিয়া লইতেছেন। মহা-সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করা তেমন সোজা কর্ম্ম নয়। হায়, আমি কি কেবল মৃত্যুর জন্যই সৃষ্ট!।

সংসারের ষোল আনা আধিপত্য, আমি বায়ু তাড়িত ধূলিকণার ন্যায়, স্রোত-তাড়িত শৈবালের ন্যায় উড়িতেছি, চলিতেছি। স্থির, অচঞ্চল, অটল, অবিচলিত আমি হইতে পারিলাম কই? সুখ-উল্লাসে নৃত্য করি, কিন্তু হায়, সুখ আমার ঘরে নিত্য থাকে না, সৌভাগ্যের উদয়ে আস্ফালন করি, কিন্তু কই,—আজ বাদে কাল দেখি মহা অন্ধকার। আমি কতবার প্রতারিত হইলাম, কতবার মজিলাম, কতবার ডুবিলাম! দাঁড়াই কোথা, যাই কোথা? এখন জীবন-সন্ধ্যায়, মহা সমস্যায় পড়িয়াছি। আমি সকল ঘটনা এবং অবস্থার উপরে দাঁড়াইয়া প্রবল বিপদ ব্যাত্যা-তাড়নায় যদি স্থির এবং অচঞ্চল হইতে না পারি, আমার রক্ষা নাই। দেবাসুরের সংগ্রামে আমি নিত্যই পরাজিত! শোভারাম কি বাহিরে,—জগতে, সংসারে? চাহিয়া দেখ, আমরা প্রত্যেকেই শোভারাম!।

এই ত মানুষের অবস্থা। এখন করি কি? আমি নিরুপায়, অনন্যগতি হইয়া এখন গতিনাথের শরণ লইয়াছি। আমি পাপ পুণ্য বুঝি না, ধর্ম্মাধর্ম্ম

জানি না—আমি একের কোলে মাথা রাখিয়া এখন সংসার-সম্বন্ধে মহা নিদ্রায় ডুবিতে চাই।। ইচ্ছা বর্জ্জিত, কামনা-বর্জ্জিত, সদসৎ-বর্জ্জিত, পাপ-পুণ্য বর্জ্জিত—আমি সম্পূর্ণরূপে একের অধীন হইতে চাই। সৌভাগ্যের উদয় অহঙ্কারের কারণ, আমি সৌভাগ্য চাই না, দুর্ভাগ্যের উদয়, সৌভাগ্যের কারণ, আমি তাহাও চাই না। আমি চাই—কেবল এক অচিন্ত্য, অনিন্দিত পদার্থ, যাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে ইচ্ছা-বর্জ্জিত হওয়া যায়। ইচ্ছা লইয়া, বাসনা লইয়া তোমরা দ্বৈতাদ্বৈতের মহা তর্কে মাতোয়ারা হও, আমি সব দীপ নির্ব্বাণ করিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাই। আপনাকে ভুলিতে না পারিলে কে কবে অহঙ্কারকে জয় করিতে পারিয়াছে, তুমি বলিতে পার কি? তাহা অসম্ভব, তাহা অসম্ভব।

শ্রাবণ, ১৩০৬।

পরশ্রীকাতরতা।

দিনব্যাপী পরিশ্রমের পর একদিন সায়ংকালে দেশের অবস্থার কথা ভাবিতেছিলাম। নিরাশার অন্ধকার অল্পক্ষণের মধ্যেই হৃদয় মন আচ্ছন্ন করিল। কতজনের কথাই যে মনে জাগিতে লাগিল, একমাত্র বিধাতাই জানেন। দুই একটী কথা এখানে লিখিতেছি।

(১)

একজন বিশিষ্ট লোকের কথা বলিতেছি। তিনি একদিন বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, হঠাৎ ইনকম্ টেক্সের এক নোটিস পাইলেন। পাঠ করিয়া দেখিলেন, প্রায় তিন গুণ টেকস্ বৃদ্ধির সংবাদ আসিয়াছে। দুর্ভিক্ষ এবং প্লেগের দরুণ ১৩০৪ সালের কারবারে কলিকাতার অনেকেই লোকসান দিয়াছেন, তাঁহারও লোকসান হইয়াছিল, তবুও টেক্স বৃদ্ধির নোটিস। অনুসন্ধানে জানিলেন, কোন্ ধার্ম্মিক ব্যক্তি নাকি বেনামী পত্র দিয়াছেন। লোকের অপকারের জন্য বেনামী পত্রের কথা ভাবিয়া অবাক্ হইলেন। এসেসর বাবু ধার্ম্মিক বলিয়া চতুর্দ্দিকে পরিচিত, তিনি অবিচার করিবেন না, এই বিশ্বাসে তাঁহার আদেশে হিসাব পত্র আফিসে লইয়া যাইয়া তাঁহাকে দেখান হইল। সমস্ত অবস্থা অকপট চিত্তে তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া বলা হইল।

তিনি বিবেচনা করিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। কিছুদিন পরে, আবার সেই বর্দ্ধিত হারের টাকার জন্য নোটিস আসিল। তখন যথারীতি আপত্তির আবেদন করা হইল। ইনকম্ টেকস্ আফিসের অত্যাচারের কথা যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা বুঝিবেন না, ইনকম্ টেকস্ আফিসে মকদ্দমা করা কি কষ্টকর ব্যাপার। প্রথম তারিখ সমস্ত দিন তিনি খাতা-পত্র লইয়া আফিসে বসিয়া রহিলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডাকিয়া বলিয়া দেওয়া হইল, আজ হইবে না, আর এক দিন নির্দ্ধারণ করিয়া তারিখের পার্শ্বে তাঁহার স্বাক্ষর গ্রহণ করা হইল। সেই নির্দ্ধারিত দিনেও হইল না, আবার তারিখ ফেলা হইল। তৃতীয় দিনে একজন এক হিসাব দেখিলেন। চতুর্থ দিনে আর একজন আর এক হিসাব দেখিলেন, ডেপুটী বাবুর নিকট তবু মকদ্দমা উঠিল না। পঞ্চম দিনে মকদ্দমা উঠিল, ডেপুটী বাবু হিসাব দেখিলেন, এই লোকের যে আয়, তাহাতে টেকস্ মোটেই হয় না, দেখিয়া, অবাক্ হইয়া, কেন এরূপ বৃদ্ধির নোটিস্ দেওয়া হইল, এসেসর বাবুর নিকট সে সম্বন্ধে কৈফিয়ত চাহিলেন। এসেসর বাবু বলিলেন, "ইনি কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না, স্বাধীন ভাবে চলেন, ফিরেন, ইঁহার এ খরচ, সে খরচ, লোকেরা বেশী আয় মনে করে। আমার ধারণাও সেইরূপ, এই জন্য টেকস্ বৃদ্ধির নোটিস দিয়াছি।" ডেপুটী বাবু, পুনর্বিবেচনার জন্য, কাগজ পত্র এসেসর বাবুকে ফেরত দিলেন। সুতরাং সে দিনও শেষ নিষ্পত্তি হইল না। আবার কিছুদিন পরে এসেসর বাবু বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বে যে টেক্স ছিল, তাহাই রাখিতে বলিলেন। আবার নোটিস্ আসিল। আবার আফিসে একদিন কাটিল, সে দিন বিচার হইল না। দ্বিতীয় দিনেও হইল না। তৃতীয় দিনে ডেপুটী বাবু বলিলেন, "এসেসর বাবু পুনঃ বিবেচনা করিয়াছেন, সুতরাং পূর্ব্বে যে টেকস্ দিতেন, তাহাই থাকুক।" সে বৎসর এত কষ্টের ফল এইরূপ হইল। ধার্ম্মিক এসেসর বাবু নিরপরাধী ভদ্র লোককে অযথা কষ্ট দিয়া পিতৃ-তর্পণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার সুখসেব্য আবাসের বিরাম নাই, অনিন্দিত যশের লাঘব নাই,—শোক, তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই যেন বিধাতা তাঁহার ভাগ্যে লেখেন নাই। তাই গত বৎসরের অকৃতকার্য্যতায় ভীত না হইয়া, আবার এ বৎসর টেক্স বৃদ্ধির নোটিস দিয়াছেন। আফিসের টিকটিকিটী পর্য্যন্ত ধর্ম্মাবতার, পেয়াদা হইতে হাকিম পর্য্যন্ত সকলেই রাজা বাহাদুরের অবতার, ক্ষমতার অপব্যবহারের জীবন্তমূর্ত্তি, সেখানে কি যাইতে আছে? 'নীরবে অত্যাচার

সহ্য করা ভিন্ন এ দেশের আর উপায় নাই। ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত এবং সম্প্রদায় বিশেষে সম্মানিত এসেসরের এইরূপ জঘন্য কাজ, ইহাদ্বারা অধার্ম্মিকদিগের অত্যাচারের মাত্রা কত অধিক, সকলেই বুঝিতে পারেন। এইরূপ অত্যাচারেই, দুর্ভিক্ষের বৎসরেও টেক্‌সে গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। * ইহাকেই বলে, গরু কেটে জুতা দান।

এসেসর বাবু বেনামী পত্র পাইয়াই ঐরূপ করিলেন, না নিজের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিগত হিংসা বিদ্বেষের উত্তেজনায় এরূপ করিতেছেন, কেহ কেহ সন্দেহ করিতেছেন। "ইনি কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না।" ইহা টেক্‌স্ বৃদ্ধির কিরূপ কারণ? "ইঁহার নানা খরচ আছে, ইহাই বা কিরূপ কারণ? একজন লোক মজুত টাকা খরচ করিলেই টেকস্ বৃদ্ধির কোন কারণে পড়িতে পারেন কি? বেনামী পত্র পাইয়াছেন, লোকেরা আয় বেশী বলিয়াছে, ইহাতেও বৃদ্ধির কারণ দেখা যায় না। হিসাব পত্র দেখ, তারপর ন্যায্য কাজ কর। তবে একটী কারণ আছে, সেই কারণটী বুঝি বা এক্ষেত্রে মাবাত্মক হইয়াছে। সে কারণটী পরশ্রীকাতরতা। অন্যের অনিষ্ট না করিতে পারিলে লোকবিশেষের সুখে দিনপাত হইতে পারে কি?—অন্যের ভাল দেখিলে যে অন্তর্জালা উপস্থিত হয়, তাহা নিবারিত হয় কি? সকলের সম্মুখে, সকলের চ'খের উপর, একজন লোক চমুষ্টি করিয়া খাইতেছে, ইহা কেমনে সহ্য হইবে? এরূপ কত যে অত্যাচার হইতেছে, কে জানে? ধার্ম্মিকের মনও পরশ্রীকাতরতায় জর্জ্জরিত। হায় রে হায়!!

(২)

এক দিন আমরা আফিসে বসিয়া আছি, এক জন বন্ধু আসিয়া বলিলেন, মহাশয়, শুনিয়াছেন কি, অমুক কাগজের গ্রাহক বৃদ্ধি এবং সর্ব্বত্র প্রশংসা হইতেছে দেখিয়া অমুক কাগজের সম্পাদক নানা রূপ চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে উক্ত কাগজের ক্ষতি হয়। অমুক সম্পাদক অমুকের নামে এবং অমুক অমুকের নামে লইবেল আনিবার জন্য ব্রিফ প্রস্তুত করাইতেছেন। আমরা বলিলাম, আশ্চর্য্য কি? সম্পাদকবর্গের মধ্যে যেরূপ বিদ্বেষানল

* "The net revenue shows an increase of Rs 1 35906 or 2 9 per cent against an increase of 5 per cent in the previous year" Government Resolution on the report of the Board of Revenue on the financial results of the administration of the Income Tax Department for the year 1898—99

প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে, এদেশে এখন সকলই সম্ভব। বলিলাম, পরস্পরের নিন্দা এবং কুৎসা নানা সংবাদ পত্রে এরূপ ভাবে প্রকাশিত হইতেছে যে, তাহা পাঠ করিলে লজ্জায় মুখ অবনত করিতে হয়। এক এক সময়ে ইচ্ছা হয়, এই সকল চিত্র দেখিতে না পাইলেই ভাল হইত। কাহারও ভাল কাহারও যেন সহ্য হয় না! দেশের কি শোচনীয় অবস্থা। যাঁহারা দেশকে উদ্ধার করিবেন, তাঁহারা নিজেরাই বিদ্বেষ-কলুষ-বিষের জ্বালায় অস্থির। হায়, সম্পাদক গণ যখন ডুবিতেছেন, এ দেশের আর আশা কোথায়? দেশকে জাগাইবে কে? একজনের উন্নতিতে দশ জনের অন্তর বিষে জর্জ্জরিত। কি শোচনীয় অবস্থা!!

(৩)

এক জন ব্যক্তি ইণ্ডিয়া ক্লবে একদিন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রশংসা করিতেছিলেন, আর এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তদুত্তরে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

"আপনি আর লোক দেখেন না! ঐ লোকটী বড় এবং ভাল কিসে? তাঁহার বাড়ী দেখেন, গাড়ী দেখেন, কিন্তু তিনি ঋণে ডুবিয়া আছেন। আমরা বিশেষরূপ অবগত আছি, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য ৪।৫ জন লোক চেষ্টায় রত হইয়াছেন, অধিক দিন আর তাহাকে মাথা তুলিয়া থাকিতে হইবে না। সৎলোক ত ভাবি, আপনি কি অমুককে চিনেন না, অমুককে চিনেন না, তাঁহারা কত ভাল লোক। আপনার ঐ প্রসংশিত লোক তাঁহাদের পদধূলিরও অযোগ্য।"

(৪)

পুরুষোত্তমে এবার একটা বিষম ঘটনা ঘটিয়াছে। সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পুরীতে বাস করিতেছিলেন। লোকের উপকার করা তাঁহার নিত্যব্রত ছিল। নানা সৎকার্য্যে লিপ্ত থাকায় তাঁহার প্রশংসা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছিল। লোকেরা তাঁহাকে খুব মানিত, খুব শ্রদ্ধা করিত। ইহা কি লোকের প্রাণে সহ্য হয়? তাহারা প্রথমত নানা উপায়ে লোকের মনে বিরক্তি জন্মাইতে চেষ্টা করিল। অকৃতকার্য্য হওয়ায়, নানারূপ অনিষ্টের চেষ্টায় রত হইল। তাহাতেও অসমর্থ হওয়ায়, শেষে তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করিল। বিষ প্রয়োগের কিয়দ্দিবস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জনরব এইরূপ, ঐ বিষ প্রয়োগের ফলেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে!!!

যে কয়েকটী কথা লিখিলাম, সে সকলই সত্য ঘটনা। এরূপ ঘটনা যে

কত ঘটিতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না, সকলেই দুই একটী এরূপ ঘটনার উল্লেখ করিতে পারেন। আমরা কয়েকটী ঘটনার কেবল আভাষ দিলাম মাত্র।

অহঙ্কারকে আচার্য্যগণ মানুষের প্রধান অনিষ্টকারক বৃত্তি মনে করেন, আমাদের বিবেচনায়, পরশ্রীকাতরতা তাহাপেক্ষা কিছুতেই কম নয়। অহঙ্কার যদি হয় বড় ভাই, পরশ্রীকাতরতা তবে ছোট ভাই; দুই ভাই, পাশাপাশী, উভয়ই বিষে ভরা। দেবপুরে দৈত্যের লীলা দেখিতে চাও, পৃথিবীতে অহঙ্কার এবং পরশ্রীকাতরতার লীলা খেলা দেখ। এ বলে, আমাকে দ্যাখ্, ও বলে আমাকে দ্যাখ্। অহঙ্কার মানুষকে আত্মহারা করে, পরশ্রীকাতরতা মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে, এক বলে,—"আমার সমান কেহ নাহি ত্রিভুবনে," অন্য ঘোষণা করে, "অন্যকে কিছুতেই বড় হইতে দিব না।" এই দুই দৈত্যের প্রকম্পে পৃথিবী অস্থির, টলটলায়মান। হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, এই দুইয়ের নিত্য কার্য্য, মামলা মকদ্দমা, অত্যাচার, অবিচার, এই দুইয়ের দৈনিক ক্রীড়া।। সংসার এই দুইয়ের অত্যাচারে সদা প্রকম্পিত। মানুষকে এই দুই অবতার দাসানুদাস করিয়া জগতে কি পশুর অভিনয়ই দেখাইতেছে।।

মানুষ, এক ঈশ্বরের সন্তান, ভাই ভাই, ধর্ম্মোপদেষ্টা, তুমি কি এই কথা বলিতে চাহ? মুখে বলিলে বলিতে পার, কিন্তু তোমার কাজ অন্য প্রকার। যদি তুমি মানুষকে ভাই মনে কর, তবে অন্য সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিতে, অপদস্থ করিতে সদা তোমার মনে ইচ্ছা কেন? বিধাতা তোমাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেও উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন। তুমি তাহার কথা, তাহার উন্নতি, তাহার প্রশংসা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান কর কেন? পরিণাম তোমারও যাহা, তাহারও তাহাই,—অলক্ষিত, উপেক্ষিত, অনির্দ্দিষ্ট অন্ধকারময় ঐ নিভৃত শ্মশান এবং ঐ শ্মশানের ভস্মরাশি। কেন তোমার মনে পঙ্কিলতা, আবিলতা, কেন রক্ত পানের অপবিত্র চিন্তার উদয় হইতেছে? পৃথিবীর ঝগড়া, বিবাদ সমাজদ্রোহ, আত্মকলহ, সকলই অহঙ্কার এবং পরশ্রীকাতরতার লীলা। দস্যুর অত্যাচারে এই ধরা সদা অস্থির। হায়, সদা বিমলিন!

দেখিয়া শুনিয়া পৃথিবীকে যেন ধর্ম্ম সাধনের অযোগ্য স্থান বলিয়া মনে হয়।

এই জন্যই বুঝিবা, প্রাচীনকালে, ধর্ম্মার্থীগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া গহন বনে গমন করিতেন। মানুষ প্রতিনিয়ত ঘটনা, অবস্থার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। হিংসা দেখিলে হিংসার উদয় হয়, ক্রোধ দেখিলে ক্রোধের উদয় হয়, পরন্তু দয়া দেখিলে দয়া, পবিত্রতা দেখিলে পবিত্রতার উদয় হওয়া সম্ভব। আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক, সংসারকে ধর্ম্মসাধনের উপযোগী মনে করিতাম এই জন্য যে, এখানে দয়া আছে, পবিত্রতা আছে। লোকেরা বলে, অন্যদিকে হিংসা, বিদ্বেষ, পাপও আছে। আমরা বলিতাম, থাকে থাকুক, হংসের ন্যায় অসার পরিত্যাগ করিয়া সার গ্রহণ করিব। সুধার ধারে বিষ, কমলে কণ্টক দেখিয়া আমরা মনে করিতাম, বিষ পরিত্যাগ করিয়া, কণ্টক উপেক্ষা করিয়া সুধা ও কমলের সাহায্যে মনুষ্যত্ব লাভ করিব। কিন্তু সুধার চিত্র, পুণ্য পবিত্রতা, দয়া দাক্ষিণ্যের অনাবিল চিত্র, এই নির্ম্মম সংসারে বুঝিবা দিন দিনই বিরল হইতেছে। আদর্শের কাঙ্গাল আমরা, আদর্শ পাই না—শত তপস্যায়ও আদর্শ ধরিতে পারি না। একথা সরলভাবে ব্যক্ত করিলে তুমি বিরক্ত হও, সে চটিয়া যায়। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা আদর্শ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তুমি দেখ না, ইহা তোমারই চক্ষের দোষ। হায়রে জগতের লীলা। ব্যভিচারী বলেন, তিনি আদর্শ, মদ্যপায়ী বলেন, তিনি আদর্শ, প্রতারক বলেন, তিনি আদর্শ; নরহন্তা মনে করেন, তিনি আদর্শ।। আদর্শ এই ধরার ছোট বড় যেন সকলেই। "আদর্শ না ধরিতে পারিয়া ভ্রমান্ধ ধর্ম্মার্থীগণ সেকালে, বৃথা, সংসার পরিত্যাগ করিতেন, এ যুগেও বৃথা চিৎকার উঠিতেছে।"—এইরূপ কথা যাহারা বলেন, তাঁহাদিগকে আমরা আর কি বলিব? বহু বৎসর তর্ক করিয়াও বুঝাইবার শক্তি নাই। তবে একটী কথা এই বলি, যদি আদর্শময় এই জগৎ, তবে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরি, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, মামলা মকদ্দমা, ব্যভিচার মদ্যপান কমে না কেন? এক জনের পতনে অন্য নৃত্য করে কেন? একজনের উন্নতিতে অন্য বিষণ্ণ হয় কেন? আদর্শ যদি সর্ব্বত্রই, মানুষ সৎ হইয়া ধরাকে স্বর্গে পরিণত করেনা কেন? ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কেন? যদি বল, এই ধরা ত স্বর্গ আছেই, যদি বল, দিন দিনই জগতের উন্নতি হইতেছে, দিন দিনই মানুষ উন্নতি লাভ করিতেছে। তবে আমরা নিরুত্তর। বলিব কি? বলিবার আর কথা নাই।

পাশ্চাত্য জগতে এক শ্রেণীর লোক ঐহিক সুখকেই সর্ব্বাপেক্ষা আদরের

বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, এবং তাহা লাভের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা অবলম্বন করাকেই এক মাত্র পৌরুষ মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ধর্ম্ম মিথ্যা, পরকাল কল্পনা, পুণ্য পবিত্রতা নামক কোন জিনিস এ জগতে নাই, সে সকল কেবল মানুষের দুর্ব্বলতা মাত্র, সে সকল মানুষের বিভীষিকা হইতে উৎপন্ন, সত্য—চিরসত্য—কেবল ঐহিক সুখ। এই শ্রেণীর লোক, কথায় সর্ব্বত্র আদৃত নয় বটে, কিন্তু কাজে পৃথিবী ব্যাপিয়া এই শ্রেণীর মতই দিন দিন বিঘোষিত এবং আদৃত হইতেছে। নির্হিলিষ্ট, সোসিয়ালিষ্টগণ বাহিরে নিন্দিত, কিন্তু তুমি, আমি, বুঝিবা সকলেই কোন না কোনরূপে তাহাদের মতানুসরণ করিতেছি। ধর্ম্মের চিন্তা মানুষকে যদি না করিতে হয়, তবে আর তার ভয় কি? নরহত্যা পাপ নয়, পরের অনিষ্ট পাপ নয়, পরনিন্দা পাপ নয়। মিথ্যা পাপ নয়, ব্যভিচার পাপ নয়, প্রতারণা পাপ নয়, পরপীড়ন পাপ নয়। আমাকে রাখিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা করিতেই যেন আমি অধিকারী। ধর্ম্মের চিন্তা না থাকিলে মানুষকে এইরূপ হেয়, ঘৃণিত, অসার মত সকল পোষণ করিতে হইবেই হইবে। আমরা নিন্দার ভয়ে, মুখে এ সকল কথা বলি না বটে, কিন্তু আমাদের কাজ প্রতিনিয়ত প্রতিপন্ন করিতেছে, ধর্ম্ম জগতে কল্পনা, সত্য,—পরনিন্দা, বিদ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, পরপীড়ন, পর-দলন, এবং বিমল স্ব-প্রতিষ্ঠা, স্ব-রক্ষা, স্ব নামক পদার্থের উন্নতি সাধন। তোমাকে না ডুবাইলে আমার "স্ব" প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত হয়, আমি তাহা সহিতে পারি না, তোমাকে স্থানান্তরিত করিবই করিব। অক্লেশে, অনায়াসে না পারি, সে জন্য রক্তারক্তি করিব। পৃথিবীর ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস পাঠ কর—দেখিবে, এই রক্তারক্তির কাহিনীতে তাহা পূর্ণ। সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস পাঠ কর—দেখিবে, সেখানে এই রক্তারক্তির কাহিনী, আর রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস পাঠ কর—সেখানে আর কিছুই নাই কেবল রক্তারক্তি, কেবল যুদ্ধ, কেবল "স্ব" প্রাধান্য" প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা। এই "স্ব" প্রতিষ্ঠাকেই মহাত্মা পেন্সার বলেন, যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা—(Survival of the fittest) "স্ব"—"স্ব"—"স্ব", অহঙ্কার বিউগেল বাজাইয়া নিত্য ঘোষণা করে এই কথা, পরশ্রী-কাতরতা-সৈন্য অগ্রসর হইয়া অন্যের মস্তক বিচূর্ণিত করিয়া প্রতিষ্ঠা করে—"স্ব", "স্ব" "স্ব"। একজন কম্যাণ্ডার, আর একজন সৈন্য, একজন আদেষ্টা, একজন কার্য্যকারক। "স্ব"-প্রতিষ্ঠা রাজ্যের এই দুই প্রধান সৈন্যের

আধিপত্যে জগৎ অস্থির। ধর্ম্ম বল, পরকাল বল, পুণ্য বল, পবিত্রতা বল, এ সকলের জীবন্ত আদর্শ এই জগতে সব সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় কি? যদি পাওয়া যাইত, খ্রীষ্টের ক্রুশ-কাষ্ঠে দেহত্যাগ হইত না, খ্রীচৈতন্য অজ্ঞাতে পুরুষোত্তমে জীবন হারাইতেন না,—আর বলিব কি, এই সভ্যতার যুগে পুরীতে বিজয় কৃষ্ণ প্রাণ হারাইতেন না। এক কথায়, পৃথিবী এত অশান্তি-ময় হইত না। লোকেরা বলে, সভ্যতার যুগে জগতে শান্তি এবং প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু হায়, যাহাদের চক্ষের সমক্ষে, চীনের লাঞ্ছনার একশেষ হইতেছে, মেহেদের বংশ নির্বংশ হইতেছে, এবং সমাধির শান্তিময় ক্রোড়েও মেহেদির অস্থি শান্তিতে থাকিতে পারিল না, তাহারা কেমনে বলিবে যে, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইতেছে? চিরশান্তিপ্রিয় আমেরিকা আজ স্পেন-দর্প খর্ব্ব করিতে নর-শোণিত ধারায় ধরাকে ভাসাইলেন যাহাদের চক্ষের সমক্ষে, তাহারা শান্তির কুহক জাল বিস্তারের বাক্যবিন্যাস ছটায় ভুলিতে পারে না। না—সত্যই পৃথিবী দিন দিন অশান্তিতে, অপ্রেমে পূর্ণ হইতেছে। গৃহে অশান্তি, সমাজে অশান্তি, দেশে অশান্তি, রাজ্যে অশান্তি। অশান্তি—ধর্ম্মমন্দিরে, নেতার হৃদয়-কন্দরে, সংস্কারকের জীবন-মন্দিরে। যতদিন অহঙ্কার এবং পরশ্রীকাতরতা, ততদিন অশান্তি, অশান্তি, কেবল অশান্তির রাজ্যই বিস্তৃত হইবে। তুমি হাজার বক্তৃতা কর, হাজার লেখ, নিহিলিজম্ জগতে জয় লাভের জন্য গগনে মস্তক তুলিয়াছে,—ধর্ম্ম ম্লান, পুণ্য নিষ্প্রভ, পবিত্রতা নিরুদ্দেশ। অশান্তি, অশান্তি, অশান্তির আগুন চতুর্দ্দিকে প্রজ্জ্বলিত। এ অগ্নি নির্ব্বাণ করিবে কে? শাক্যমুনির নির্ব্বাণ মন্ত্রের পুনরুত্থান ভিন্ন উপায় নাই, উপায় নাই। আর কিছুই ভাল লাগে না, নির্ব্বাণের জন্য এখন অপেক্ষা করিতেছি। মহাশ্মশানের আগুনে এদেশ পুড়িয়া যাক্ না কেন?

আশ্বিন, ১৩০৬।

কি লিখিব?

কোন এক সভার কার্য্যবিবরণে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এই কয়েক পংক্তি লিখিত হইয়াছিল,—

"প্রজারা ঋণে ডুবিয়াছে, জমিদারের খাজনা বন্ধ, ভাদ্র মাসে এক টাকার সুদে দুই কাঠা ধান দিতে হইবে, এই কবারে অনেক টাকা ঋণ করিয়াছে। মহাজনের গৃহ তাহা পিত্তল,

রূপা সোণায় পূর্ণ। এরূপ শোচনীয় অবস্থা যে, অনেক পরিবারের পুরুষ, স্ত্রী ও পুত্র কন্যা ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে, অনেকে ভিটা ছাড়িয়াছে, অনেক মা, কন্যা ফেলিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে মানুষ বিক্রয়ের কথাও শুনা গিয়াছে।"

একজন উকীল এই অংশ রিপোর্ট হইতে তুলিয়া দিতে প্রস্তাব করেন, এবং আর একজন উকীল তাঁহার পোষকতা করেন। তাঁহারা বলেন, যে দিন কাল পড়িয়াছে, এরূপ লেখায় রাজা বিরক্ত হইতে পারেন, সুতরাং কাজ কি গোলে, এ অংশ তুলিয়া দেওয়া হউক।

উকীলগণ আইন কানুন জানেন, সুতরাং তাঁহাদের ভয়ের কারণ যথেষ্ট আছে। এইরূপ লেখাতেও যদি রাজার অসন্তোষের কারণ হয়, তবে আর আমাদের কাগজ লিখিয়া ফল কি? সত্য কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতে হইবে, প্রতি পদে পদে ভয়ে ভয়ে চলিতে হইবে, দেশের অবস্থা যদি এরূপ শোচনীয় হইয়াই থাকে, তবে ভারতবর্ষের সকল পত্রিকা তুলিয়া দেওয়া উচিত কি? অথবা কারাদণ্ড বা নির্ব্বাসনের ভয় না করিয়া নির্ভীকতার সহিত সত্য কথা বলা উচিত? একথার একটা মীমাংসা হওয়া ভাল।

ভারতবাসী ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের একান্ত পক্ষপাতী। সে এই জন্য যে, আর কোন গবর্ণমেন্টই স্বাধীনতার এমন পরিপোষক নন্। গবর্ণমেণ্ট কি কারণে যে, রজ্জু দৃষ্টে সর্প ভ্রমে পতিত হইয়া, ভারতে যাহা কখনও ঘটে নাই, এমন সকল ঘটনার অবতারণা করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। চুজ্জন গবর্ণমেণ্ট কেন ভীত হইয়া পদে পদে বিভীষিকা দেখিতেছেন, কে জানে? বোধ হয় যেন, দূরদর্শী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান লোকের সংখ্যা মন্ত্রী-সভায় হ্রাস হইয়াছে, নচেৎ ভারতবর্ষের ন্যায় রাজভক্ত প্রদেশে "রাজ-বিদ্রোহের আইনানুসারে কেন কার্য্য আরম্ভ হইল? আমরা ভাবিয়া আকুল হইয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। * বর্ত্তমান সময়ে ভারত-

---

* রাজাবদ্রোহ আইনে এই কয় জন ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত অভিযুক্ত হইয়াছেন। (১) মার হাট্টা ও কেশরী সম্পাদক মাননীয় তিলক। (২) বৈভব-সম্পাদক মিঃ কেলকার (৩) ইস লামপুরের প্রকাশিত প্রতোদ সম্পাদক রামচন্দ্র নারায়ণ কসলকার (৪) ওয়াই নগরে প্রকাশিত মধ্যবৃত্তসম্পাদক কাশীনাথ শাস্ত্রী (৫) মুরদাবাদে প্রকাশিত "জমা উল উলম" সম্পাদক অম্বপ্রসাদ। প্রতোদের সম্পাদকের যাবজ্জীবন দীপান্তর এবং সম্বাধিকারীর ৭ বৎসর কারা-দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বর্ষের যে অবস্থা, তাহাতে রাজ-বিদ্রোহ একেবারে অসম্ভব। আমরা সামান্য লোক, আমাদের এই ধারণা। প্রবল পরাক্রান্ত গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী-সভায় কত প্রবীণ, বিজ্ঞ, তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা যে কেন প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন না, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমরা ব্যথিত এবং চিন্তিত হইয়াছি। ভয় করিবার কি আছে?

গোখলে এবং ভবনগরীর ন্যায় কাপুরুষ, অন্ধবিশ্বাসী, অসহিষ্ণু এবং অকৃতজ্ঞ লোক যে দেশে বহু আছে, সে দেশে গবর্ণমেণ্টের ভীত হইবার কারণ নাই। ভারতবাসী এত ভীত ও কাপুরুষ যে, গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিত মাত্রে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সত্য রক্ষার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে যতদিন ভারতবাসী না শিখিবে, ততদিন গবর্ণমেণ্টের কোন ভয়ের কারণ নাই। ভারতবাসীর সাহসের কথা মনে হইলে, আমাদের হাসি পায় এবং একটী গল্প মনে পড়ে। গল্পটী এই—"এক সময়ে একজন ইংরাজ দেখিয়া একজন লোক খুব আস্ফালন করিয়া বলিতেছিল, 'আমি কি সাহেব দেখিয়া ডরাই? কাছে আসিয়া অত্যাচার করিলেই দেখাইব।' সাহেব যখন ঘুসি তুলিয়া ঐ লোকের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন সাহসী ব্যক্তি দৌড়াইয়া পলায়ন-তৎপর হইয়াছে দেখিয়া লোকেরা বলিল, 'কেমন, এখন পলাচ্ছ কেন?' সাহসী ব্যক্তি ফিরিয়া বলিল—'পলাইব না কি সাহেবকে দেখিয়া ভয় করিব?' গোখলের আস্পর্দ্ধা ও আস্ফালন এবং পরে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার সহিত এই গল্পটীর খুব সাদৃশ্য আছে। গোখলে এবার ভারতের যে অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহা স্মরণে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। তাঁহার ধৃষ্টতা ও কাপুরুষতায় জাতীয় মহা-সমিতির সকল চেষ্টা ও উদ্যমের ফল ব্যর্থ হইয়াছে, মনে হয়।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভারতের অনেক লোকই কি গোখলের ন্যায় নহে? বীর্য্যবান, সত্য ও ন্যায়পরায়ণ ধর্ম্মবীর এদেশে বিরল নহে কি? ধর্ম্মবীর ভিন্ন কি কোন দেশের কখনও স্থায়ী অভ্যুত্থান হইয়াছে? ধর্ম্ম ভিন্ন জগতের অভ্যুত্থান যে অসম্ভব, ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিতে বর্ত্তমান। ধর্ম্মের উন্নতি এবং অবনতির সহিত পৃথিবীর জাতি সাধারণের উন্নতি এবং অবনতি হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম, মুসলমান-ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। ভারতবর্ষে ধর্ম্মের উন্নতি নাই। ধর্ম্মের উন্নতি ভিন্ন

রাজনীতির আন্দোলন, স্বেচ্ছাচার বিশেষ। ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লাভ করা অসম্ভব। এক কথায় বলিতে পারি, ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তার হইতেছে, জ্ঞান বিস্তার হইতেছে, আন্দোলন হইতেছে, সবই সত্য; কিন্তু এক ধর্ম্মের অভাবে এ দেশের লোকের চরিত্রলাভে অনেক বিলম্ব আছে,—এক ধর্ম্মের অভাবে এ দেশের এক-জাতিত্ব গঠনে অনেক বিলম্ব আছে। ধর্ম্ম এদেশে যতদিন পুনরুত্থিত না হইবে, ততদিন গবর্ণমেণ্টের আশঙ্কার কোন কারণ নাই। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, ভারত ততদিন মৃত, নির্জ্জীব, অসহায়। এ ভারতে ধর্ম্মের যেরূপ হীনাবস্থা দেখিতেছি, কখনও ভারতের জীবন লাভ হইবে কি না, সন্দেহ। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের ভয়ের কোন কারণ নাই। সন্তানকুল, প্রজাকুল চিরদাসত্বে নিমগ্ন—ধর্ম্মহীন, চরিত্রহীন, পশুবৎ। গবর্ণমেণ্টের কোন ভয়ের কারণ নাই।

আর আমাদেরই বা ভয়ের কারণ কি আছে? ভারতবাসী দাস, গবর্ণমেণ্ট প্রভু, আমরা প্রজা, গবর্ণমেণ্ট রাজা, আমরা দুর্ব্বল, গবর্ণমেণ্ট সবল। আমাদের ভয় কি? কথায় বলে, "যাহার সমুদ্রে শয্যা, তাহার শিশিরে ভয় কি?" আমরা রাজার বলে বলীয়ান, আমরা রাজার শক্তিতে শক্তিমান। আমরা একটু যদি মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইয়া থাকি, বলিতেই হইবে, যে কারণেই হউক, তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের দ্বারা হইয়াছে। বলিতে, কহিতে, লিখিতে যাহা শিখিয়াছি, গবর্ণমেণ্টের দ্বারাই তাহা হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে ভারতবর্ষকে গবর্ণমেণ্ট সোণার রাজ্য করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তে শ্মশানে পরিণত করিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে ভারতবাসীকে দেবত্বে উন্নীত করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে অসুরত্বে নমিত করিতেও পারেন। সকলই গবর্ণমেণ্টের প্রসাদাৎ। আমাদের উত্থান বা পতন, সকলই গবর্ণমেণ্টের হাতে। আমাদের জীবন মরণ গবর্ণমেণ্টের হাতে। এহেন প্রবল পরাক্রান্ত গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদিগকে প্রহার করেন, নির্যাতন করেন, আমাদের কহিবার এবং বলিবার আছে কি? কিছুই নাই। এখানে প্রতিযোগীতা নাই, প্রতিদ্বন্দ্বীতা নাই, এখানে ক্ষমতার সংঘর্ষণ নাই,—কিছুই নাই। মনুষ্যের সহিত পিপিলিকার যেমন তুলনা, গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের তেমনি তুলনা। ক্ষমতা পাইয়া যে তাহার অপব্যবহার করে, সহ্য করা ভিন্ন তাহাকে আমাদের বলিবার কি আছে? যাহারা দয়া ও প্রসাদ-ভিখারী, তাহাদের জোর করিবার কি অধিকার? আমাদের

ভয় কি? পিতা মাতা মারিলে, সন্তানের আর কি আবদার করিবার থাকে? ভয় করিতে হয়, বাহিরের শত্রুকে, পিতা মাতাকে ভয় করিলে চলে কি? এখানে কেবল ভক্তি এবং ভালবাসা। এখানে কেবল নীরবতা ও সহিষ্ণুতা। রাজা বা পিতা মাতার দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার হইলে সহ্য করা বই আর গত্যন্তর নাই। যে রক্ষক সেই ভক্ষক হইলে আর রাখিবে কে? আর তুলিবে কে? সুতরাং আমাদের ভয় নাই। আপন জনকে ভয় করিতে নাই। তাহাতে অধর্ম্ম এবং দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। আমাদিগকে ভালবাসিতে বাসিতে, ভক্তি করিতে করিতে নীরবে মরিতে দাও। ভয় করিব কেন? মহাত্মা বিদ্যাসাগর বলিতেন—"দৈনিক দুমুষ্টি তণ্ডুলে যে জীবন ধারণ হয়, তাহার জন্য আর চিন্তা কি?" আমাদের মনে হয়, যে জীবনে জগতের কোন কাজ হয় না, সে জীবনেই বা কাজ কি, সে জীবনেরই বা মায়া কি? মৃত্যু, সকলেরই লক্ষ্য। কর্ত্তব্যপালন, মানবজীবনের এক মাত্র লক্ষ্য। যে জীবন কর্ত্তব্য পালনে অসমর্থ, তাহার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়। আমরা যদি বাচিয়া কর্ত্তব্য-পালন করিতে না পারি, তবে মরিতে ভয় কিসের? নির্ব্বাসন, কারাদণ্ড, তাহা ত কিছুই নয়। দেশের সেবা করিয়া যদি কেহ নির্যাতন ভোগ করে, হিতৈষীর তাহা অঙ্গের ভূষণ। পৃথিবীর কোন মহৎ কাজ, আপন অনিষ্ট না করিয়া, কেহ সাধন করিতে পারে নাই। মানব-রক্তে মানব-গোষ্ঠীর উৎপত্তি। জীবন ঢালিলে তবে নব জীবনের উত্থান হয়। আমাদের ন্যায় অধম জনের জীবন-পাতে যদি এ দেশের নবজীবনের ভাবী কারণ প্রস্তুত হয়, আনন্দের সীমা নাই। ভয় কিসের? সে কাপুরুষ, যে সৎকাজ করিয়া নির্ব্বাসন, কারাদণ্ড বা মৃত্যুকে ভয় করে?

৩১শে আগষ্টের (১৮৯৭) অমৃতবাজার পত্রিকায় পাঠ করিতেছিলাম যে, বিলাতের কোন মহাশয় লোক বর্ত্তমান আন্দোলনের সময় কংগ্রেস নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। ঐ পত্রের মন্তব্যে অমৃতবাজার বলেন—

"Our correspondent justly remarks that the Congress party in India utterly failed in their duty at this crisis It was not necessary for them to hold indignation meetings that was not at all needed But a public meeting might have been held at each of the three Presidency towns, to explain the real situation to Government"

The Amrita Bazar Patrika, August 31, 1897.

এ সম্বন্ধে একদিন একজন বিখ্যাত সম্পাদকের সহিত এবং আর এক দিন একজন বিখ্যাত লেখকের সহিত আমাদের কথা হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয়, কলিকাতার কংগ্রেস-পাণ্ডা-দিগের অপদার্থতা উল্লেখ করিয়া বড়ই আক্ষেপ করিয়াছিলেন। লেখক বলিয়াছিলেন, "আইনানুসারে বিচার হইতেছে, এ অবস্থায় সভা করা চলে কি ?" আমরা বলিয়াছিলাম, 'নাটুভ্রাতাদিগকে কোন্ আইনানুসারে ধৃত করা হইয়াছে ? এ সম্বন্ধে আন্দোলন চলে না কি ?' তিনি বলিলেন, "তাহা চলে।" কিন্তু সভা হয় না কেন, এ সম্বন্ধে তিনি আর কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। আমরা আন্দোলনের পক্ষপাতী নহি, আমরা কাজের পক্ষপাতী। যে জাতির লোকেরা তিলককে চাঁদা দিয়া সাহায্য করিতে ভীত হয়, সে জাতি মহা আন্দোলনেও যে জাগিবে না, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। জীবিত মানুষ আন্দোলনে জাগিতে পারে, মৃত মানুষ জাগিবে কিরূপে ? এ দেশে জীবিত মানুষ নাই। যে দেশের নরনারী ধর্ম্মহীন, চরিত্রহীন, তাহাদিগকে আমরা জীবিত বলি না। আন্দোলনে কিছু হইবে না, জানি। কিন্তু আন্দোলনে ভারত জাগিবে, যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা আজ নীরব ও নিশ্চেষ্ট কেন ? আজ তাঁহাদের সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না কেন ? নির্ব্বাসনের ভয়ে কি সকলে আজ মূক। এ দেশের সকল নেতাই কি "ধাই-কিরি" দলের লোক ? পূর্ব্বে জানিতাম, বাঙ্গালী এমন এক জাতি, যাহাদের এক জনকে প্রহার করিলে অন্যে হাসে। বাস্তবিক, এত আন্দোলনের পর, ভারতবর্ষও কি এই অবস্থায় আসিয়াছে যে, যে যার প্রাণ লইয়া পলায়নে তৎপর ? এ কথা ভাবিতেও কষ্ট পাই। হায়, হতভাগ্য গোখলে, তুমি কি ভারতের কাপুরুষদিগের ব্যক্ত প্রতিমূর্ত্তি ? আজ পুণ্যময়ী রমাবাই ধর্ম্মানুপ্রাণিত জীবন্ত মূর্ত্তিতে সত্য-প্রতিষ্ঠায় বা সত্য ঘোষণায় বদ্ধপরিকর* হইয়া মহিলা-কুলের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিলেন, আর তুমি নরাধম কি অভিনয়ই করিলে ? ইহাই কি জাতীয়তা, ইহাই কি হিতৈষণা, ইহাই কি বীরত্ব, ইহাই কি সাহস ? * বড়ই আশ্চর্য্য যে, গবর্ণমেণ্ট বন্ধুকে সর্পভ্রম করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের কোন ভয় নাই, নিশ্চয় কোন ভয় নাই।

---

*She retorts thus in the *Bombay Guardian* of the 4th instant —
"The managers of the Plague Hospital can deny the thing with impunity, simply because they are in authority, but truth is truth, all

না—এখন বুঝিতেছি, কাজ নাই আর বৃথা আন্দোলনে। নীরবতাই আমাদের পক্ষে সাজে ভাল? যাহাদের প্রাণ নাই, প্রাণে ধর্ম্ম নাই, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা নাই, ন্যায়-জ্ঞান নাই, সত্যপ্রিয়তা নাই,—তাহাদের পক্ষে নীরবতাই ভাল। মৌনব্রত এখন ভারতের মূলমন্ত্র হউক। কাজ কি সে আন্দোলনে, ভাই, যে আন্দোলনের পর মুহূর্ত্তে তুমি পলায়নে তৎপর? কাজ কি ভাই তোমার সে হিতৈষণার, ম্যাজিষ্ট্রেট বা সামান্য একজন কর্ম্মচারীর ভয়ে যাহা মুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হয়? অথবা কাজ কি তোমার দেশসেবার, যাহা সামান্য সম্মান বা উপাধির খাতিরে উপার্জ্জিত? তুমি সামান্য স্বার্থ ভুলিতে পারিলে না, জীবন-মমতা বিসর্জ্জন দিতে পারিলে না, তোমার এ ব্রত লইয়া কাজ কি? নীরব হও, সংযত হও, বিনীত হও। বহু যুগব্যাপী তপস্যার পর তবে ভারত জাগিবে। এখন ভারতকে নীরবে ঘুমাইতে দেও। একটী, একটী করিয়া পাঁচটী মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে ভয় কি? শতটী হউক, ক্রমে সহস্রটী হউক—ক্রমে লক্ষটী হউক—ক্রমে অত্যাচারের উষ্ণ শলাকা সকলের দেহে বিদ্ধ হউক, তখন মানুষ স্বার্থ ভুলিতে পারিবে, পরার্থ শিখিতে পারিবে, ধর্ম্ম কি, লক্ষ্য কি বুঝিবে, তখন ভারত জাগিবে, তখন ভারতে আন্দোলন উঠিবে। এ যুগে নীরবে সকলে ঘুমাও। "খাই-কিরি" দলের জয় জয়কারে দেশ গৌরবান্বিত হউক—আকাশ কম্পিত হউক। সকল লেখাপড়া এখন বন্ধ থাকুক।

ভাদ্র, ১৩০৪।

---

the high authorities in the world will not silence it Cain denied having killed his brother, but God declared that the blood of the innocent brother, which Cain has shed, cried unto Him from the ground, so the blood of my girl will cry unto him who is the 'father of the fatherless and the Judge of the widow Neither the Governor nor the manager of the Plague Hospital are able to shut the eyes of Him who is the searcher of all hearts * * *

Still I do not for a moment think of withdrawing my statement concerning her and the general management of that Hospital I cannot deny what my eyes saw and ears heard even though the *Governor of Bombay and the powers of this world may declare it untrue*"

Amrita Bazar Patrika, Sep 10, 1896

অনুকরণে বিষপান।

চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে একবার কোল জাতির রাজধানী রাঁচি সহরে গিয়াছিলাম। মদের দোকানে বসিয়া যে সকল কোল মদ্যপান করিতেছিল, সেই সময়ে একদিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোমরা মদ্যপান কর কেন? এই বিষপানে তোমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে, এবং হইবে, ইহা পরিত্যাগ কর।" ইহার উত্তরে তাহারা বলিয়াছিল,—"এখানকার বাবুরাও মদ্যপান করেন, সুতরাং ইহা ভাল কাজ।" এই সর্ব্বনেশে যুক্তির কথা শুনিয়া প্রসঙ্গক্রমে একদিন সেখানে বক্তৃতায় বাঙ্গালী বন্ধুদিগকে সতর্ক করিয়াছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—"ইহাদের প্রকৃতিই এইরূপ, বাঙ্গালীর অনুকরণের জন্য ইহারা মদ্যপান করে না;— অনুকরণে ইহাদের কোন পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই।" চতুর্দ্দশ বৎসর পর এবার আবার রাঁচি গমন করিয়াছিলাম। বাঙ্গালীর অনুকরণে কোল জাতির জীবনে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে ডুবিয়াছিলাম।

২।৪ দিন কোন স্থলে বাস করিয়া যদি কোন দেশের অবস্থা কতক জ্ঞাত হইতে কেহ ইচ্ছা করেন, তবে হাট বাজারে গমন করিলেই সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। দেশের নরনারীর প্রকৃতি, স্বভাব, অবস্থা, দেশের উৎপন্ন, অন্তর এবং বহির্ব্বাণিজ্য তত্ত্ব, সমস্তই ইহাতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। আমরা ২।৪ দিনের জন্য কোন স্থলে যদি যাই, অগ্রে হাট বাজার দেখি। রাঁচি সহরে একটী বড় হাট আছে, সপ্তাহে দুইবার সে হাট বসে। এখানে বহুদূর হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। দশ, পনর হাজার কোলও কখনও কখনও সমাগত হয়। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে রাঁচির হাটে যাইয়া দেখিয়াছিলাম, কোল রমণীগণ প্রায় উলঙ্গবেশে হাটে আসিত, কটিদেশে কেবল একটু কাপড় জড়ান থাকিত, কিন্তু কি যুবতী, কি বৃদ্ধা সকলেরই বক্ষ অনাবৃত থাকিত। এবার ১৪ বৎসর পরে রাঁচির হাটে যাইয়া একটীও অনাবৃত-বক্ষ স্ত্রীলোক দেখিলাম না। বাঙ্গালীর রমণীর ন্যায় সকলেই বস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। দেখিয়া যে কি আনন্দ হইল, বিধাতাই জানেন। বাঙ্গালীর চরিত্রানুকরণের স্রোত কি তীব্র বেগে দেশে প্রবাহিত হইতেছে। হায়, বাঙ্গালীর চরিত্রহীনতাও কি অসভ্যদিগের মধ্যে সেইরূপ সংক্রামিত হইতেছে? তাহারও পরিচয় পাইয়া অনেক স্থলে বিষম আঘাত পাইয়াছি।

যে কারণেই হউক, বাঙ্গালীর আচার, ব্যবহার ও চরিত্র—আজ কাল ভারতের অনেক স্থলের আদর্শ হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালীর দায়িত্ব দিন দিন বড় গুরুতর হইয়া উঠিতেছে।

মহাত্মা ৺ রাজনারায়ণ বাবু কথা প্রসঙ্গে এক দিন বলিয়াছিলেন—"আজ কাল ইংরাজের অনুকরণে এদেশে যেমন চা পান চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ইংরাজি শিক্ষার প্রথম যুগে ঐরূপ মদ্যপান চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। এখন পাঁচ বন্ধু মিলিয়া যেমন সকালে চা পান করে, এক সময়ে আমরা ঐরূপ মদ্যপান করিতাম। শেষে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। হায়, চা-পান কি সমভাবেই চলিবে।"

ভারতের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা লর্ড কর্জ্জন বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে একদিন চা-করদিগকে বলিয়াছেন যে, 'চায়ের কাটতির জন্য বিদেশের দিকে না চাহিয়া, এই ভারতবর্ষে যাহাতে চায়ের খরিদদার বাড়ে, তজ্জন্য চেষ্টা করা হউক।' এই প্রস্তাবের পর বণিকমহলে বিশেষ আয়োজন হইতেছে। যাহাতে, কেরোসিন তৈলের ন্যায়, চা ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হয়, বিপুল ভাবে তাহার আয়োজন হইতেছে। ইউল কোম্পানি সর্ব্বস্থানে এক পয়সা মূল্যের চা-প্যাকেট বিক্রয় করিতেছেন। আফিং-বাণিজ্যের কূট নীতিতে চীনের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, মহা গৌরবান্বিত চীন আজ সকলের পদতলে পতিত। ইংরাজ ভারতকে স্বাধিকারে রক্ষা করিবার যেন কোন উপায় পাইতেছেন না, গবর্ণমেণ্ট, প্রকারান্তরে এই উষ্ণ ভারতকে শীতপ্রধান দেশের পানীয় সুরা ও চা-পান করাইয়া, স্নায়ুকে নিস্তেজ করিয়া, চীনের ন্যায়, হীনতেজ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিতে ইচ্ছুক। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান জাতি, কিন্তু এই বাঙ্গালীর মধ্যে ইংরাজের অনুকরণে দিন দিন চা-পান যেরূপ বিস্তৃত হইতেছে, এবং বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার দিন দিন যেরূপ ভাবে চতুর্দ্দিক অনুকরিত হইতেছে এবং লর্ড কর্জ্জনের ইঙ্গিতে, এদেশের ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় চা-প্রচারের জন্য যেরূপ বিপুল আয়োজন করিতেছেন, আমাদের ভয় হইতেছে, অচিরে, ঘরে ঘরে এই বিষ-পান সংক্রামিত হইবে। শীতপ্রধান দেশের কথা বলিতেছি না, ভারতের ন্যায় গরম দেশে চা-পান বিষপানের ন্যায় অনিষ্টকারী। সঞ্জীবনীতে চা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার একটু আমরা এস্থলে তুলিয়া দিলাম।

"আমাদের দেশজাত চার অধিকাংশই ইউরোপ ও আমেরিকাতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

প্রথম যখন ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে চা প্রেরিত হয়, তখন প্রত্যেক পাউণ্ড ছয় হইতে দশ পাউণ্ড মূল্যে (বর্ত্তমান ৯০ হইতে ১০০) বিক্রয় হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরকে দুই পাউণ্ড দুই আউন্স চা উপহার দিয়াছিলেন, উহার প্রত্যেক পাউণ্ডের মূল্য হইয়াছিল চল্লিশ শিলিং (বর্ত্তমান ৩০,) ইহার পরে আবার পৌণে তেইশ পাউণ্ড চা উপহার দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক পাউণ্ডে পঞ্চাশ শিলিং (বর্ত্তমান ৩৭॥০) পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে গড়ে প্রতি পাউণ্ড আট আনা কি নয় আনার বেশী বিক্রয় হয় না। আমাদের দেশ হইতে ইংলণ্ডেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চা রপ্তানি হইয়া থাকে, তারপরে মার্কিন যুক্তরাজ্যে। ইংলণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তি বৎসরে পাঁচ পাউণ্ড চা খায়। এ বিষয় চীনা-ম্যানরাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, পরে ইংরেজ। ডচেরা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এ বৎসর চার ব্যবসাতে চা-করদিগের বিশেষ লোকসান হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিগত এপ্রিল, মে ও জুন মাসে ইংলণ্ডের জন্য ৮১,২১,৭৪৪ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছে, কিন্তু গত বৎসর এই সময়ের মধ্যে ১,২৫,৫৩,৩৬৯ পাউণ্ড রপ্তানি হইয়াছিল। অনেকে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ব্যবসাদার জাত সহজে ছাড়িবার নয়। সমস্ত চা-কোম্পানী মিলিত হইয়া চার কাট্‌তি বৃদ্ধি করিবার জন্য পরামর্শ ও সংকল্প আঁটিতেছেন। শুনিতে পাইতেছি, পারস্য প্রভৃতি দেশে এজেণ্ট পাঠাইয়া চা বিক্রীর বন্দোবস্ত করা হইবে। আবার শুনিতেছি, দরিদ্র ভারতবাসীকে চা পায়ী করিবার জন্য সমস্ত চা কোম্পানি ছয় লক্ষ পাউণ্ড চা বিনা মূল্যে বিতরণ করিবেন। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। গাঁজা, তামাক, তাড়ি, মদে আমাদের শ্রমজীবীরা দিন দিনই দুর্ব্বল,পরিশ্রম-কাতর, রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে, ইহার উপর আবার চা ব্যাধির আধিপত্য হইলে আমাদের নিম্ন শ্রেণী একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। স্বদেশহিতৈষী প্রত্যেক সম্পাদকেরই ইহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করা উচিত এবং সাধারণ লোকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, চা-পান অভ্যাস করিলে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে।"

কুচবেহারের ভূতপূর্ব্ব সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস গুপ্ত, এম বি, স্বাস্থ্য নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক। কাগজ খানিতে অনেক সারগর্ভ প্রসঙ্গ থাকে। বিনা আড়ম্বরে, নীরবে, এদেশের কিরূপে উপকার করা যায়, "স্বাস্থ্য" তাহার দৃষ্টান্ত। এই স্বাস্থ্যের আষাঢ় সংখ্যায় (১৩০৮) চা সম্বন্ধে একটী ছোট সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি এস্থলে আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

চা

"সভ্যদেশ মাত্রই চার বহুল প্রচলন আছে। দেখা দেখি আমাদের দেশেও দিন দিন ইহার প্রচলন বাড়িয়া যাইতেছে। একটু অবস্থাপন্ন লোকের চা নহিলে চলে না, কাহারও সকালে বিকালে চা চাইই চাই। ভাত রুটি না হইলে বরং এক দিন চলে, কিন্তু চা না হইলে

চলে না। কাহারও আবার ৪।৫ বার চা চলে। বাঙ্গালী বাবুর ত কথাই নাই, হিন্দুস্থানীরাও ঘোর চাপায়ী হইয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজ কাল উড়ে বেহারা, হিন্দুস্থানী চাকরদের মধ্যেও চা চলিতেছে। চার দোষ গুণ উভয়ই আছে।

পরিমিত চা পান করিলে মনে একটা স্ফূর্ত্তি জন্মে, সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও মনের বল বৃদ্ধি পায়, শরীরের জড়তা ঘুচিয়া কার্য্যে উৎসাহ জন্মে। মদ্য বা আফিম সেবনের পর প্রথম উত্তেজনা ঘুচিয়া গেলে যেমন শরীরে একটা দুর্ব্বলতা আইসে, চা পানে সেরূপ হয় না। ইহার সে দোষ নাই। ঔষধরূপে চা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাথা ধরা রোগে, বিশেষ ঐ মাথাধরা যদি স্নায়বিক দুর্ব্বলতাজনিত হয়, চা বিশেষ উপকারী। মাথাধরা নিবারণের জন্য তীব্র চা পান করাই বিধেয়। কালবর্ণের চা অপেক্ষা সবুজবর্ণের চায় অধিকতর উপকার হয়।

পরিমিত চার যেমন গুণ, অপরিমিত হইলে ইহার তেমনি নানা দোষ। অধিক পরিমাণে চা পান করিলে নিদ্রাল্পতা ঘটে, রক্তের গতি বৃদ্ধি করে এবং স্নায়ুমণ্ডলীকে দুর্ব্বল করে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া জন্মে।

কেহ কেহ বলেন, চা দ্বারা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হয় না, চা পানের রীতির দোষেই ডিস্‌পেপসিয়া হইয়া থাকে। অনেকেই খালি পেটে চা পান করিয়া থাকেন। খালি পেটে চা পান করিয়া পরে যাহা কিছু আহার করা যায়, তাহা রীতিমত পরিপাক হয় না। সুতরাং অগ্নিমান্দ্য জন্মে। প্রথমে তরল পদার্থ পান করিলে চর্ব্বণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। চর্ব্বণক্রিয়া সম্যক না হইলে নিয়মিত পরিমাণে গ্যাষ্ট্রিক রস নির্গত হইতে পায় না, স্যালিভাও (লালা) উৎপন্ন হয় না, সুতরাং পরিপাকের জন্য যে দুইটি প্রধান রসের আবশ্যক, তাহার অভাব ঘটে। পরিপাক শক্তি প্রবল থাকিলে যা তা খাইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু পরিপাক শক্তি কম থাকিলে অতি সামান্য বিষয়েও সাবধান হইতে হয়। যাহাদের পরিপাক শক্তি কম, তাহাদের পক্ষে চা পান না করাই ভাল, অন্ততঃ খালিপেটে চা পান করা কোন মতেই উচিত নহে। গরম গরম তীব্র চা পান করা কোন মতেই উচিত নহে, কারণ, চা যত তীব্র হইবে, তাহার অনিষ্টকারিতা শক্তি তত অধিক হইবে। চায় থিয়েন নামে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে, চা অধিকক্ষণ সিদ্ধ হইলে থিয়েনের ভাগ অধিক হয়, কাজেই তাহাতে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

চার সর্ব্বজনিন্ত ব্যবহার দেখিয়া চার উপকারিতা অনুপকারিতা বিষয়ে ডাক্তারগণ ও বৈজ্ঞানিকগণ নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন। ঐ সকল পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়াছে যে, চার দুই প্রকার অনিষ্টকারী বিষ আছে, এক প্রকারের নাম থিয়েন, অপর প্রকারের নাম ট্যানিন। চার শতকরা ৬ ভাগ থিয়েন ও তাহার ওজনের সিকি ভাগেরও অধিক ট্যানিন থাকে।

কাফিতেও থিয়েন ট্যানিন উভয়ই থাকে, তবে চা অপেক্ষা কিছু কম পরিমাণে থাকে।

কোকা ও চকুলেটেও থিয়েনের ন্যায় এক প্রকার অনিষ্টকারী বিষাক্ত পদার্থ থাকে, কিন্তু তাহারও পরিমাণ চার অপেক্ষা অনেক কম।

চা-প্রিয় বাবুরা এ কথা শুনিলে হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু সত্য গোপন করা ত সঙ্গত নহে।

পরীক্ষা করিয়া চা ও কাফি হইতে থিয়েন বাহির করা হইয়াছে। এবং ঐ থিয়েন যে একটী তীব্র বিষ, তাহাও পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে। উপযুক্ত পরিমাণে পান করিলে ঐ বিষে মানুষ ও ইতর জন্তু উভয়েরই মৃত্যু ঘটিতে পারে।

থিয়েন যে ষ্ট্রিকনিয়া জাতীয় বিষ এবং নবাবিষ্কৃত কোকেন বিষের সহিত ইহার যে অনেকটা তুল্যতা আছে, তাহাও পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে। কোকেন নামক বিষ কোকো হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই জন্যই ইহার নাম হইয়াছে কোকেন। এদেশে যেমন চা পানের প্রথা, দক্ষিণ আমেরিকায় সেইরূপ কোকেন পানের প্রথা আছে। আফিম মদিরা বা অন্য যত প্রকার মাদক আছে, কোকেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অহিতকারী।

অনিষ্টকারিতা ও রাসায়নিক সংযোগ বিষয়ে কোকেন বা থিয়েনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ডাঃ এইচ, সি, উড অন্যান্য পরীক্ষকগণ চার থিয়েনের পরিমাণ স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বিষের এক গ্রেণের সাত ভাগের এক ভাগ দ্বারা অতি অল্প সময়ে একটা ভেককে মারা যায়। ৫ গ্রেণ খাওয়াইলে একটী বৃহৎ বিড়ালকে মারা যায়। ষ্ট্রিকনিয়া খাইলে যে সকল উপসর্গ হয়, থিয়েন দ্বারাও সেই সকল উপসর্গ হইয়া থাকে। রোগী দড়কার ন্যায় হাত পা কসিতে থাকে, শ্বাস বন্ধ হইয়া যায় এবং অল্প সময় মধ্যেই হৃদয়ের স্পন্দন রহিত হয়।

চায় শতকরা তিন ভাগ থিয়েন থাকে এবং এক আউন্সে ১৫ গ্রেণ থিয়েন পাওয়া যায়।

এক পাউণ্ড চায় যে থিয়েন থাকে, তাহা দ্বারা ১৫ শত ভেক ও প্রায় ৪০টী বিড়াল মারা যাইতে পারে।

১৫ গ্রেণ থিয়েন পান করিলে মানুষের শরীরে বিপদজনক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তাহার উপর ২।৪ গ্রেণ বাড়াইলেই মৃত্যু সম্ভব। আধ আউন্স তীব্র চার ১ পিয়ালায় প্রায় ৬।৭ গ্রেণ থিয়েন থাকে। অথচ দেখা যায়, অনেকে প্রত্যহ ৬।৭ পিয়ালা চা পান করিয়া থাকেন। ঐ পরিমাণ চায় যতটুকু থিয়েন থাকে, অনভ্যস্ত ব্যক্তি তাহা এককালে পান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ঘটে।

তবে এইরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি চায় এত অধিক বিষাক্ত দ্রবাই থাকিবে, তবে চা দ্বারা সচরাচর বিষক্রিয়া হয় না কেন? তাহার একই উত্তর—অভ্যাস। অভ্যাস সামান্য জিনিষ নহে, যত তীব্র বিষই কেন হউক না, অভ্যাস দ্বারা তাহার অনিষ্টকারিতা শক্তিকে আমরা অনায়াসে কমাইতে পারি। অভ্যাস করিলে হলাহল পানেও আশু অনিষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু তাহার পরিণাম ফল অত্যন্ত মন্দ। অভ্যাস করিলে সর্পবিষ পান করিয়াও অনিষ্ট হয় না, তা বলিয়া কে সর্পবিষ পান করা অভ্যাস করিয়া থাকে?

চা-পানোন্মত্ত বাবুরা এই কথাগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। শীতকালে অতি শ্রমের পর, ঠাণ্ডার দিনে ২।১ পিয়ালা চা পান কর, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু চা না হইলে অন্ন হজম হইবে না, কোন কাজ করিতে পারিব না, আফিম খোরের ন্যায় চার সময় অতীত হইলে হাই তুলিতে থাকিব, স্বাস্থ্যকামী লোকের পক্ষে ইহা কোন ক্রমেই ভাল নহে।" স্বাস্থ্য, আষাঢ়, ১৩০৮।

"স্বাস্থ্য" চায়ের গুণ উল্লেখের সময়ে চাকে মদ্য ও আফিমের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন, চা ঐ দুই জিনিস অপেক্ষা ভাল। ইংলণ্ডে চা-পায়ীদিগকে tea totaler বলে। চা পান করিয়া যাঁহারা মদ্যপানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান, তাহারাই এই উপাধিতে ভূষিত। বাস্তবিক, চাও কি মদ্যপানের সমতুল্য?

"স্বাস্থ্য" চায়ের যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে

শরীর শিহরিয়া উঠে! বহুদর্শী বহু বিজ্ঞ অনেক চিকিৎসক চায়ের অপকারিতা স্বীকার করিয়া থাকেন। এমন বিষাক্ত অপকারী জিনিস, বহুল এবং বাহুল্য রূপে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকিলে, এই দরিদ্র উষ্ণপ্রধান দেশ রক্ষার উপায় কোথায়? কি সর্ব্বনাশের সংবাদ!!

আমরা চা-পায়ী বহু বন্ধুর সহিত আলাপ করিয়াছি। অনেক বন্ধুই ইহার অপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন বন্ধু দিনের মধ্যে ৪।৫ বার চা পান করিয়া থাকেন। ইহা না হইলেই নয়। তিনি বলেন—"আমি চা পান করি বলিয়া ইহার অপকারিতা বলিতে কুণ্ঠিত নই। ইহা এক প্রকার নেশা বই আর কিছুই নয়।" আরো বহু বন্ধু এইরূপ কথায় সাক্ষ্য দিয়াছেন। আমরা কখনও চা পান করি নাই। তবে বহু ডাক্তার-বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, আমাদের ন্যায় গরম দেশে চা পানে খুব অপকারের সম্ভাবনা। যাঁহারা রীতিমত চা পান করেন, তাঁহাদের অনেকেই স্বীকার করেন, একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই তাঁহাদের অপকার হয়। স্নায়ুকে অযথা রূপে উত্তেজিত করিয়া রাখিলে, সময়ান্তরে অবসাদ আসিবেই আসিবে। চা-পানের অপকারিতা একদিন না একদিন, মদ্যপানের অপকারিতার ন্যায়, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইলে মদ্যপানও দোষের নয়। ঔষধ হিসাবে, চা পানের প্রয়োজনীয়তা থাকিলে, তাহা নিবারণ করিবার পক্ষপাতী আমরা নই। সুস্থ শরীরে চা-পানে যদি বিশেষ উপকার না হয়, তবে অযথা, বিলাসের জিনিসের ন্যায় ইহা ব্যবহারের আবশ্যকতা কি? দরিদ্রদেশে বৃথা খরচ বৃদ্ধি করিয়া লাভ কি? সকলেরই একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

আমাদের দেশ নিতান্ত দরিদ্র। হিসাবে দেখা গিয়াছে, গড়পরতায় ভারতের অধিবাসীর বার্ষিক আয় ৩০্ টাকার অধিক নয়। নিম্নশ্রেণীর অবস্থা আরো শোচনীয়। গড়পরতায় প্রতি পরিবারের আয় ৮ শিলিং*। এরূপ দরিদ্র দেশ আর কোথাও আছে কি? কিসে ভারতের দারিদ্র্য নিবারিত হইবে, প্রত্যেক দেশহিতৈষীর তাহা চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। বিলাসের দ্রব্যাদি যাহাতে পল্লীগ্রামে স্থান না পায়, খোলাভাটীর ন্যায় যাহাতে দেশের দরিদ্র মহলের অনিষ্ট করিতে না পারে, প্রত্যেক হিতৈষীর

---

* John Bright said in 1879 :—The people of India are poor to an extremity of poverty of which the poorest class in this country, has no conception, and to which it affords no parallel' Thirty years ago, Lord Lawrence said : 'India is on the whole a very poor country, the mass of the population enjoying only a scanty subsistence' The late Agricultural Reporter to the Government of Madras, Mr Robertson, says of the Indian peasant in general . 'In the best seasons, the gross income of himself and his family does not exceed 3d. per day throughout the year, and in a bad season their circumstances are most deplorable.' Less than 8s. for a whole family for a month !. An English day

সে সম্বন্ধে চেষ্টা করা উচিত। এদেশে দরিদ্র শ্রেণীকে রক্ষা করিতে হইলে কেবল উপদেশে হইবে না, দৃষ্টান্তের একান্ত প্রয়োজন। সংযমরূপ মহা সাধনা অবলম্বনে, প্রত্যেক হিতৈষীকে, সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতাকে শ্মশানে ভস্ম করিয়া, তদুপরি মহাযোগীর ন্যায় এদেশে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। আমার কু-অভ্যাসে যদি ছেলেমেয়ের সর্ব্বনাশ হয়, তবে সে কু-অভ্যাস কি পরিত্যাগ করা উচিত নয়? আমার কু দৃষ্টান্তে যদি এদেশের দরিদ্র শ্রেণীর সর্ব্বনাশ হয়, তবে তাহা পরিহার করা কর্ত্তব্য নয় কি? হায়, যে দেশের কোটী কোটী লোক দুবেলা দুমুষ্টি অন্ন পায় না,—কোটী কোটী লোক শীত ও লজ্জানিবারণের বস্ত্র, বৃষ্টি ও উত্তাপ নিবারণের আচ্ছাদন পায় না, সে দেশে বিলাসের দ্রব্য, এসেন্স, মদ্য, চা, যাহা না হইলে কোনই অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, যাহাতে প্রচলিত না হয়, তাহা করা কি সকল সহৃদয় লোকের একান্ত কর্ত্তব্য নয়? কিন্তু হায়, নিজের স্বার্থ বা আশু সুখ পরিত্যাগ করিয়া সে কথা কে ভাবিবে!!

এদেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা নিজের স্বার্থ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে চাহেন না;—দেশের উন্নতি, দরিদ্র রক্ষা, এ সকল কথা তাঁহাদের নিকট বাতুলের প্রলাপ মাত্র। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, আজ কাল এক শ্রেণীর সহৃদয় ব্যক্তি জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি, জাতীয় একতা ও উন্নতিসাধন, দরিদ্ররক্ষা প্রভৃতি কাজে কতক সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত হইতেছেন, আমরা করযোড়ে আজ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত। লর্ড কর্জ্জনের ইঙ্গিত মত যাহাতে এদেশে চা-পান বিস্তৃত হইতে না পারে, সকলেরই সে জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। আমরা আর কিছু যদি করিতে না পারি, নিজেরা চা-পান না করিয়া দৃষ্টান্তও ত দেখাইতে পারি। আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালীকে অনুকরণ করিবার জন্য ভারতের সকল জাতি প্রস্তুত। বাঙ্গালীর চরিত্র যাহাতে উন্নত হয়,

---

labourer or a factory operative would earn more than that in a week, working for a much shorter time And when we remember that, however cheap living may be in India, if can not be managed under the most favourable circumstances at less than Rs 2-8 a month per head and that an average Indian family consists of 5 4 persons, as revealed in the last census, it is really a puzzle to understand how they can make the two ends meet But alas! the two ends never meet, for even in the best of times, according to the most reliable of authorities, 40,000,000, people always remain on the actual verge of starvation!" The poverty Problem in India, p 157 & 158

ব্যবহার যাহাতে সংযত হয়, আচার যাহাতে ধর্ম্মানুগত হয়, প্রত্যেক সহৃদয় বাঙ্গালীর তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনুকরণের স্রোতে মদ্যপান, চা-পান, বিষ পানের ন্যায় এদেশে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, আমাদের বিশ্বাস। বিধাতা এদেশকে অশেষ অমঙ্গলের হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

শ্রাবণ, ১৩০৮।

ব্রাহ্মসমাজের দুটী রত্ন।*

(বীর দ্বারকানাথ এবং ঋষি রামতনু)

অতি অল্প সময়, অনধিক দেড় মাসের মধ্যে, ব্রাহ্মসমাজ দুটী রত্ন হারাইয়াছেন। দুটীই যে কোন সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিবার যোগ্য,—দুটীই সমাজের এবং দেশের শক্তি বিশেষ। একটী অপেক্ষাকৃত নবীন, অন্যটী প্রাচীন,—একজন কর্ম্মযোগী, অন্যজন নীতিযোগী। দুই রাজ্যের দুই মহাশক্তি,—অনুপম, অতুলন, অননুভূত, অপরিজ্ঞাত, অবিখ্যাত। সেই দুই শক্তিকে বুঝিয়াছে, অল্প লোকে; চিনিয়াছে, আরো অল্প লোকে; সেই দুই শক্তির কথা লিখিয়াছে অল্প লোকে, লিখিতে পারে আরো অল্প লোকে। সময়ের অগ্রবর্ত্তী, দেশের অগ্রবর্ত্তী, সমাজের অগ্রবর্ত্তী সেই দুই শক্তির কথা, আমরা, ইচ্ছা থাকিলেও সম্যকরূপে লিখিতে অক্ষম।

---

* ৺দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়:—১২৫২ সালে, ইং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই বৈশাখ, বিক্রমপুরের অধীন মাগুরখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺কৃষ্ণপ্রাণ গাঙ্গুলী, তাঁহার মাতার নাম উদয়তারা। কৃষ্ণপ্রাণ গাঙ্গুলী অতি দরিদ্র ছিলেন। অতি শৈশব হইতেই দ্বারকানাথ একগুঁয়ে, দুর্দ্দান্ত, তেজস্বী ও সাহসী, অপর দিকে কোমলহৃদয়, দয়াবান, পরোপকারী। সাত বৎসর পর্য্যন্ত পাঠশালায় কিছু লেখা পড়া শেখেন। তৎপর ফরিদপুর ইংরাজি পড়িতে যান, কিন্তু পীড়িত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। তৎপর কালীপাড়া গ্রামে এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়েন, কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। তৎপর সোণারঙ্গ এবং ফরিদপুরের অধীন উলপুর এবং লোনসিংগ্রামে শিক্ষকের কাজ করেন। লোনসিং থাকার সময় অবলাবান্ধব প্রকাশ করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে অবলাবান্ধব কলিকাতা হইতে বাহির করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের মহিলার আসন নির্দ্দেশ লইয়া গোল তুলেন ও মীমাংসা করাইয়া লন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কুমারী একরয়েড সাহায্যে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপনে চেষ্টা করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উহা উঠিয়া গেলে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় স্থাপনে সাহায্য করেন। তৎপর ভারত সভা

পৃথিবীর লোকেরা সাধারণতঃ কার্য্য দ্বারা মানুষের বিচার করিয়া থাকে। যে যত অধিক ভাল কাজ করে, তাহারই নাকি আদর অধিক; কিন্তু কখনও কখনও এক শ্রেণীর লোক পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, কার্য্যসমষ্টি দ্বারা তাঁহাদের বিচার চলে না। কাজ মাটীর জিনিস, ভাল মন্দ সকল কাজই অনিত্য নশ্বর শরীরের সহিত লয় পায়। ইতিহাস ঘটনাবলীতে পূর্ণ, জীবনচরিত কার্য্যাবলীতে পূর্ণ; সর্ব্বত্রই নাকি সৎকাজের আদর। কিন্তু ম্যাট্‌সিনি বা বুদ্ধ, ওয়াসিংটন বা শঙ্কর, পার্কার বা খ্রীষ্ট কেবল কার্য্যের দ্বারা বিচারিত হইলে এ জগতে মহাশক্তি রূপে প্রতীয়মান হইতেন কিনা, সন্দেহের বিষয়। এই শ্রেণীর লোক, আমাদের মতে, কেবল সৎকাজের দ্বারা পূজ্য নন, সৎ-ইচ্ছা-শক্তি-সমষ্টিতেই সমধিক পূজ্য। এই সকল মহাপুরুষদিগের কথা ভাবিবার সময়, আমরা কাজের কথা ভুলিয়া যাই, মনে হয় যেন বিধাতার এক মহা ইচ্ছাশক্তি খণ্ডাকারে প্রদীপ্ত। কোন আড়ম্বর নাই, তবুও লোকেরা ভীত, কোন বিজ্ঞাপন নাই, তবুও পরিচিত। এইরূপ মহাশক্তিকে, এ যুগের ন্যায়, সকল যুগেই অস্বীকার করিতে লোকেরা চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই, শেষে, অবশেষে পরাজিত হইয়াছে। মহেশ্বরের মত ইচ্ছাশক্তি সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছে, মোহিত করিয়াছে, হতবুদ্ধি করিয়াছে। মানুষেরা শেষে এই সকল মহাপুরুষদিগকে, সময়ে সময়ে, ঈশ্বরের অবতার রূপে ব্যাখ্যা করিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

যতক্ষণ মানুষ সশরীরে জীবিত, আমাদের বিবেচনায়, ততক্ষণ কাজের

স্থাপনে সাহায্য করেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তৎপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে সাহায্য করেন। জীবনের শেষাংশে ইহার সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যু—১৪ই আষাঢ়, ১৩০৫, সোমবার, ২৭শে জুন, ১৮৯৮, কলিকাতা।

৮ রামতনু লাহিড়ী। জন্ম—১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র মাসে, মৃত্যু—২৯শে শ্রাবণ, শনিবার রাত্রি ৩-৩৫ মিনিটের সময়। ১৭ বৎসর বয়সে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হন। সুবিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। ডিরোজিওর উপদেশে ইঁহাদের জীবন নূতন পথে চালিত হইয়াছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্য করেন। তৎপর কৃষ্ণনগরে বদলি হন। তৎপর বর্দ্ধমান গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টার হন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বারাসাত, উত্তরপাড়া, রসাপাগলা ও বরিশালে কাজ করিয়া পেন্সন প্রাপ্ত হন। বাল্যেই হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। দরিদ্র গোবিন্দ রায়ের বংশ মহাত্মা রামতনুকে জন্ম দিয়া অক্ষয় ধনে ধনী হইয়াছে।

বিচার চলে; তারপর? তারপর ইন্দ্রিয়ের সহিত, রিপুর সহিত মানব শরীর যখন শ্মশানে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত, তখন আর কাজের বিচার চলে না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় ক্ষুদ্র ইচ্ছা-শক্তি তখন সম্মিলিত হইয়াছে, পিতা পুত্রের মিলন হইয়াছে; সেই শক্তি চিন্ময়রূপ ধরিয়া তখন জগতে পরিব্যাপ্ত। এ অবস্থাতেও যে দোষ ত্রুটীর কথা ভাবে, সে মূর্খ হইতেও মূর্খ, মহা মূর্খ।

এদেশে পূর্ণাদর্শ চিত্র নাই বলিয়া সময়ে সময়ে আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি। অভাবের চক্ষুতে দৃষ্টি করিলে পরিমিত মানুষের কাহাকে পূর্ণাদর্শ বলিয়া পরিতৃপ্তি পাইতে পার? কাহার এ দোষ, কাহার সে দোষ,—গুণ-সমষ্টিকে সদা মরজগতের পাপ-কলুষ-রাহু মলিন ও নিষ্প্রভ করিয়া রহিয়াছে। * এদেশে আদর্শ নাই, এ কথা বলিলে তুমি সে জন্য রাগ কর কেন, তুমি কি পূর্ণাদর্শ হইতে চাও? হইয়াছ কি? সুবভিত ও সুরঞ্জিত গোলাপী মদিরার গন্ধ এখনও তোমার মুখারবিন্দে লাগিয়া রহিয়াছে, এখনও তোমার রিপু-চাঞ্চল্যের কথা কত জনে কত ভাবে ঘোষণা করিতেছে, তুমি আদর্শ হইবে? ক্ষুদ্রমতি বালক ভুলাইতে পার, বিপু-চঞ্চল বন্ধু ভুলাইতে পার, শিথিল বিবেক বারনারী ভুলাইতে পার, কিন্তু মানুষ ভুলাইবার শক্তি এখনও তোমার জন্মে নাই। বৃথা রাগ করিও না, আত্মদৃষ্টি কর, বৃথা কথা বাড়াইও না, বৃথা আস্ফালন করিও না; লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইবে। জীবিতকালে আদর্শ খুঁজিয়া পাওয়া বড়ই কষ্টকর। মহাত্মা সুচতুর বঙ্কিম চন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন, বহুদিন পর যেন তাঁহার জীবনচরিত লিখিত হয়। অর্থাৎ যখন তাঁহার দোষ মানুষ ভুলিতে পারিবে, গুণের আদর করিতে শিখিবে, তখন যেন লিখিত হয়। মহাপুরুষেরা জন্মভূমিতে পূজিত হন না, একটা প্রবাদ আছে। কারণ এই, জন্মভূমি চরিত্র শিথিলতার কথা সহজে ভুলিতে পারে না। এস্থলে লোকের অনুদারতা আছে, সন্দেহ নাই। অনু-

* ইণ্ডিয়ান নেসন বলেন,—"Is it any answer to tell us that we orate and attitudinise on platforms or listen to orations, that we elect municipal commissioners or sit as such, that we talk over our great dead though we do nothing to preserve their memory, that we judge our rulers and often denounce them, that we press the University for the recognition of the vernaculars? A curse on all this sham and mockery, this stagey patriotism and simulated zeal! And cursed beyond hope of redemption is the land where man has no sympathy for man, where wealth is its own end, where the soul is subordinated to the flesh and needs are only material, where each lives for himself, and a scheming coquetry with the public flaunts itself as public spirit"

The Indian Nation, July 18, 1898.

দারজ্ঞ এই জন্য, শরীর যখন গিয়াছে, শরীরের ইন্দ্রিয়-দোষও তৎসহ গিয়াছে, সে কথা আর কেন? ভক্তমালের অনুতপ্ত বারনারীর মৃত্যুর পর দেবর্ষি নারদ প্রতিবাসী সাধুকে বলিয়াছিলেন, "তাহার শরীর কলুষিত হইয়াছিল, ডোমেরা তাহার সুবিচার করিয়াছে, আত্মা পবিত্র ছিল, এজন্য স্বর্গে গতি হইতেছে।" * শরীরের সহিত মানুষের দোষরাশি যখন ভস্মীভূত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তখন বিমল প্রভায় মানুষের গুণরাশি উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাত হয়। যে দুই মহাপুরুষের কথা উল্লেখ করিতেছি, তাঁহাদের জীবিতকালের কথায় আলোচনা অনেক হইয়াছে, অনেক নিন্দা, অনেক অত্যাচার তাঁহাদের প্রতি বর্ষিত হইয়াছিল। আজ তাঁহারা উভয়ই পুণ্য প্রভায়, উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বল হইয়া, সাধারণের নিকট পরিচিত। তাঁহাদের জন্য কত জনে অশ্রু ফেলিতেছে, কত জনে হাহাকার করিতেছে!

আমরা বহুবার লিখিয়াছি, মানুষে সৎ এবং অসৎ, শ্রেয় এবং প্রেয়, দুইয়েরই আধিপত্য আছে। লিখিয়াছি, দেবাসুরের সংগ্রাম প্রতিনিয়ত মানুষের মধ্যে চলিয়াছে। মৃত্যুর পরে—অসৎ নিবিয়াছে, প্রেয় নিবিয়াছে, আসুর শক্তি পরাজিত হইয়াছে,—তখন কেবল সৎ, কেবল শ্রেয়, কেবল দেবশক্তি রাজত্ব করিতেছে। কিন্তু সে দেবশক্তি কি?

মহাজনেরা বলেন, সৃষ্টি বৈচিত্র্যের ভিতরে এক মহাশক্তি সদা কাজ করিতেছে। আমরা অনেক স্থলে বলিয়াছি, অনন্ত প্রকৃতির মধ্যে যেন অনন্তশক্তিরূপিণী ফুটিতেছেন। জড়কের শক্তি সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই আমাদের ভাবিবার উপায় নাই। শঙ্করের এবং বার্কলীর মায়াবাদ, জড়বাদের অস্তিত্ব চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, এক অদ্বৈত শক্তিবাদ ঘোষণা করিতেছে। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের জটিল প্রশ্নের ভিতরে নিমগ্ন হইলে দ্বৈতবাদকে কেবল লীলা বা প্রকট ভাব ভিন্ন আর কিছুই ব্যাখা করিবার উপায় নাই। এক শক্তি, তাহা চিন্ময়, মায়াতীত এবং জড়াতীত, তাহারই বিকাশ এই সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা প্রকৃতি,—তাহার অভিব্যক্তি এই সত্ত্ব রজঃ তম গুণাশ্রিত মানব স্ত্রীপুরুষ। একথা অগ্রাহ্য কর, তুচ্ছ কর, উড়াইয়া দেও, দেখিবে, তুমিও নাই, আমিও নাই—সৃষ্টির কোন তত্ত্বই মীমাংসিত হইবে না। এই শক্তিই সেই দেবশক্তি। এই শক্তির নামান্তর—ইচ্ছাশক্তি।

* গল্পটী আমরা ধর্ম্মের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ প্রবন্ধে দেখিয়াছি। নব্যভারত, দ্বাদশ খণ্ড, আষাঢ়, ১০৩১, ১১৪ পৃষ্ঠা হইতে ১১৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

আদিতে কিছুই ছিলনা না, কেবল ইচ্ছা শক্তি ছিল। এখনও কিছুই নাই, কেবল ইচ্ছা-শক্তি আছে। তুমি কে, আমিই বা কে? ইচ্ছা-শক্তির সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পার কি? অহংতত্ত্বের মূলে যাও, এই ইচ্ছা-শক্তি, জড়তত্ত্বের মূলে যাও, সেখানেও এই ইচ্ছা শক্তি। এক মহা অবিনশ্বর ইচ্ছা-শক্তিতে জগৎ পরিস্ফুট, পরিব্যাপ্ত।

এই ইচ্ছা-শক্তিই দেবশক্তি। দ্বৈতভাব তবে কি? আমাতে যদি কেবল দেবশক্তিই থাকে, তবে 'আমি' 'আমি' এইরূপ ভাব মানুষের মনে জাগে কেন? পুরুষোত্তমের শঙ্করমঠের মহাত্মা দামোদর তীর্থস্বামী বলেন, "যতদিন মানুষের আমিত্ব বোধ আছে, ততদিনই দ্বৈতভাব আছে এবং উপাসনা আছে। আমিত্ব বোধ বিদূরিত হইলেই অদ্বৈত জ্ঞানে মানুষ জ্ঞানী হয়।" আমরা বলি, দ্বৈতভাব, কেবল বিধাতার লীলা। প্রকৃতিপক্ষে তিনিই সকলের মধ্যে কাজ করিতেছেন, দেখায় যেন, তুমি, সে, আমি কাজে করিতেছি। প্রকটভাবে মায়ামিশ্রিত যে পঙ্কিলতা দেখা যায়, তাহাকেই প্রেয় বা অসুরত্ব বলে। লৌহের মরিচার ন্যায়, অগ্নির ভস্মের ন্যায় ইহা। ইহারও প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের ভাবিবার উপায় নাই। প্রকটভাবে, আসুর ইচ্ছাসমূহকে যখন দেবইচ্ছা পরাজিত করিয়াছে, তখনই দেবতার উদ্ভব হইয়াছে। মানব-রাজ্যে সেই খানেই পূর্ণাদর্শ দেখা যায়। আর আমি, তুমি, সে, মায়ার দাস, আসুর শক্তিতে আত্মহারা, আমাদের মধ্যে সত্তের ক্রিয়ার প্রকাশ নাই। তাই আমরা মানুষ অথবা মানবদেহে পশু। আমরা মানব-পশু। আর ঐ অসুর-জয়ী ব্যক্তিরা? তাঁহারা পূর্ণাদর্শ, তাঁহারা মানবদেবতা। এই মানব-দেবত্বে উন্নীত হওয়ার জন্যই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আজ কিম্বা কাল, দুই বৎসর বা দশ বৎসর পরে, কিম্বা মৃত্যুর পরে আমাদিগকে সেই দেবত্বে উন্নীত হইতে হইবেই। জন্মিলে মরণ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং এই দেবত্ব লাভে সকলেরই অধিকার আছে। জীবিত কালে না হইলেও, মরণের পর সকলকেই সে দেবত্বে, সেই অমরত্বে যাইতে হইবে। অমরের সন্তান কখনও মৃত্যুতে চিরদিন নিমজ্জিত থাকিতে পাবে না।

এই দেব-ইচ্ছা-শক্তি—কর্ম্মে, জ্ঞানে, প্রেমে পরিস্ফুট, সর্ব্বত্রই। [জ্ঞানীর জ্ঞানে, কর্ম্মীর কর্ম্মে, ভক্তের ভক্তিতে—সর্ব্বত্রই এই ইচ্ছা-শক্তি। এই ইচ্ছা-শক্তিতেই কেহ জ্ঞানী, কেহ ভক্ত, কেহ প্রেমিক, কেহ কর্ম্মী।

অমুক বড়, অমুক ছোট, যে তাহার বিচার করে, সে সৃষ্টির বৈচিত্র্য-রহস্তের মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। সকল ঘটে, সকল বিধানেই এক শক্তি রূপান্তরিত অবস্থায় কার্য্য করিতেছে। তুমি কাহাকে বড় এবং কাহাকে ছোট বলিতেছ? কর্ম্মী বড, কি সংযমী বড়; জ্ঞানী বড়, কি প্রেমিক বড়; ভক্ত বড়, কি নীতিজ্ঞ বড়; আমরা তাহা জানি না। আমরা সকলের ভিতর বিধাতার মহাবিধানের লীলা-মাহাত্ম্য দেখিয়া স্তম্ভিত এবং আত্মহারা। আমাদের শক্তি কোথায় যে, সম্যক ব্যাখ্যা করিব?

সকল সমাজ এবং সকল দেশেই প্রতিনিধিত্বের অভ্যুদয় সম্ভব। প্রতিনিধির অভ্যুদয় না হইলে দেশ টিকে না। বিধাতার ঐ ইচ্ছা-শক্তির অঙ্কুর সকলের মধ্যেই অল্লাধিক থাকিলেও, এক এক স্থলে তাহার বিশেষ বিকাশ হয়। সাধনানুসারে ভগবদিচ্ছাশক্তি ধারণায় মানুষের অধিকার জন্মে। নিজের স্বতন্ত্রতা, অসুরতা বিনাশ করিয়া, মহাজনেরা, সাধনার বলেই দেব-ইচ্ছা শক্তিতে নিমজ্জিত হন। বিধাতার কৃপা ভিন্ন ভগবানের দর্শনলাভে কেহই অধিকারী নয়। কিন্তু সাধনায় ইচ্ছা ধারণ শক্তির যে বিকাশ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাপুরুষ কাহাকে বলে? ভগবৎ-ইচ্ছা ধারণের শক্তিতে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই মহাপুরুষ। অর্থাৎ সাধনায় যিনি সিদ্ধ, তিনিই মহাপুরুষ। যিনি রিপুজয়ী, তিনিই মহাপুরুষ। নিমাই কাটোয়ার গঙ্গায় ব্যক্তিত্ব ভাসাইয়া চৈতন্যত্বে পৌঁছিয়া মহাপুরুষ; সিদ্ধার্থ নির্ব্বাণ-নিরঞ্জনা-সলিলে রিপু ভাসাইয়া বুদ্ধত্বে পৌঁছিয়া মহাপুরুষ; যিশু অরণ্যে জন-দি-বাপটীষ্ট সমীপে নিজ ইচ্ছা উৎসর্গ করিয়া খ্রীষ্টত্বে পৌঁছিয়া মহা-পুরুষ। কত সাধনা, কত তপস্যায় মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়। আমি, তুমি, সে, সকলেই বিধাতার সৃষ্ট জীব, সকলেই তাঁহার কৃপার ভিখারী; কিন্তু কেবল সাধনার অভাবে, সংযমহীনতায়, আসুরিক সংগ্রামে পরাজিত হইয়া মলিন এবং নিষ্প্রভ;—না বুঝিলাম জ্ঞান, না বুঝিলাম কর্ম্ম, না বুঝিলাম প্রেমভক্তি। আর মহাপুরুষেরা, মানবশরীর ধারণ করিয়াও, ঐ দেখ, কেমন পাশব ইচ্ছা-শক্তি নির্ব্বাণ করিয়া, দেবত্বে, মহাপুরুষত্বে পৌঁছিতে-ছেন। বিধাতার অপরাজিত কৃপার জয় ঘোষণা করিতেছেন।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিতে চেষ্টা করিলাম, তাহাতে আমাদের বক্তব্য, বোধ হয় কতক সহজ হইয়াছে।। ব্রাহ্মসমাজের দুটী রত্নের কথা বলিতেছিলাম। সে রত্ন দুটীর একটী দ্বারকানাথ, একটী রামতনু।

এক স্থলে নবীন এবং প্রবীণ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্ম্মযোগী এবং নীতি-যোগী, বাহ্য এবং অন্তর, সেবা এবং সংযমের কথার উল্লেখ করিতেছি বলিয়া, হয় ত, কেহ কেহ বিরক্ত হইবেন, এবং আমাদিগের বিবেচনার ত্রুটি কীর্ত্তন করিবেন। কিন্তু স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, কর্ম্মে দ্বারকানাথ এবং পবিত্রতায় ও সংযমে রামতনু—বিধাতার দুই বিভাগে, উভয়ই সম আসনে উপবিষ্ট। কে বড়, কে ছোট, সে বিচার চলে না।

একজনকে মনে হয়, কেবলই কাজে ব্যস্ত, কথায় বার্ত্তায়, উপবেশনে গমনে, সব সময়েই অন্যমনস্ক, কি যেন কাজ বাকী আছে, সর্ব্বদা কাজ খুজিতেছেন, সর্ব্বদা কাজ করিতেছেন। এক কথায় যেন উৎসাহের আগ্নেয়-গিরি। আর একজন ধীর, স্থির, নিশ্চিন্ত, নিশ্চল, নীরব, নিস্পন্দ, আড়ম্বর-হীন, যেন বত্নগর্ভ খনি। সব কাজ যেন শেষ করিয়া বৃদ্ধ কি এক অজেয় সিংহাসনে বসিয়াছেন, যেথানে রাজা মহারাজাদেরও মস্তক অবনত। একজন শারীর-শক্তি দ্বারা, আর একজন আত্মিকশক্তি দ্বারা জগতের হিত-সাধন করিয়াছিলেন। এক জনের অস্ত্র সেবা, আর একজনের অস্ত্র সংযম। একজন পরার্থপরায়ণ, একজন সম্ভোগশীল। একজন সাহিত্যের উন্নতি, মহিলাগণের উন্নতি, কুলির অত্যাচার নিবারণ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতসভার উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আর একজন বিনয় এবং সরলতা, সত্য এবং পবিত্রতা, শিক্ষা এবং সদাচার, বিশ্বাস এবং ভক্তিতে সদা বিভোর, এবং সে সকলের প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী। রামতনু দাতা নহেন, কিন্তু যে তাঁহার কাছে যাইত, সে-ই কিছু পাইত, সে-ই অপরূপ রূপ দেখিয়া মোহিত হইত। আত্ম-সম্মান দুয়েরই জীবনের অলঙ্কার, জাতীয়তা দুয়েরই ভূষণ, দুইজনই স্বাধীনচেতা। স্বাধীনতা এবং কাজের তাড়নায় একজন কখন কখনও দুর্ব্বিনীত ও অসংযত হইতেন, কিন্তু আর একজন সদা নির্ব্বিকার-চিত্ত, অটল এবং অচল, সময় বা ঘটনার দাস নহেন। সংক্ষেপে এক-জন যেন সদা বাহিরে বাহিরে, আর এক জন যেন ভিতরে ভিতরে। একজন বাহিরের উপকার করিতেছেন, একজন অন্তরের মঙ্গল সাধনে সদা নিরত। একজন যেন জগতের, আর একজন যেন স্বর্গের; একজন বীর আর একজন ঋষি। একজন জগতের চিন্তায় অস্থির, আর একজন পরলোকের চিন্তায় বিভোর। জগৎও ঈশ্বরের, স্বর্গও ঈশ্বরের, সুতরাং

উভয়ই, বিভিন্ন হইয়াও, সম আসনের যোগ্য নয় কি? অথবা যে যেমন, সে তেমনেরই আদর করে। সংসারী ব্যক্তিরা গাঙ্গুলী মহাশয়ের, এবং পরলোক-পিপাসু ব্যক্তিরা লাহিড়ী মহাশয়ের অধিক আদর করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, উভয়েই আপন আপন মহত্বে প্রতিষ্ঠিত অধিষ্ঠিত এবং সম্পূজিত। মনে হয়, বিধাতার ইচ্ছাশক্তির দুটী রশ্মি যেন ভূপতিত হইয়া একটী গাঙ্গুলী মহাশয়ে এবং একটী লাহিড়ী মহাশয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই রশ্মিতে, দু-ই দরিদ্রের সন্তান, ঘোর দারিদ্র্য-সংগ্রাম জয় করিয়া, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কুসংস্কারাবৃত বঙ্গে, অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া, সংস্কারের স্বর্ণ মুকুট মস্তকে পরিয়াছিলেন। বঙ্গের অমূল্য রত্ন।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা দুই জনের নিকটই পরিচিত ছিলাম। দুই জনের দ্বারাই উপকৃত, দুই জনের দ্বারাই শোধিত। যখন ঘোর দারিদ্র্য-তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছিলাম, যখন যৌবন-তাড়নায় কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের ভীষণ সময়ে আত্মহারা হইতেছিলাম, তখন এই দুই জনই, কেহ বন্ধুরূপে, কেহ যেন গুরুরূপে সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একজন হাত ধরিলেন, একজন প্রাণ ধরিলেন। বিধাতাব দুই শক্তি, হাত এবং প্রাণ ধরিয়া, বন্ধুহারা সংসার-প্রান্তরে আমাদিগকে লইয়া যেন কোথায় চলিলেন। ইতি-হাস অনুসন্ধিৎসু পাঠক, সামান্য লোকের কথা সামান্য কথা শুনিতে ইচ্ছা হয় কি? একজন মুখে অন্ন দিলেন, এবং একজন প্রাণে কর্ত্তব্যপরায়ণতা, বিশ্বাস, ভক্তি এবং পবিত্রতার বীজ রোপণ করিলেন। একজন কর্ম্ম-পথের এবং একজন ভক্তি-পথের গুরু। একজনকে সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মপথে চলিতে লাগিলাম, এবং আর একজনকে প্রাণে রাখিয়া সংযম ও সত্য, নিষ্ঠা ও বিনয়, ভক্তি ও পবিত্রতার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। দুই জনের নিকটই আমরা বিক্রীত, কে বড়, কে ছোট, কেমনে জানিব? দুই জনের মৃত্যুতেই আমরা অস্থির হইয়াছি। এত অস্থির আর কেহ হইয়াছেন কি না, তাহা জানি না। বোধ হয় যে, আমাদের কর্ম্ম-পথ রুদ্ধ হইয়াছে, এবং সংযম-পথ দুর্গম হইয়াছে। ইঁহাদিগের কাছে ছিলাম না, অথচ কাছে কাছেই থাকিতাম, ইঁহাদিগকে দর্শন করিয়াই কৃতার্থ হইতাম, কথা বলার বড় প্রয়োজন হইত না। অন্তরে সদা কেবল ইঁহাদিগকে দেখিতাম। দেখি-তাম, উভয়েই যেন অগ্নি জ্বলিতেছে, দেখিতাম, উভয়েই যেন মহত্বের খনি নিহিত। মনে মনে উভয়কেই প্রণাম করিতাম। উভয়ের সহিতই রক্ত-

মাংসের কোন সম্বন্ধ ছিল না, আদান প্রদান কিছুই না, কিছুই না,—তবুও মনে হয়, উভয়ই যেন পরম আত্মীয়, আত্মীয় হইতেও আত্মীয় ছিলেন। মনে হয়, একজন যেন ছিলেন, জ্যেষ্ঠ ভাই; আর একজন যেন ছিলেন, পিতা। আজ আমরা ভ্রাতৃহারা, পিতৃহারা। লিখিব কি, এবং বলিব কি?

এই দুই মহাত্মার মৃত্যুতে আমরা বজ্রাহত হইয়াছি। মুখের হাসি নিবিয়াছে, হাতের কাজ শিথিল হইয়াছে, কিছু করিতে বা কোথাও যাইতে আর ইচ্ছা করে না। গাঙ্গুলী মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ব্রাহ্মসমাজের কোন বিবাহ-মণ্ডপে তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুবর্গও সমবেত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা যাইতে পারি নাই। লাহিড়ী মহাশয়ের রাজসিক শ্রাদ্ধবাসরে অনেক গণ্যমান্য বন্ধু গিয়াছিলেন, আমরা যাইতে পারি নাই। সর্ব্বদা মনে হইতেছে, কি যেন অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি। এমন কি যেন গিয়াছে, যাহা এ জীবনে আর পাইব না। চক্ষের নিদ্রা, হাতের কাজ, প্রাণের ভালবাসা, সব যেন কোন্ অদৃশ্য রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে? আমরা তুলনা করিব কি, আমরা আত্মহারা।

এই শোক-শ্মশানে ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছি, এখন আর নিজের কথা লিখিয়া কাজ কি? ব্রাহ্মসমাজ এখনও বুঝিতেছেন না, কি অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন। এই দুই মহাত্মার উপলক্ষে দুই এক বিন্দু অশ্রুপতন ভিন্ন অন্য স্মৃতি রক্ষণের চেষ্টা হয় নাই, সংবাদ-পত্রের পার্শ্বে সামান্য কাল চিহ্নও দেখা যায় নাই, দুই চারি কথা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা যেন কিছুই নয়, কিছুই নয়। ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কোন অভাব হইয়াছে বলিয়াও কাহারও নিকট বড় কিছু শুনিতেছি না। ইহাতে বোধ হইতেছে, যে মহতের পূজা ভিন্ন কোন সম্প্রদায় মহৎ হইতে পারে না, সেই মহতের পূজা এখনও ব্রাহ্মসমাজে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পর-নিন্দার গরল পানে সকলে যেন বিভোর। বুঝিবে কি? জানিবে কি? হায় রে ব্রাহ্মসমাজ!

আমরা যতদূর জানি, তাহাতে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, গাঙ্গুলী মহাশয়ের ন্যায় কর্ম্মী, এবং লাহিড়ী মহাশয়ের ন্যায় বিনয়ী, বিশ্বাসী এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি এযুগে, এদেশে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। গাঙ্গুলীর উৎসাহ এবং লাহিড়ীর বিনয়, গাঙ্গুলীর কর্ম্মানুরাগ এবং লাহিড়ীর সত্যানুরাগের কথা স্মরণ হইলে আমরা অবাক্ হইয়া যাই। উভয়ই সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উভয়ই ঘোর দারিদ্র্যে প্রতিপালিত, উভয়ই সমাজ-সংস্কারক

ও উপবীতত্যাগী ব্রাহ্ম। সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, পরদুঃখকাতরতা, বন্ধুবৎসলতা উভয়েরই জীবনের ভূষণ ছিল।

ইঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজে নাই, বঙ্গদেশে নাই। দেবগৃহে এবং আরও কোন কোন স্থলে কয়েকটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহা নির্ব্বাণ হইলেই, বুঝিব, ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশ হইল।

আমরা বলিয়াছি, একজন বীর এবং এক জন ঋষি। একজন বীর— সংসারকে, সমাজকে, দেশকে আপন তেজে, আপন শক্তিতে জয় করিয়াছিলেন; অন্য জন ঋষি, স্বর্গীয় অদম্য বলে রিপুদিগকে জয় করিয়া, নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত, অনাসক্ত যোগী সাজিয়াছিলেন। দ্বারকনাথ তেজে শত্রুর ভীতি উৎপাদন করিতেন, কোমলতায় বন্ধুর প্রাণ আকর্ষণ করিতেন; আর রামতনু কর্ত্তব্যে অটল অচল, প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়াও কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিতেন না; অন্য দিকে বন্ধুদিগের কথা স্মরণ মাত্র চক্ষের জল ফেলিতেন। রামতনু বিনয়ে যেন সকলের পদরেণু; কিছুই যেন জানেন না, সকলই যেন তাঁহা অপেক্ষা প্রবীণ পণ্ডিত। দুর্ব্বলের প্রতি উৎপীড়নের কথা শুনিলে দ্বারকানাথ জীবন মমতা ভুলিয়া আসামের প্রবল জলস্রোতে ঝাঁপ দিতে পারিতেন, দুর্দ্দান্ত সাহেবের ভীষণ আক্রমণে জীবনের মমতা ছাড়িতে পারিতেন, আর রামতনু ভগবৎ-বিশ্বাসে তুচ্ছ সংসারের, স্ত্রীপুত্রের সকল কর্ত্তব্যের বোঝা স্রোতে ভাসাইয়া দিতে পারিতেন, জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য প্রবীণ পদস্থ রাজপুরুষদিগকে তুচ্ছ করিতেন। দুই জনের জীবনেই শিক্ষার অনেক পাওয়া যায়। বন্ধুবৎসলতা উভয়ের জীবনের বিশেষত্ব ছিল। আমরা দ্বারকনাথের বিবাহের প্রতিবাদী ছিলাম। বিবাহের পর কিছুদিন তিনি আমাদের সহিত কথা বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার কন্যার বিবাহের সময় সমস্ত ভুলিয়া আমাদিগকে ডাকিয়া নিয়াছিলেন। এরূপ মহত্ত্ব কেবল তাঁহাতেই দেখিয়াছি। আর রামতনুকে দেখিয়াছি, বন্ধু রসিক কৃষ্ণের কথা বলিবার সময় তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতেছে, কণ্ঠরোধ হইতেছে। রামতনু প্রায়ই বলিতেন, 'রসিক ত মানুষ ছিল না; রসিক দেবতা ছিল।' রামতনুর বিনয় এবং বিশ্বাস কিরূপ ছিল, একটী কথাতে বলিতেছি। ভগবদ্ভক্ত জগদীশ্বর গুপ্তের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার স্ত্রীকে দেখিবার জন্য রামতনু একদিন আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীর মেয়েরা তাঁহাকে যখনই দেখিতে চাহিতেন,

তখনই তিনি নিজে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। শুনিয়াছি, সমাজ-সংস্কারের কোন কাজে আমরা প্রবৃত্ত ছিলাম বলিয়া তাঁহার এই অনুরাগ হয়। তিনি আমাদের পরিবারকে নিজ পরিবারের ন্যায় দেখিতেন। আমাদের একমাত্র পুত্রের শিক্ষার জন্য কিছু চেষ্টা করিতে পারিতেছেন না বলিয়া কত আক্ষেপ করিতেন। বলিতেছিলাম, জগদীশ্বর বাবুর পত্নী তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, শুনিয়াই তিনি আমাদের বাড়ীতে আইসেন। তখন বার্দ্ধক্যে তিনি শীর্ণ হইয়াছেন, উপরের ঘরে যাওয়ার শক্তি ছিল না। আমরা প্রাঙ্গণে তাঁহাকে গ্রহণ করিলাম। মেয়েরা বসিয়া তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা বলিতেছেন, এমন সময় আমাদের ১৫।১৬ বৎসরের ভৃত্য উপর হইতে নীচে আসিতেছিল। রামতনু বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—ও কে? জনৈক মহিলা বলিলেন—ভৃত্য। প্র। কতদিন আছে? উত্তর—অনেক দিন। প্র। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বাস করে কি? উ। একটু একটু করে। অমনি তিনি বলিলেন, আমিও ত একটু একটু বিশ্বাস করি। উত্তর। 'আপনি যেমন একটু একটু বিশ্বাস করেন, তেমন নয়।' এই সামান্য একটী কথায় তাঁহার বিনয়-মিশ্রিত গভীর ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশানুরাগের যে কত কথা, কত গল্প আছে, সে সকল লিখিতে গেলে, একখানি বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। তাঁহার চরণ প্রান্তে বসিয়া এত গল্প এবং এত কথা শুনিয়াছি যে, সংক্ষেপে লিখিবার সাধ্য নাই। হায়, সে সকলই আজ নীরব হইয়াছে। এমন বিনয়, এমন পাণ্ডিত্য, এমন পবিত্রতা, এমন সত্য এবং ধর্ম্মানুরাগ আর কি কোথায় দেখিব? দেশ ধন্য যে, পুণ্যশ্লোক রামতনুর ন্যায় ভগবদ্ভক্তকে কোলে স্থান দিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ ধন্য যে, এ হেন রত্নকে পাইয়াছিলেন।

এই দুই মহাত্মার পার্থক্য কোথায়? আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বীর যিনি, তিনি কিছু সঙ্কীর্ণ, তিনি কিছু স্বার্থপর; ঋষি যিনি, তিনি উদার, তিনি যেন জগতের আপন। দ্বারকানাথ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের; রামতনু সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের, সমস্ত দেশের, সমস্ত জগতের। যদি স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত হয়, দ্বারকানাথের স্মৃতিচিহ্ন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে থাকিবে, আর রামতনুর স্মৃতিচিহ্ন সমগ্র দেশের নরনারীর হৃদয়ে থাকিবে। এ যুগে রামতনু চরিত্রের অটল রাজা—সংসার-জয়ী, অবিচলিত, অসাম্প্রদায়িক ঋষিরাজা।

আমরা কত সময়ে ভাবিয়াছি, এই হতভাগ্য দেশে বিদ্যাসাগর, রামতনু

এবং রাজনারায়ণের অভ্যুদয় কিরূপে হইল ? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে শুনিয়াছিলাম, রামতনুর মত আর লোক নাই। উভয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী, অথচ উভয়ে উভয়ের পক্ষপাতী উভয়ে উভয়ের অনুরাগী। এ এক আশ্চর্য্য মিলন। কিরূপে এ মিলন হইল, কিরূপে দুই মহাত্মার অভ্যুদয় হইল, আমরা ভাবিয়া ঠিক পাই না। পঙ্কে কমলের উৎপত্তি হয়, ইহা জানি। কিন্তু অগাধ সলিলে কিরূপে সেতু নির্ম্মিত হয়, তাহা বুঝি না। বঙ্গদেশ অবনতির অতল সলিলে নিমগ্ন, ঘোর প্লাবনে সকল সভ্যতা, সকল কৃতিত্ব, সকল বিশ্বাস ভক্তি ভাসিয়া গিয়াছে, এই অগাধ সলিলরাশির মধ্যে চরিত্র-সেতু কেমনে নির্ম্মিত হইল ? বিদ্যাসাগরের দয়া, রামতনুর পবিত্রতা, চরিত্র সেতুর এই দুই মহাস্তম্ভ বঙ্গের অগাধ সলিলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কে পশুত্বের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া দেবত্বে যাইবে, চলিয়া এস।

বলিতে সাধ অনেক, বলিবার শক্তি মোটেই নাই। আমাদের বৃথা চেষ্টা, বৃথা আয়োজন। বিধাতা কৃপা করিয়া বিদ্যাসাগরের দয়া ও রামতনুর পবিত্রতা এদেশে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং দ্বারকানাথের উৎসাহ, উদ্যম, কৃতিত্ব প্রচার করুন এবং আমাদিগের শোক-সন্তপ্ত চিত্তে শান্তির ধারা বর্ষণ করুন।

ভাদ্র, ১৩০৫।

ব্রাহ্মসমাজের দারিদ্র্য-সমস্যা।

বড় লোকের পূজা এজগতে অনেক সময় অনেক রকমে হইয়াছে। শারীরিক বল, মানসিক বল, জ্ঞান-বল, ধর্ম্ম-বল, চরিত্রবল—অল্পাধিক পরিমাণে, সময় এবং দেশ বিশেষে, এ সকলেরই মাহাত্ম্য এবং গৌরব কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ধনবলের মাহাত্ম্য সবসময়েই সবদেশেই সমভাবে কীর্ত্তিত। বিশেষতঃ আজ কাল ধনবলের মাহাত্ম্যই কাজে এবং কথায়, প্রত্যক্ষে এবং অপ্রত্যক্ষে, নীরবে এবং স-রবে চতুর্দ্দিকে সমধিক ঘোষিত হইতেছে। কে বড় ?—এ প্রশ্নের উত্তরে সকলেরই যেন এক কথা, এক ভাব—ধনীই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যে লিখিয়াছেন—

"এই সংসারে একটী শব্দ সর্ব্বদা শুনিতে পাই,—'অমুক বড় লোক—অমুক ছোট লোক। এটী কেবল শব্দ নহে। লোকের পরস্পর বৈষম্য-জ্ঞান মনুষ্যমণ্ডলীর কার্য্যের একটী প্রধান প্রবৃত্তির মূল। অমুক বড় লোক, পৃথিবীর যত ক্ষীর সর নবনীত সকলই তাঁহাকে উপহার

যাও। তাহার সাগর হইতে শঙ্খ রত্নগুলি বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া হার গাঁথিয়া তাঁহাকে পরাও, কেন না তিনি বড়লোক। এখানে ক্ষুদ্র অদৃশ্য প্রায় কণ্টকটী পথে পড়িয়া আছে, উহা যত্ন সহকারে উঠাইয়া সরাইয়া রাখ—ঐ বড় লোক আসিতেছেন, কি জানি যদি তাঁহার পায়ে ফুটে। এই জীবন-পথের ছায়া-স্নিগ্ধ পার্শ্ব ছাড়িয়া রৌদ্রে দাঁড়াও, বড় লোক যাইতেছেন। সংসারের আনন্দ-কুসুম সকল, সকলে মিলিয়া চয়ন করিয়া শয্যা রচনা করিয়া রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন করুন। আর তুমি—তুমি বড় লোক নহ—তুমি সরিয়া দাড়াও, এপৃথিবীর ভাল সামগ্রী কিছুই তোমার জন্ম নয়। কেবল এই তীব্রঘাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্ম—বড়লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলাপ হইবে।"

বড় লোকে ছোটলোকে এ প্রভেদ কিসে? রাম বড় লোক, যদু ছোট লোক কিসে? তাহা নিন্দক লোকে এক প্রকার বুঝাইয়া দেয়। যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্ব্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড় লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্য্য বঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন, মুনিবের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র, সুতরাং সে বড়লোক। যদুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে—সুতরাং সে ছোট লোক। অথবা রাম কোন বঞ্চকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে বড়লোক। রামের মাহাত্ম্যের উপর পুষ্পবৃষ্টি কর।"

"অথবা রাম সেলাম করিয়া, গালি খাইয়া, কদাচিৎ পদাঘাত সহ্য করিয়া, অথবা ততোধিক কোন মহৎ কার্য্য করিয়া কোন রাজপুরুষের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। রাম চাপরাশ গলায় বাঁধিয়াছে—চাপরাশের বলে বড় লোক হইয়াছে। আমরা কেবল বাঙ্গালির কথা বলিতেছি না—পৃথিবীর সকল দেশেই চাপরাশবাহকের একই চরিত্র—প্রভুর নিকট কীটানুকীট, কিন্তু অন্যের কাছে—ধর্ম্মাবতার তুমি যে হও, দুই হাতে সেলাম কর, ইনি ধর্ম্মাবতার। ইঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, অধর্ম্মেই আসক্তি—তাহাতে ক্ষতি কি? রাজকটাক্ষে ইনি ধর্ম্মাবতার, ইনি গণ্ডমূর্খ, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ—সে কথা এখন মনে করিও না, ইনি বড় লোক, ইঁহাকে প্রণাম কর।"

* * * *

"সর্ব্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও দুই একজন লোক টাকার খরচ খুঁজিয়া পায়েন না—কিন্তু লক্ষ লোক অন্নাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতেছে।"

পৃথিবীর ঘোরতর বৈষম্য বিদূরিত করিতে যে সকল মহাত্মা সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট এবং রুসোই প্রধান। ইঁহারা পৃথিবীর বৈষম্য বিদূরিত করিতে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করা উদ্দেশ্য নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈষম্য বিনাশ করিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার। ইহা বিধাতার এক বিশেষ বিধান।

যে সূত্রে, যে প্রণালীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচারিত হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। ৬৯ বৎসর ব্যাপিয়া এই ধর্ম্ম ভারতে যে মহা ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে, ভাবী ইতিহাসকারগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন। যে যে মহৎ কার্য্য এই ধর্ম্মের দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে, আমাদের দ্বারা তাহা কীর্ত্তিত হওয়া সমীচীন নহে। সংসারের ঘোরতর বৈষম্য বিদূরিত করিতে এই ধর্ম্ম কতদূর সফল হইয়াছেন, আজ সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বহু পূর্ব্বে আমরা একবার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মসমাজ বৈষম্যের প্রধান ক্ষেত্র জাতিভেদের মূল উচ্ছেদ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। বরং বিপ্লবারত বাড়ি নীতি সমাজকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া প্রায় পূর্ণ-গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। ধনগত বৈষম্য সম্বন্ধে এই সমাজ কি করিতেছেন, সকলের একবার বিশেষ রূপ চিন্তা করা উচিত।

মানুষের যত মহত্ত্ব আছে এবং থাকা কল্পনা করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে প্রধান মহত্ত্ব, আমাদের বিবেচনায়, পরসেবা। নিজের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যখন অন্যের ভাবনাকে নিজের করিয়া লয়, তখনই প্রকৃত মহত্ত্বের উদয় হয়। যে সমাজের অধিকাংশ লোক দরিদ্রের অভাব দূর করিতে বদ্ধপরিকর, আমাদের মতে সে সমাজই শ্রেষ্ঠ সমাজ। নিজের সুখ পশু পক্ষীও ভালবাসে। মানুষ যদি নিজের সুখ তুচ্ছ করিয়া অন্যের সুখবর্দ্ধনের জন্য সচেষ্ট না হইল, তবে তাহার মনুষ্যত্বে ধিক্। আমরা তাহাকে মনুষ্য নামে পশু বলিয়া অভিহিত করি।

৬০ কি ৭০ বৎসর কোন সমাজের পক্ষে বড় বেশী কাল নহে। কেহ কেহ বলিতে চাহেন, এবং বলিয়া আনন্দিত, কেহ বা গৌরবান্বিত যে, ব্রাহ্মসমাজ যাহা করিয়াছে, তাহার তুলনা হয় না। আমরা কিন্তু কৃতকার্য্যে সুখী নই, বরং যাহা করিতে বাকী, তাহা স্মরণে বিশেষ দুঃখিত। আমাদের নাকি আশা অনেক ছিল, বুঝি বা সেই জন্যই আমরা ক্ষুণ্ণ। আমাদের দেশে একটা কথায় বলে, "যে পাখী উড়িবে, নীড়েই সে ফড় ফড় করে।" আর এক কথায় বলে—"যার হয় না নয় বৎসরে, তার হয় না নব্বই বৎসরে।" এই দুটী কথাই ব্রাহ্মসমাজের এবম্বিধ সন্তুষ্টচিত্ত গৌরবান্বিত লোকদিগের বিরুদ্ধে। ৬৯ বৎসরে যাহা হয় নাই, পরে যে তাহা হইবে,

তাহার বিশ্বাস কি? দিন দিনই আমরা বৈষম্যের ঘোরান্ধকারের ঘনঘটা দেখিতেছি। আমরা সরল চিত্তে লিখিতেছি, ব্রাহ্মসমাজ ধন-বৈষম্য দূর করিতে একেবারে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

মহাত্মা ম্যাট্‌সিনি যখন স্কুলের ছাত্র, তখন হইতেই শোক-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, যে দেশের এত দুরবস্থা, সে দেশে বিলাসিতা সাজে না। ইতালীর তদানীন্তন কালের অবস্থা হইতে আমাদের দেশের অবস্থা কত শোচনীয়! কিন্তু কই, এক জন হিতৈষীকেও ত শোক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেখি না। বরং চতুর্দ্দিকে বিলাস-বাসনাই দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, মনে হয়। সুখৈশ্বর্য্যে লালিত-পালিত হইতে সকলের মন একান্ত ধাবিত। যাঁহার অনেক টাকা, যাঁহার পোষাক পরিচ্ছদের চাকচিক্যে নয়ন ঝলসিত হয়, তিনিই সকলের পূজ্য। সংযম বা পরসেবা, এ যুগে কোথায় দেখিতে পাইবে? ধর্ম্ম আজকালকার দিনে কল্পনা বই যেন আর কিছুই নয়।

দেশের বৈষম্যপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া আমরা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইয়াছিলাম। জাতি-মাহাত্ম্য সম্প্রদায় মাহাত্ম্য ধনজন বিদ্যা মাহাত্ম্যের ও নীতি মাহাত্ম্য সংস্থাপনের জন্য উদার সার্ব্বভৌমিক সাম্যভিত্তিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। অনেকেই, পিতা পিতামহের সম্পত্তি তুচ্ছ করিয়া, কেবল ধর্ম্মের আকর্ষণে এই সমাজ গঠন করিয়াছিলেন, অনেকের অবস্থাই অস্বচ্ছল, অনেকেই দারিদ্র্যপীড়নে অস্থির, এই অবস্থায়, প্রথম হইতে সতর্ক হইলে, ধনবৈষম্য এ সমাজে ঠাঁই পাইবে না, আমাদের বিশ্বাস ছিল। সাম্যে একতা, একতায় শান্তি ও স্বাধীনতা, বৈষম্যে বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদে অশান্তি বা পরাধীনতা। বিশ্বাস ছিল, কখনও সাম্য ও একতা ভুলিয়া ব্রাহ্ম বৈষম্য-আগুন প্রজ্বলিত করিবেন না। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরেও, কি জানি কেন, ধন গৌরব ও বিলাসিতাস্পৃহা ক্রমে ক্রমে দাবানলের ন্যায় বিস্তৃত হইতেছে, সাম্য ভাব বিদূরিত হইতেছে এবং তৎসঙ্গে মহাগৃহ-বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। ধন-বৈষম্যের পৌনঃপুনিক অভিনয় দেখিয়া জড়সড় হইয়া আমরা ভাবিতেছি, হইল কি? ভাবিতেছি, বড় বড় লোকের কি মহা ভুল॥

কিঞ্চিদধিক এক বৎসরের কথা বলিতেছি। এই সময়ের মধ্যে আর না হইলেও, কেবল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চতুর্দ্দশটী পরিবার নিরাশ্রয়

হইয়াছে। এই সকল পরিবারের নাম করিতে পারিতাম, কিন্তু নানা কথা ভাবিয়া ক্ষান্ত হইলাম। মৃত্যুর কঠোর বিধানে এতগুলি পরিবার পথের ভিখারী হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুই তিনটী পরিবারের সংস্থান আছে, আর সকলই নিরাশ্রয় হইয়াছে। কি কষ্টে যে এই সকল পরিবারের দিনপাত হইতেছে, বড় কেহ অনুসন্ধান রাখেন না। অনেকের ছেলে মেয়ের গাত্রে বস্ত্র নাই, উদরে পেটপোরা অন্ন নাই, অনেকের দুরবস্থার কথা ভাবিলে চক্ষে জল পড়ে। প্রতিবৎসরই এরূপ হইতে পারে। হায়, কালে না জানি কত পরিবার নিরাশ্রয় হইবে। ধনী লোকের ঘরে কাহারও মৃত্যু হইলে, বা কঠিন পীড়া হইলে, লোকগতায়াতের ধূমে গৃহের লোক-জনকে পর্য্যন্ত অস্থির হইতে হয়, আর নির্ধনের ঘরে কাহাকে যদি মৃত্যু আলিঙ্গন করে, শববাহকের পর্য্যন্ত অভাব হয়। তারপর শোকের দারুণ শোক যাতনায় পরিবার যখন অস্থির, সান্ত্বনা দিতে দিনান্তেও বড় কেহকে পাইবে না। আর বড়লোকের ঘরের শোকের দিনে গাড়ীর পর গাড়ী, সারি, সারি, সারি—কত অশ্রুপাত, কত হা হতোস্মি!! লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এরূপ সহানুভূতির নির্ম্মম মরুভূমিতে মানুষ কেন মরিতে আসিবে? এই জন্যই দিন দিন এই ধর্ম্মসমাজ হইতে লোক দূরে সরিয়া যাইতেছেন। অহঙ্কার এবং আত্মাভিমানের বাজারে এ সকল কথা ভাবিতে বসিবে কে?

সম্প্রতি মহা ধুমধামে ছোটলাট উডবরণকে বরণ করিয়া ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছে। (১৭ই জানুয়ারি ১৮৯৯,—৪ঠা মাঘ।) কতই সাজসজ্জা, কতই রঙ্গভঙ্গি, কতই পত্র-পুষ্প, দেখিলে নয়ন ঝলসিত হয়। পত্র, কার্ড, প্রোগ্রাম, সঙ্গীত মুদ্রণেরই বা কত বাহাদুরি। এ সকল বোধ হয়, কেবল ধন-লালসার ফল। ধনলালসা না থাকিলে, কখনও, যাহারা স্ত্রীশিক্ষার চিরবৈরী, যাহারা মাতৃজাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইত না। সেকালে কোন কোন আসামের উচ্চ কর্ম্মচারী, শুনিয়াছি, পরিবারদিগকে হাকিমের নিকট পাঠাইয়া উন্নতিলাভ করিত। এ ঘটনাটীতে আমাদের সেই কথা মনে হইল। শুনিয়াছি, এই পারিতোষিক সভার ফলে প্রচুর ধন-প্রাপ্তি হইয়াছে।

* বেথুন বিদ্যালয়ের দ্বারা যে কাজ সুন্দররূপে সংসাধিত হইতেছে, আর যে কাজে গবর্ণমেণ্ট প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, আমরা সময়ে সময়ে

ভাবিয়াছি, সেই কাজের জন্য এত ব্যয়, এত পরিশ্রম কি জন্য? উক্ত স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদিগের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের লোক, সেখানেও দৈনিক উপাসনার ব্যবস্থা ছিল, নৈতিক শিক্ষাদিরও বন্দোবস্ত ছিল। আমাদের মনে হয়, এই ক্ষেত্রে সমযোগীতা করিতে যাওয়ায় নিতান্ত ভ্রম হইয়াছে। এই চেষ্টা, এই উদ্যম, এই যত্ন, এই পরিশ্রম, এই অর্থ যদি দরিদ্র ব্রাহ্ম-সংরক্ষণে ব্যয়িত হইত, না জানি কি মহান কাজ হইত। দরিদ্র ব্রাহ্ম বালিকারা এই ব্রাহ্ম শিক্ষালয়ে শিক্ষা করিতে পারে না, কেন না, এখানেও যত ব্যয়, বেথুনেও তত ব্যয়। এই স্কুল সংরক্ষণে কি মহৎ কাজ হইতেছে, আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে বুঝি না। ব্রাহ্মসমাজের বড়লোক যাঁহারা, তাঁহারা সাধারণতঃ এই ব্রাহ্মবালিকাবিদ্যালয়ে মেয়েদিগকে পড়িতে দেন না। আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এখানে দেন না কেন? আমাদের যেন মনে হয়, এখানেও ধনবৈষম্যের তীব্র দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। উপাসনা-মন্দিরের বেল-বেষ্টিত আসনে যে ভেদবোধের উদয়, এখানে তাহার বিকাশ। পরিণতি কোথায়, দেখিতে চাও? দরিদ্রের মেয়ে যত কেন গুণবতী হউক না, বিলাত-প্রত্যাগত সিবিলিয়ান, ব্যারিষ্টার বা ডাক্তার তাহার পাণিগ্রহণ করিবে না; ধনীর কুৎসিত কন্যাকেও সাদরে গ্রহণ করিবে। বৈষম্যের কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।।

বিবাহ-মণ্ডপে কত শত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত। কত সাজসজ্জা, কত গাড়ী ঘোড়া, কত ঝাড় লণ্ঠন,—কত, কত, কত শোভা। লোক শত শত। কিন্তু বুঝিতেছ কি, এখানে কাহার আদর অধিক? নিমন্ত্রিত ত সকলেই, আজ সম্মানিত কে, জান কি? তুমি বৃথা তর্ক তুলিও না—চাহিয়া দেখ, গাড়ী হইতে যাঁহারা অবতরণ করিতেছেন, বড় সমাদরে তাঁহারা গৃহীত হইতেছেন, আর ঐ দরিদ্র, মলিন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, কেহ উহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিতেছে না। উপবেশন ত দূরের কথা, একটু দাঁড়াইতেও এ ব্যক্তি স্থান পাইতেছে না। জীবন সমস্যার এ সকল তীব্র সত্য।

ইভিনিং পার্টি বল, বক্তৃতার হল বল, নিমন্ত্রণ সভা বল, যাহার নাম কর, সর্ব্বত্রই এই বিষম ধনবৈষম্যের পৌনঃপুনিক অভিনয়। হায়, কত সময় কত দরিদ্র বন্ধুকে বলিয়াছি, কেন ভাই লাঞ্ছিত হইতে যাইবে? কিন্তু শোনে কে? পদে পদে অপমানিত না হইলে, এ জাতির, এ বংশের সম্মান-

বোধ জাগিবার সম্ভাবনা কোথায়? ধনী লোকের নিমন্ত্রণ সভায় সেরি স্যাম্পেনের শ্রাদ্ধ হইলেও, সেখানে প্রচারক পুরোহিতের অভাব হয় না। দরিদ্রের বাড়ীর দৃষ্টান্ত স্বতন্ত্র। যা'ক, এ সকল তীব্র সমালোচনার প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ ভাবিতেছেন কি, কেন ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে দূরে দূরে লোক সকল পলায়ন করিতেছে? এই প্রশ্নের উত্তর কোথায়? আমাদের মনে হয়, কেবল সহানুভূতির অভাবেই এইরূপ হইতেছে। "যে যায়, সে যা'ক"—এ নীতি ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির নহে, স্বার্থপর ব্যক্তির, এ নীতি মিলনের নহে, বিচ্ছেদবহ্নি প্রজ্জলিত করিবার। "যে যায়, তাকে ফিরাও" এই নীতিই মিলনের নীতি, সেবার শাস্ত্র, ধর্ম্মের সার-তত্ত্ব। তোমরা যদি এ কথা না বুঝ এবং যদি না সতর্ক হও, তবে সমাজের পরিণাম আমি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারি।

দরিদ্র-রক্ষা ব্রত গ্রহণ না করিলে এ দেশের অভ্যুদয় অসম্ভব। কংগ্রেসই বল, বা কনফারেন্সই বল, দরিদ্র রক্ষা-ব্রত যদি গ্রহণ না করেন, কিছুতে কিছু করিতে পারিবেন না। আর ব্রাহ্মসমাজও যদি দরিদ্র রক্ষা-ব্রত গ্রহণ না করেন, কিছুতেই কিছু করিতে পারিবেন না। কেন না, দিন দিন দরিদ্রতা বৃদ্ধি হওয়াই সম্ভব, গত বৎসর যেমন ১৪টী পরিবার নিরাশ্রয় হইয়াছে, প্রতি বৎসরই এইরূপ হইতে পারে। আমি জানি, এমন দুই চারি জন মহৎ ব্যক্তি এই ব্রাহ্মসমাজেও আছেন, যাঁহাদের চক্ষের জল অবিরত দারিদ্রের দুঃখ স্মরণে পড়িতেছে। তাঁহাদের নাম করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রয়োজন দেখি না। তাঁহারা নরদেহে দেবতা, তাঁহারা সদা আমাদের প্রণম্য। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, বিস্তৃত ব্রাহ্মসমাজের দরিদ্রতা তাঁহাদের দ্বারা দূর হইতে পারে না। সমবেত শক্তির একান্ত প্রয়োজন। দয়া করিতে, দয়ার কথা বলিতে তাঁহারা ভিন্ন আর কে আছেন? যে টাকা বেশভূষা এবং পোষাক পরিচ্ছদে, জাঁকজমকে প্রতি বৎসর ব্যয়িত হইতেছে, তাহার এক দশমাংশ যদি থাকিত, না জানি কত দরিদ্র রক্ষা পাইত। ৬৯ বৎসরে দরিদ্র রক্ষার জন্য ১০ সহস্র টাকার একটী তহবিলও হইল না, এ দুঃখ আমাদের রাখিবার ঠাঁই নাই। উৎসবের বৃথা নাচুনি-কাঁদুনি আমরা ঢের দেখিয়াছি, আর দেখিতে চাই না, আর ভাল লাগে না। আমরা চাই কাজ, চাই পরসেবা, চাই চরিত্র, চাই সংযম, চাই উদারতা,—চাই মহা-মিলন। মহামিলনের মহা শাস্ত্র স্বার্থত্যাগ এবং সাম্যে নিবদ্ধ, কথায় কি

দেশ রক্ষা হয়, সমাজ গঠিত হয়? ব্রাহ্মসমাজ ক্ষুদ্র, কিন্তু দেশের দারিদ্র্য-সমস্যা, সমানুপাতে, এই ক্ষুদ্র সমাজেও অনুপ্রবিষ্ট। বিশেষতঃ পরিত্যক্ত এবং পিতৃধনে বঞ্চিত বলিয়া দরিদ্রতা এই সমাজে আরো অধিক। এই কঠোর জীবন-সংগ্রামে দরিদ্র ব্যক্তি নিত্য উপেক্ষিত, অবহেলিত, ঘৃণিত, উপহসিত, পরিত্যক্ত, নির্যাতিত, সর্ব্বত্রই। ধনীর সাত খুন মাপ, দরিদ্রের সামান্য অপরাধেই সে সমাজচ্যুত, পংক্তিভোজনে তাহার আহ্বান নাই। কর্ত্তব্যের অনুরোধে, ধর্ম্মের আকর্ষণে, নীতির উত্তেজনায় যাঁহারা সমাজে পড়িয়া রহিয়াছেন, ঘৃণিত কুকুর বিড়ালের ন্যায় আজও তাঁহারা তাড়িত না হইলেও, এমন দিন আসিতেছে, যে দিন সে অভিনয়ও আমাদিগকে দেখিতে হইবে। শুভ্র বসন ভূষণের স্থানে মলিন বস্ত্রের আদর হওয়া অসম্ভব, দুর্গন্ধে তাহা ঘৃণাকারজনক; তুমি কি বলিতে চাও যে, ঐ বড় লোকের নিকট তাহা উপেক্ষিত হইবে না? তোমার বুকের পাটা খুব শক্ত, তাই একথা বলিতেছ। নতুবা এতক্ষণ তোমার মস্তক চূর্ণীকৃত হইত। সতর্ক হও, এমন কথা মুখেও আনিও না। এইরূপ কথা আমরা দিব্যকর্ণে নিত্যই শুনিতেছি। হায়রে পৃথিবীর বিচার!!

লোকে বলে, বর্ত্তমান সভ্যতার ৩টী প্রধান উপকরণ,—টাকা, মদ ও বেশ্যা। তাহার নীচের সভ্যতার ৩টী উপকরণ—থিয়েটার, চা ও চুরুট। তাহার নীচের উপকরণ—উপহাস, বিলাস ও ব্যঙ্গোক্তি। তাহার নীচের উপকরণ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা গান, বাজনা ও বক্তৃতা,—গলাবাজি। সভ্যতার বাজারে পরোপকার, সেবা, স্বার্থত্যাগ, সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা, এ সকল নিত্য উপহাসের জিনিস। তুমি যত বড় লোকই হও না কেন, সভ্যতার উপরোক্ত কোন আভরণ যদি গ্রহণ না করিয়া থাক, তবে তুমি মহা মূর্খ। টাকার আদর করিবে না, মদ, বেশ্যা স্পর্শ করিবে না, চা চুরুট খাইয়া থিয়েটরে যাইবে না, তার পর বক্তৃতা, উপহাস, ব্যঙ্গোক্তি কিছুই করিবে না। তোমাকে বিধাতা মানুষ করিলেন কেন, বুঝি না! রাজাই বা তোমাকে পিঞ্জরায় আবদ্ধ না করিয়া অবাধে স্বাধীনতা দিলেন কেন? ছি, এমন লোকও মানুষের বাজারে থাকে! সাধারণ লোকের কথা এই রূপ। ব্রাহ্মের কথা কি? ব্রাহ্ম মদ খান না, কিন্তু চা পান তাঁহার না হইলেই নয়। তুমি ইহাতে দোষ দেও কেন? মহাত্মা রাজনারায়ণ বাবু বলেন, তাঁহাদের প্রাথমিক জীবনে মদ্যপান দোষের ছিল না, তুমি এমনই

ধার্ম্মিক, চা পানকেও মদের সহিত তুলিত করিতে চাহ? সব সুগন্ধি দ্রব্য তুমি উড়াইয়া দিতে চাহ? তুমি সাটীন, মকমল, শাল, বনাত বাজার হইতে তুলিয়া দিতে চাহ? আর তুমি অলঙ্কারাদিকে সপ্ত সমুদ্র পার করিতে চাহ, তুমি মজার লোক দেখিতেছি? যাহার টাকা নাই, তাহার ত ক্রয় করার শক্তিই নাই। তুমি সকলকে একাকার করিতে চাহ? বড় মজার লোক দেখিতেছি। তোমার ধর্ম্মকথা কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দেও, তোমার বুদ্ধদেব, খ্রীষ্ট বা রুসোর সাম্যবাদ গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেও, আপনি কিছু সুখ উপভোগ করিব না, সব পরকে দিব? ভাল শিক্ষা বিস্তার করিতেছ! ও সকল কথা রাখিয়া দেও, কোটের পর কোট, চাপকানের পর চাপকান, জ্যাকেটের পর জ্যাকেট, কামিজের পর কামেজ, ফ্যাসনের পর ফ্যাসন সাজাও, সুগন্ধির পর সুগন্ধি ঢালো; বাবুগিরিতে যদি ধর্ম্ম না থাকে, তবে সে ধর্ম্ম চাই না। ব্রাহ্মসমাজের দুই দশ জন সাধুর কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু লোক-সাধারণের যেন এই এক কথা। তাঁহারা বলেন, এ সকল সভ্যতার অঙ্গ। হায় রে সভ্যতা!! বিলাসিতা পূর্ণ মাত্রায় বাড়িয়া যাইতেছে, কে এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন? সেকালে চার্ব্বাক-প্রমুখ ব্যক্তিগণ ঋণ করিয়া ঘি খাওয়াকে পুণ্যের কাজ মনে করিতেন, একালের ধার্ম্মিকেরা ঋণ করিয়া বিলাসিতা করাকে যেন পুণ্যকার্য্য মনে করেন। ঘোরতর দরিদ্রকেও আজ কাল ফ্যাসন ফ্যাসন করিয়া অস্থির হইতে দেখিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের এ শিক্ষা বড় বিষম শিক্ষা। ব্রাহ্মসমাজের কাগজে মদ বা থিয়েটারের বিজ্ঞাপন নাই বটে, কিন্তু বিলাসিতার উপকরণের বিজ্ঞাপন সব কাগজে। ভক্ত কেশবচন্দ্র, শুনিয়াছি, এক সময়ে উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে,—

"এরূপ এক তৈলের বিজ্ঞাপন দেওয়া যাউক, যাহার গুণ এইরূপ। তৈলে সুগন্ধের ত কথাই নাই, গুণের কথা শুন। এক সময়ে ভুলক্রমে এক ব্যক্তি হস্তের পাতায় তৈল লাগাইয়াছিল, পরদিন দেখা গেল, হাতের পাতায় বড় বড় লোম হইয়াছে। এক দিন ভুলক্রমে তৈলপাত্রের মুখ খোলা ছিল, তাহাতে একটী তৈল পোকা পড়িয়াছিল, কিছু সময় পরই তেল পোকার সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় চুল গজাইয়াছিল। একদিন না জানিয়া কোন মহিলা মুখে তৈল মাখিয়াছিলেন, পরদিন মুখে বড় বড় দাড়ি গোপ গজাইয়াছিল। এমনই তৈলের গুণ। এ তৈলে টাক পড়া নিশ্চয় থামিবে।"

* আজ কালিকার চতুর্দ্দিকের তৈলের বিজ্ঞাপনে ইহাপেক্ষা কম গুণের কথা পাঠ করা যায় না। ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, বিলাসিতার উপকরণ ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা সকল প্রচার করিয়া পয়সা রোজগার করিতেছেন,

ইহা বড়ই শোচনীয় অবস্থা। এই দেশের ঘোরতর দারিদ্র্যের অন্যতর কারণ বিলাসিতা। এই বিলাসিতাকে সংহার করিতে প্রতি হিতৈষী এবং ধর্ম্ম সংস্কারকের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, ইহা প্রচার করা হইতেছে। বৎসরান্তে এই বিষয়টী সকলের একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

যে ধর্ম্মসমাজের একটী লোকও অনাহারে থাকিতে বাধ্য হয়, রোগের ঔষধ পায় না, শীতে বস্ত্র পায় না, সেই সমাজের লোকের বাবুগিরি করা যে কতদূর অনুচিত, এক প্রবন্ধে তাহা লেখা অসাধ্য। ধীরভাবে, স্থির চিত্তে নেতৃগণ এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। আমাদের কি ইহা সুখের দিন? অভাব-সাগরে ভারতবর্ষ নিমজ্জিত, কত দারিদ্র্য, কত দুঃখ, কত হাহাকার, কত অশিক্ষা, কত কুসংস্কার—প্রাণপণে খাটিলে, সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিলে, তবে কিছু কর্ত্তব্য হয় ত করা যাইতে পারে, এখন কি বাবুগিরির সময়? শোক-পরিচ্ছদ আমাদিগের প্রতিজনের ধারণ করা উচিত, এবং কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে দারিদ্র্য-সমস্যা মীমাংসিত হয়। এই কঠিন সমস্যা-মীমাংসার উপর ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। উদরে অন্ন না থাকিলে কি করিয়া মানুষ ধর্ম্মচিন্তা করিবে? অভাব বৃদ্ধি হইলে অপরাধও বৃদ্ধি হয়, ইহা সমাজ-বিজ্ঞানের সার সত্য। অভাব যাহাতে খর্ব্ব হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে যত্ন করা আবশ্যক। অভাবকে অবাধে বাড়িতে দিলে, কৃত্রিম অভাবকে বিলাসিতার পথ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে দিলে, সমাজের লোক মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্যবৃত্তি করিতে অবশেষে নিশ্চয় বাধ্য হইবে।

অতএব বিশেষ সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রতি গৃহীর পরিবার প্রতিপালন করা যেমন কর্ত্তব্য, দেশ এবং সমাজের দারিদ্র্য বিদূরিত করার জন্যও তেমনি চেষ্টা করা আবশ্যক। এমন কোন ব্যবসা অবলম্বন করা উচিত নয়, যাহাতে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। মদের দোকান আমি না করিলেও অন্যে করিবে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি করিতে পারি না। বিলাসিতার ব্যবসা আমি না করিলেও অন্যে করিবে, তাই বলিয়া বিলাসিতার ব্যবসা অবলম্বন করা উচিত নয়। যাহাতে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়, এমন কোন কাজই করা উচিত নয়। তাহা পাপ, তাহা অধর্ম্ম। দারিদ্র্য-রাক্ষসীকে বিনাশ করিবার জন্য সকলের বদ্ধপরিকর হওয়া একান্ত উচিত। নচেৎ সমাজের রক্ষা নাই, দেশের উদ্ধার নাই।

মাতৃমূর্ত্তি।

একদা সায়ংকালে দিবসের ক্লান্তি ও শ্রান্তির পর বিশ্রাম ও চিন্তার করে আত্মসমর্পণ করিয়া নীরবে বসিয়া আছি, এমন সময়ে ধীর পাদনিক্ষেপে ঘরে একটী মহিলা প্রবেশ করিলেন এবং ধীরে ধীরে পার্শ্বের আসনে উপবেশন করিলেন। তিনি রূপসী ষোড়শী বা উচ্ছ্বাসময়ী বিলাসিনী নহেন, তিনি সংযতা, নির্লিপ্তা, অনাসক্তা প্রেমরূপিণী মাতৃমূর্ত্তি।

রমণীর রূপ বা ভালবাসা ব্যাখ্যা করে নাই, এমন কবি এই পৃথিবীতে আছেন কি না, আমি জানি না। রমণীর ভালবাসায় আকৃষ্ট হয় নাই, এমন যুবক এই পৃথিবীতে আছে কি না, তাহাও জানি না। রমণীর ভালবাসা সর্ব্বত্র পবিত্র না হইতে পারে, কিন্তু সে ভালবাসায় আকৃষ্ট বা নমিত অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই। কেন, কেন মানুষ এত আত্মহারা?

মানব-জীবন ক দিনের? আজ আছে ত কাল নাই,—যেন পদ্মপত্রের জলের ন্যায় সদা চঞ্চল। দশ দিন পূর্ব্বে যাহার অহঙ্কারদৃপ্ত ব্যবহারে মর্ম্মাঘাত পাইয়াছি, হায়, আজ সে কোন্ অন্ধকারে লুক্কায়িত? বিধাতার বিধান, মানুষ আসিতেছে, যাইতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, জাগিতেছে, মরিতেছে। মরিবার জন্যই যাহার জন্ম, তাহার মনেও লালসা, বাসনা, কামনা, কত কি। মরিবার জন্যই যাহার জন্ম, যৌবন তাহাকেও কত রূপে মাতায় ও উত্তেজিত করে। যাইবার জন্যই এ পৃথিবীতে আসিয়াছি, তবে কেন এত খাটুনী, এত বকুনী, এত মাতামাতি, এত হুটাহুটী, ছুটাছুটী? কেন, কে জানে?

আমি প্রত্যহই এই সকল কথা ভাবিতে বসি। ভাবিয়া ভাবিয়া কূল কিনারা পাই না, অবসন্ন হই, ক্লান্ত হই, তবুও চিন্তা ছাড়ে না। কেন, কেন এই ভূতের বোঝা বহিতেছি? সে দিন ভাবিতেছিলাম, কেন এই পৃথিবীতে আছি? ভাবিতেছিলাম, থাকিয়া কি করিতেছি?—মৃত্যু কবে আসিবে?—মৃত্যুর পর কোন্ নিরাকারপুরে যাইব? মৃত্যুর পর আত্মীয়দিগের সহিত আবার সাক্ষাৎ হইবে কি না?—মৃত্যুর পরও আত্মীয়তা ভালবাসা থাকিবে কি না?) ভাবিয়া ভাবিয়া, অন্যদিনের ন্যায় আজও কোন মীমাংসায় পৌঁছিতে পারিতেছিলাম না। ভাবিতেছিলাম, হায়, এই সৃষ্টি বৈচিত্র্য

কত মহৎ, আর আমি কত ক্ষুদ্র! মহতে ক্ষুদ্রত্ব ডুবাইতেছিলাম ;—অসীমে সীমা হারাইতেছিলাম, এমন সময়ে কাছে বসিলেন,—চরিত্রে অনিন্দ্যা, দয়ায় অপরাজিতা, একটী ক্ষমার মূর্ত্তি। আমি আবার কান্নায়, আবার সীমায় ফিরিয়া আসিলাম।

তিনি বাল্যে আমাকে ভালবাসিতেন। আমাতে কি গুণ দেখিয়া ভালবাসিতেন, জানি না ; জানি শুধু এই, তিনি ভালবাসিতেন। তখন ঘোর দারিদ্র্য-সংগ্রামে তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত হাবুডুবু খাইতেছিলেন, এখন সংসারের ঐশ্বর্য্যের মুখ দেখিয়াছেন। এখন তিনি এই সংসারের হিসাবে গণ্যা, মান্যা, পূজ্যা, সকলই। আর আমি? আমি দিন দিন মলিনতার অন্ধকারে আবৃত হইতেছি। একবার যে লোকের নিকট কোন প্রকার অপরাধ করিয়াছি, সে লোক ত ভ্রমে ও আমার দিকে তাকায় না, আর আমি তাঁহার নিকট কত শত শত প্রকার অপরাধ করিয়াছি। দূর হইতে দূরে, দিন দিন কত সুদূরে যাইতেছি ; কিন্তু তবুও তাঁর দৃষ্টি স্নিগ্ধ, মিষ্ট, কি জানি-কেমন ক্ষমার এক স্বর্গীয় ভাবে জড়িত। তিনি আসেন, ধারে বসেন, সান্ত্বনা দেন, প্রয়োজন হইলে শুশ্রূষা করেন, প্রয়োজন হইলে নিজে না খাইয়া খাওয়ান, কি জানি কত দয়া, কত মায়া লইয়া আমার নিকট আসা যাওয়া করেন। আমার নিকট, তোমার নিকট, তাঁহার নিকট, সকলের নিকট এইরূপ কত রমণী আসা যাওয়া করেন। অপরাধীর অপরাধ গণনা করিয়া যে ব্যক্তি ভালবাসা ছাড়ে, তাহাকে বলে পুরুষ ; আর সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া যিনি কোল দেন, তাঁহাকে বলে রমণী। এই রমণী শক্তিই তিব্বতে রামমোহন রায়কে রক্ষা করিয়াছিল। * রমণী বলেন, "ভালবাসায় আবার ব্যবসাদারী?" কিছু পাইয়া যে দেয়, সে বণিক, কিছু না পাইয়াও যে দেয়, সে প্রেমিক। লোকেরা বলে, প্রেমিক এই সংসারে দিনদিনই যেন দুর্ল্লভ হইতেছে, কেনা-বেচা-রূপ দোকানদারীই যেন সর্ব্বত্র। কিন্তু কিছু না পাইয়াও তোমাকে কেহ কিছু দেন নাই কি? কোন কিছুর প্রত্যাশা না রাখিয়াও তোমার জন্য জীবন উৎসর্গ কেহ করেন নাই কি? ভাবিয়া দেখ, বুঝিবে, কেহ করিয়াছেন বই কি ? নচেৎ তুমি এই পৃথিবীতে আসিলে কেমন করিয়া? কেহ করিয়াছেন বই কি, নচেৎ এই রোগ-তাপ-পূর্ণ পৃথিবীতে আছ কেমন করিয়া? নিশ্চয়ই এক মধুর সুস্নিগ্ধ স্পর্শ তোমার সকল

* নগেন্দ্র বাবুর রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত, ৩য় সংস্করণ, ১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

উত্তাপ দূর করিতেছেন। করিতেছেন, এক অপরাজিতা শক্তি। খ্রীষ্টের নিকট তিনি মেরী, চৈতন্তের নিকট তিনি শচী, সেন্ট আগষ্টাইনের নিকট তিনি মণিকা, বিদ্যাসাগরের নিকট তিনি ভগবতী দেবী, আর তোমায় আমার নিকট সাধারণের অপরচিতা মাতৃমূর্ত্তি।

আমি বাল্যে মাতৃ-হারা। আমার জীবনে ঐ সুস্নিগ্ধ স্পর্শ সুখ কোথায় ? যৌবন-উষায় কত খুঁজিয়াছিলাম, সেই সুধাবিনিন্দিত স্পর্শানুভূতি পাই নাই। কিন্তু আজ ? আজ দেখিতেছি, যিনি আমাকে দয়া করেন, স্নেহ করেন, ভালবাসেন, আমার অশেষ অপরাধ ভুলেন, তিনিই মাতৃমূর্ত্তি। আমার মা আমার বাল্যে পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন এই বার্দ্ধক্যে, তিনি যেন অনন্ত ক্ষমার অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার চতুর্দ্দিক আবেষ্টন করিতেছেন। আমি কোথায় যাইব, কোথায় লুকাইব! দিবসের প্রখর দীপ্তিতে ঐ মাতৃমূর্ত্তি, রজনীর গাঢ়ান্ধকারেও ঐ মাতৃমূর্ত্তি। মা আসেন, বসেন, সান্ত্বনা দেন, খাওয়ান, শুশ্রূষা করেন, শেষে কি জানি কেন, অন্তর্হিত হন।

তুমি বল, সুন্দর রমণী মূর্ত্তি দেখিলে তোমার রিপু উত্তেজিত হয়। আমার নিকট সে কথা যেন কল্পনা মিশ্রিত, ভাব ও সাধনাদুষ্ট প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। প্রলোভনবীজ এ সংসারের বাহিরে নয়, মানব-অন্তরে। তুমি আপনার রিপুর উপর আপনি জয়লাভ কর, দেখিবে, নির্ব্বাণ-নিরঞ্জনা-তটে মারপিশুন পরাজিত, সেখানে বি-মলার মূর্ত্তি পবিত্রতার ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত। আপনি মরিয়া এজগতে কে কবে অন্যকে সজীব দেখিতে পারিয়াছে ? যে অসৎ, সে মনে করে, সৎ লোক এ সংসারে নাই ; সে মনে করে, প্রকৃতি তাহাকে বিপথে লইয়া যাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া প্রলোভনের রূপ ধরিয়াছে। কামল-রোগী এ জগতের সকলই হরিদ্রাবর্ণ দেখে। তুমি সাধনার রাজ্যে অনুপ্রবেশ কর, ইন্দ্রিয় ও রিপুর উপর বিজয় নিশান তোল, দেখিবে, কোথাও প্রলোভন নাই। রমণী-মূর্ত্তি চিরস্নিগ্ধ, চিরমধুর, চিরপবিত্র।

যে সাক্ষাতের কথা বলিতেছিলাম, মা আমার দুই চারিটী কথা বলিয়া, যখন অন্য লোক ঘরে ঢুকিল, তখনই পলায়ন করিলেন। যখন আমি তন্ময়, তখনই তিনি কাছে, যখন অন্যমনস্ক, তখন দূরে, অতি দূরে। হঠাৎ আগমন, হঠাৎ তিরোধান। তিনি কি মানবী, না চিন্ময়ী ? আমি বুঝি

রাছি, পাগলকে ভুলাইবার জন্ত চিন্ময়ীই সময়ান্তরে মানবী, আবার মানবীই সময়ান্তরে মাতৃভাবে চিন্ময়ী। নিরাকারা বা সাকারা, এ দুয়ের পার্থক্য আমি এখন আর বুঝিতেছি না। এখন কেবল কামনা করিতেছি, দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট মাতৃরূপের জয় জয়কারে জগৎ প্লাবিত হউক। মা-নাম-সাধনে সিদ্ধি-লাভ করিয়া মানুষ শোক-তাপ, জরা মরণের অতীত নিত্যানন্দ ধামে চির-বিশ্রাম লাভ করুক।

চৈত্র, ১৩০৮।

দয়া।

পৃথিবীতে প্রকৃত সুখী কে? খ্রীষ্ট বলিতেন, দীনাত্মারা সুখী, কেন না, স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। শ্রীচৈতন্য বলিতেন, ধর্ম্মের সার কথা, নামে রুচি, জীবে দয়া। দুঃখী দরিদ্র ভিন্ন বিধাতার দয়া উপভোগ কে করিতে পারে? দুঃখ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মানুষ যখন যায় যায় হয়, তখন দয়া-রূপিনী দেবদূতীর আবির্ভাব হয়। সে আবির্ভাবে যাঁহার হৃদয় সিক্ত, সেই প্রকৃত সুখী।

ইতিমধ্যে একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে দয়া করিতে লিখিয়াছিলাম। বন্ধু লিখিয়াছেন, "দয়া, তাহা আজ কালকার দিনে বড় দুর্লভ।" এইরূপ তিক্ত ব্যবহার পাইয়া ভাবিতেছিলাম, বাস্তবিকই কি দয়া এ জগতে দুর্লভ হই-তেছে? যদি তাহা হয়, তবে তৎসহ সুখ শান্তিও কি এ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে? যদি তাহা হয়, দুঃখী দরিদ্র ব্যক্তিগণ কি করিয়া, কি লইয়া জীবনধারণ করিবে?

ক্রুগার, দ্বারে দ্বারে দয়া ভিক্ষা করিতেছেন, কিন্তু কোথায় দয়া? স্বার্থ-পরতা মানুষের অন্তরকে পূর্ণগ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, দয়ার মধুর মূর্ত্তি তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। হতভাগ্য চীন সপ্তরথীর চরণপ্রান্তে আজ দয়াপ্রার্থী, কিন্তু খ্রীষ্টের ভক্তগণ আজ রক্তপানের মহানৃত্যে মাতোয়ারা। হায়, দয়া কোথায়? পিতা মাতাকে বধ করিয়া, যুবতী কন্যার সতীত্ব অপ-হরণ করিয়া সৈন্যগণ চীনে আত্মতৃপ্তি সাধন করিতেছে!! তাহাদের খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত প্রতিশোধ তোলা হইতেছে দেখিয়া আনন্দিত!! বিশপগণ পাদ্রীগণও আনন্দিত!! হায়, দয়া কোথায়? দয়া কি এ জগৎ

হইতে লুক্কায়িত হইয়াছে? লেবুসিয়র এবং ষ্টেড্ সাহেবের ক্ষীণ লেখনী পরাস্ত—আসুর রাজ্যে কত কত ভীষণ ক্রিয়ার নিত্য অভিনয় হইতেছে! হতভাগ্য আমাদের কুলীদিগের দুর্দ্দশার কথা না জানে, এমন লোক নাই। কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা হইল, স্বার্থপরতা ঘোর প্রতিবাদী হইল। মহাত্মা কটনের চেষ্টা পরাস্ত হইল।। এদেশে কত অবলার প্রতি পাপের অত্যাচার হইতেছে, কত দুঃখী, দরিদ্র, ধনীর অত্যাচারে নিষ্পেষিত, কিন্তু হায়, দয়া নামক দেবদূত কোথায়?

নববর্ষের প্রারম্ভে এই সকল বিষাদের কথা ভাবিতেছিলাম এবং অশ্রুপাত করিতেছিলাম। আমাদের মনে ১২৮৪ সালের কথা জাগিতেছিল। জীবন-ইতিহাসের সে এক অমূল্য বৎসর। সামাজিক অত্যাচারে আমরা মুহ্যমান। চতুর্দ্দিকে বিরোধী দলের আস্ফালন, সহানুভূতি সঙ্কুচিত, লজ্জা শরম লুক্কায়িত, আত্মীয়গণ মহাশত্রুর বেশে সম্মুখে দণ্ডায়মান। মা যদি সন্তানকে মারে, কে রাখিতে পারে? আমরা মাতৃহীন অসহায়, মাতা পিতার স্থানীয় আত্মীয়গণ যখন তীব্র, কঠোর ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, নিরুপায় হইয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করিলাম। দ্রব্যাদি প্রতিগৃহীত, সাহায্য বন্ধ, ক্রমে ক্রমে উপবাসকে সম্বল করিয়া চলিতে হইল। তাহাতেও নিবৃত্তি নাই, উপহাস, বিদ্রুপ, তিক্ত ব্যবহার, অবহেলা, ঘৃণা, পরিত্যাগ, পরিবর্জ্জন, এ সকলও যখন পরাস্ত হইল, তখন একমাত্র সম্বল চরিত্রের উপরও অভিযোগ আরম্ভ হইল। মানুষ যখন আর কোন রূপে কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, তখন এই উপায়টীকেই মহা অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। কত লোক প্রতিদিন কত মহাজনের চরিত্রের নিন্দা-ঘোষণা করিয়া ইষ্টসাধনের চেষ্টা করিতেছে। কষ্টের উপর কষ্ট, দুঃখের উপর দুঃখ। আকাশের দিকে চাহিয়া চলিতাম এবং বিধাতাকে বলিতাম, "দূরের মৃত্যু নিকটে আনয়ন কর, দুঃখ নাই, বিধাতা, দীনের এই প্রার্থনা, কর্ত্তব্য পালন করিয়া যেন মরিতে পারি।" সে কষ্ট দুঃখময় ইতিহাস লিখিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করিতে চাই না। ব্যক্তিগত শোক-দুঃখের কথা শুনিতে, আজ কাল, এই দয়াহীনতার দিনে, শুনিতেছি, অনেকেই বিরক্ত। যে কখনও সন্দেস না খাইয়াছে, তাহার নিকট সন্দেসের মিষ্টত্বের বর্ণনা শুনিতেই নাকি অনেকে উৎসুক। এই কষ্ট দুঃখ, উপহাস অনাহারের দিনে, একটী ঘটনা উপলক্ষে দেখিলাম, একটী অপরিচিত সাধু ব্যক্তি দশ আনা পয়সা প্রসন্নচিত্তে আমাকে

দান করিলেন। দশ আনা পয়সা নয়, মনে হইল যেন দশ কোটী টাকা। আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, মনুষ্য মূর্ত্তি যেন সেখানে নাই, যেন দেবীরূপী দয়া সেখানে আবির্ভূত। অথবা সে যে কি অপরূপ মূর্ত্তি দেখিলাম, ভাষায় তাহা বর্ণনা করার সাধ্য নাই। বন্ধু, তুমি কি দয়াকে কখন কোন বাহ্য রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তবেই, কেবল তবেই, সে রূপের মাধুর্য্য বুঝিতে পারিবে। জননীর স্তনের শোণিত দুগ্ধরূপে কণ্ঠকে শীতল করে, নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, কিন্তু বুঝিয়াছ কি,কি শক্তি মন্ত্রে ঐ শোণিত দুগ্ধে পরিণত? অসহায় অবস্থায় কোন ভীষণ ব্যাধির হস্তে পড়িয়া কোন লোককে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়াছি কি? দেখিয়াছ কি, কোন অপরিচিত লোক তাহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছে এবং মৃতের জন্য অশ্রুপাত করিতেছে? দেখিয়াছ কি যে, শেষে সেই দারুণ শোকে, সেই মৃত ব্যক্তির সংক্রামক ব্যাধিতেই সেবাকারীর মৃত্যু হইয়াছে? এরূপ চিত্র অনেক দেখা যায়। বন্ধু, তুমি এইরূপ দুই একটী চিত্র দেখিয়াছ বই কি? দেখিয়াছ এবং উপেক্ষা করিয়াছ। কি শক্তি মন্ত্রে এইরূপ লোকেরা দীক্ষিত, বলত? কোন্ বলে বলীয়ান হইয়া এই সেবাকারী জীবন-মমতা ছাড়িলেন? মন্ত্র আর কিছুই নয়—উহা দয়া,—অদৃষ্ট দেবতার দৃষ্ট ছবি, অলক্ষিত সত্যের ধ্রুব প্রকাশ,—উহা স্বর্গের মন্দাকিনী, বৈকুণ্ঠের অমিয়াধারা, উহা পতিত-পাবনী মৃতসঞ্জীবনী নিত্য প্রত্যক্ষ শক্তি। উহাতেই বিধাতার বিধাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত,—সংসার মরুভূমিতে উহাই একমাত্র ওয়েসিস্। উহা এ সংসারের জিনিস নয়।

মানুষ সদা আত্মভাবে বিভোর হইয়া গৌরবের সহিত ঘোষণা করে,—"আমি করি, আমি বলি,—আমি কত দুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়াছি, কত পাপীকে উদ্ধার করিয়াছি, শত জনকে বিপদে রক্ষা করিয়াছি।" এ সংসারের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রচার-বিবরণ আর কিছুই নয়, উহা কেবল অহঙ্কারের লিখিত ইতিহাস মাত্র। দান দাতব্যের কাহিনী, অহংতত্বপূর্ণ অসংবৃত আসুরিক লীলাকথা। নিত্যানন্দ জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া সে কাহিনী লেখার আবশ্যতা বুঝেন নাই। ইশা মেরি ম্যাগডেলিনকে উপদেশ দিয়া উদ্ধার করিলেন, কিন্তু সে কাহিনী লিখিয়া রাখিলেন না। এ দেশের প্রাচীন সময়ের কত কথা, কত শাস্ত্র, কত সত্য প্রচারিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রচারকের নাম নাই। আমি-তত্ত্বে যত দিন মানুষ নিমগ্ন, পর-তত্ত্ব

ততদিন মানুষ বুঝেনা। আমি-তত্ত্ব বিস্মৃতিতে ডুবাইলে তবে পরের আদর শেখা যায়। পরের আদর শিখিলে, তবে একতা সম্ভব, তবে দয়ার তত্ত্ব-তীরে উপনীত হওয়া যায়। নররূপী অসুর, তখন দয়ারূপিনী দেবী হন। তখ মানুষ পরের দুঃখ কষ্ট দেখিলে, নিজের স্বার্থ, সংসারের গণনা, এমন কি, জীবন-মমতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পরের উপকারে তৎপর হয়। মাহাত্মা এমারসন বলিতেন, "যিনি আমার নিকট উপস্থিত হন, তিনিই কোন না কোন বিষয়ে আমার গুরু।" কথাটা ভাষান্তরে লিপিবদ্ধ করিলে এইরূপ হয়, যিনি আমার নিকট উপস্থিত হন, তিনিই আমাকে কিছু দিতে আসেন। কাহার প্রেরণায়, কে জানে, প্রতিনিয়ত মানুষ কত সত্য, কত বেদ-বেদান্ত, কত সাহায্য, অযাচিত ভাবে আমার ঘরে রাশিকৃত করিয়া চলিয়া যাই-তেছে। শিশু শুধু হাসিয়া হাসিয়া অব্যক্ত ভাষায় কত তত্ত্ব বলিয়া যায়, কত যুবক কত সহানুভূতি, কত বৃদ্ধ কত উপদেশ কতরূপে দিয়া দিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়া যাইতেছে। আমি চাই যখন তখন মোটেই পাই না; চাই না যখন, তখন দেখি, কত জনে দিবার জন্য ব্যস্ত। যে যাজ্ঞা করে না, তাহাকে দিবার জন্য যেন সকলে ব্যতিব্যস্ত। যে দুঃখী, তাহার প্রতিই যেন সকলের দৃষ্টি। পৃথিবীতে দুঃখ দারিদ্র্য অনেক আছে, তাহার ধারে নিত্য অপরাজিতা দয়াও মূর্ত্তিমতী। তাহা যদি না হইত, এই ধরা নরবাসের অযোগ্য হইত। তৃণের ন্যায় দীন যে, তাহাকে রক্ষা ও উদ্ধার করিবার জন্য প্রত্যক্ষ দেবী দয়া সদা ব্যস্ত। ঐ যে ১৮৮৪ সালে দেবদূতী "দয়ার" প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তারপর প্রতিদিন প্রতিঘটনায়, শয়নে স্বপনে ঐ এক মূর্ত্তিই দেখিতেছি। বিজ্ঞ বন্ধুরা আমাকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করেন, কিন্তু আমি যে "দয়ার" সাগরে ডুবিয়াছি, সে অকথিত কথা কেহ বুঝিলেন না। এই রূপে সংসারের দীন দুঃখী সকলেই অপরাজিত দয়ায় বাঁচিতেছে।

সাহিত্যের বাজারে বড় হুলস্থুল লাগিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞাপনের তরঙ্গে বঙ্গদেশ প্লাবিত, আন্দোলিত। কাগজের উপর কাগজ বাহির হইতেছে, কত রকম বিজ্ঞাপন, কত ছবি, কত ছাপার মনোহারিত্ব, কত গল্পের ভেল্কি!! দশজন সুলেখকের দেশে বিশ খানি কাগজ। সাহিত্যের সেবার অপেক্ষা পবিত্র কাজ আর নাই। বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য এত লোক চেষ্টা করিতেছেন, এ আনন্দ রাখিবার ঠাঁই নাই। সহস্র সহস্র লোক খাটিলে, তবে বাঙ্গালা ভাষা জাগিবে। কিন্তু এই পবিত্র কর্ত্তব্যসাধনে বৃথা হই চই,

আড়ম্বর আস্ফালন, হিংসাবিদ্বেষ কেন? যাত্রী সংগ্রহের জন্য তীর্থের পাণ্ডারা যেমন করে, পবিত্র সাহিত্যসেবীরা সেইরূপ কাজে কেন প্রবৃত্ত? ভদ্রতার অযোগ্য নানা প্রলোভন প্রদর্শন কেন? ফুল ফোটে, কাহাকেও সৌন্দর্য্য দেখাইতে ডাকে না; পাখী গায়, কাহাকেও শুনাইতে ব্যস্ত হয় হয় না। কত জন বিজ্ঞাপনে কত প্রকার প্রতিজ্ঞার কথা বলিতেছেন,—"এমন করিব, তেমন করিব।" কোন কোন হিতৈষী বন্ধু এই সব দেখিয়া বলেন,—"এই চাকচিক্য ও জাঁকজমকের দিনে নব্যভারত লইয়া আর হাবুডুবু খাওয়া কেন? পার ত প্রলোভন পূর্ণ বিজ্ঞাপন দেও, অবিচ্ছেদে যে-সে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া আয় বাড়াও, ছবি দেও, গল্প দেও, চাকচিক্য বাড়াও, নচেৎ পাততাড়ি তোল। কি সম্বলে এই কঠোর পরীক্ষার দিনে টিকিবে?" প্রকৃতপক্ষে, আমাদের সম্বল কি? সম্বল ত কিছুই নাই! সম্বল যদি কিছু থাকিত, তবে বুঝিবা কাহারও নিকট কিছুই সাহায্য পাইতাম না। মাতৃগর্ভ হইতে উলঙ্গ অবস্থায় আসিয়াছিলাম, সহায় সম্বলহীন উলঙ্গ অবস্থাতেই চলিয়াছি,—উলঙ্গ অবস্থাতেই মরণকে আলিঙ্গন করিব। জ্ঞান নাই, পাণ্ডিত্য নাই, বুদ্ধি নাই, প্রতিভা নাই, বেশ নাই, ভূষা নাই; ধন নাই, বল নাই—কি দিয়া কি করিব? যাহার কোন সম্বল থাকে, সে সেই সম্বলের জোরে এই সংসারে যুঝে। আমরা সকল সহায় এবং সম্বলহীন। আমরা আত্মহারা,—সর্ব্বস্বহারা। আমরা আছি কেবল কাহারও যেন অযাচিত, স্পষ্ট, দৃষ্ট, ধ্রুব দয়ায়। শৈশবে মাতৃকোলে সেই দয়া মাতৃস্নেহ, যৌবনে বন্ধুস্নেহ, বার্দ্ধক্যে জগতের স্নেহ। দয়া, কেবল দয়াই আমাদের সম্বল। যাহাকে পাই, তাহারই, পা ধরিয়া কেবল দয়া ভিক্ষা চাই। কখনও চাই, কখনও কেবল নির্ভর করিয়া থাকি। শূন্য আকাশের পানে চাহিয়া ভিক্ষা করি, দয়া পাই, ভিক্ষা না করিয়া নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি, তখনও দয়া পাই। দুঃখ, অসহায়, দরিদ্রের মস্তকে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় দয়া, ঝর ঝর করিয়া দিবারাত্রি বর্ষিত হইতেছে; শত্রু মিত্র, স্বদেশী, বিদেশী, আত্মীয়, অনাত্মীয়—যাহার নিকট তাকাই, তিনিই অযাচিত ভাবে "দয়া" করেন। বন্ধু বলেন, দয়া এজগতে দুর্লভ; ইতিহাস বলে, চীন ও ট্রানস্‌ভাল দয়াতে বঞ্চিত, কিন্তু হায়, আমি যে "দয়া" ভিন্ন এসংসারে আর কিছুই দেখি না। চীন, ট্রানস্‌ভালের দুঃখ কাহিনী ছিল, তাই ষ্টেড্ ও লাবুসিয়র দয়ারূপে আজ আবির্ভূত;

ভারতের কুলিদিগের দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল, তাই আজ অযাচিত ভাবে কটন দয়ার অবতার। ভারতে পুলিসের অত্যাচার অদম্য, তাই মধুর পেনেল-মূর্ত্তি বিকশিত। বঙ্গে বিধবাদের অশেষ দুঃখ দুর্গতি ছিল, তাই বিদ্যাসাগর এদেশে দয়ারসাগর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। আয়র্লণ্ডের দুঃখ দুর্গতি অশেষ, তাই মহামতি গ্লাডোষ্টোন শেষ জীবনে দয়ার জীবন্ত মূর্ত্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। আমি ভাল করিব, আমি নিজে চেষ্টা করিয়া ভাল হইব, এ অভিমান আমার নাই। ভাল যদি হই, কাহারও দয়ায় হইব; যদি কাহারও ভাল হয়, কাহারও দয়ায় হইবে। এই নব্য-ভারতের দুঃখ দারিদ্র্য অগণিত, অশেষ, অসমাপ্ত বটে—কিন্তু ঐ আকাশে দয়াও অশেষ, অগণিত, অপরাজিত, অসমাপ্ত। দিন-রাত্রি দয়া শ্রাবণের ধারাপাত হইতেছে, ঝর ঝর করিয়া দয়ার ঝরণা বহিতেছে। বন্ধু, তুমি কি তাহা দেখিতেছ না? বৃথা অভিযোগ কর। দয়া সম্বল, দয়া ভরসা, দয়া মন্ত্র, দয়া সাধন যাহার, সে আর কি করিবে? দয়াকেই অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিয়াছি, আজও উহার দিকে চাহিয়াই বসিয়া থাকিব। বাঁচিত ঐ দয়াতেই বাঁচিব, মরিত ঐ দয়াতেই মরিব। বৃথা ভয়ে আমি ভীত নই—আমার সম্বল কেবল দয়া, কেবল দয়া।

দয়া, তুমি স্বর্গের রাণী, তুমি অমৃতের দেবদূতী, তুই এই ভারতে একবার নূতনভাবে নববর্ষে নেমে আয়; আসিয়া এ মৃত দেশকে একেবারে সজীব করিয়া তোল্। তোর অসাধ্য কিছুই নাই—তুই একবার তুলিয়া ধর ত একবার দেখি,—দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যাই।

বৈশাখ, ১৩০৮।

৺ কালীপ্রসন্ন দত্ত।

জন্ম—২০শে আষাঢ, বৃহস্পতিবার, ১২৬৬ সাল। জন্মস্থান—ফরিদপুরের অধীন চাওচা গ্রাম। মৃত্যু—৮ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩০৮। মৃত্যুস্থান—কলিকাতা। বয়স—৪২ বৎসর।

কখনও কখনও এই সংসারে এমন দুই একজন লোক আগমন করে, যাহারা মনটাকে সংসারে কোন অতীত ধামে রাখিয়া আসে। তাহারা হাসে, খেলে, বেড়ায়, কাজ করে, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত হয় না, কিছুতেই

বাধা পড়ে না। হাসিয়া হাসিয়া, খেলিয়া খেলিয়া, তাহারা কোথায় যেন চলিয়া যায়। যাওয়ার পর লোকেরা বলে, কি দেখিলাম, কি দেখিলাম! বুয়রযুদ্ধ লেখক কালীপ্রসন্ন দত্ত এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার তিরোধানের পর কত লোক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিয়াছে—হায়, এমন ছবি বুঝি বা এই সংসারে আর দেখি নাই। বিদ্বেষ, নীচতা, পরশ্রীকাতরতা আমাদের হাড়ে হাড়ে জড়িত, কালীপ্রসন্ন দত্তের হৃদয়ের ত্রিসীমায় এ সকল ঠাঁই পাইত না; কেহ কখনও তাঁহাকে পর-নিন্দা করিতে দেখিয়াছে কি না, জানি না। মহত্বে অনুপ্রাণিতা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা, পরনিন্দা যে স্থানে হয়, সে স্থানে কখনও থাকে না। অন্যের উন্নতিতে সদা তাঁহার চিত্তে আনন্দ খেলা করিত, কাহারও প্রশংসার কথা শুনিলে উল্লাসে তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিত। এরূপ চিত্র বুঝি বা আর কোথাও দেখি নাই।

বাল্যকাল হইতে দেখিতেছি, তিনি আপন পর জানিতেন না। যাহার যে অভাব দেখিতেন, অম্লান চিত্তে তাহা দূর করিতেন। নিজের জিনিস বলিয়া কিছুর প্রতি তাঁহার আসক্তি দেখি নাই। যাহার যে অভাব, তাঁহার জিনিসের দ্বারা সে অভাব সকলে পূরণ করিত, তিনি সব সময়ে নীরব নির্ব্বিকার-চিত্তে থাকিতেন। কেহ তাঁহার নিন্দা বা তাঁহাকে গালাগালি করিলে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না,—অম্লান চিত্তে তাহাদের উপকার করিতেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার শত্রু-মিত্র বোধ ছিল না, যাহারা তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সহিতও মিত্রতা করিয়া গিয়াছেন। লোকে তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইত। সময় সময় আমাদের মনে হইত, তিনি কি মানুষ, না দেবতা ছিলেন!

আমরা সদা ভয়ে জড়সড়, কিন্তু ভয় কি জিনিস, তাহা তিনি জানিতেন না। বাল্যকাল হইতে জীবনে কত সংগ্রাম গিয়াছে, একদিনের জন্যও বিচলিত হন নাই। ব্যাঘ্রের মুখে পড়িয়াছেন, টলেন নাই; শত্রুদের হাতে পড়িয়াছেন, দমেন নাই, কর্ত্তব্যপালনের জন্য জেলে গিয়াছেন, ভ্রূক্ষেপ নাই। অস্ত্রধারী বহুলোক হত্যা করিতে উদ্যত, দত্ত নির্ভীক হৃদয়, স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত। দশ সহস্র টাকা তাঁহার মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল, দুই স্থলে তাঁহাকে হত্যা করার আয়োজন হইয়াছিল, সকলে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দত্ত কর্ত্তব্যপালনে উন্মত্ত, সে স্থানে না যাইয়া পারেন নাই। শেষে তাঁহার সাহসের নিকট

সকল ষড়যন্ত্র পরাস্ত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় নির্ভীক বীর এই বঙ্গদেশে বড় দুর্লভ।

কাজ পাইলে দত্ত আপন অবস্থা, স্বাস্থ্য ভুলিয়া যাইতেন। রাত্রি নাই, দিন নাই অবিরত খাটিতেছেন। তিনি যেন পাগল হইয়া যাইতেন। যখন কলেজে পড়িতেন, অনেক সময় পড়িতে পড়িতে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত, কিন্তু তাঁহার হুঁস থাকিত না। একসঙ্গে সভার কাজ করিয়া দেখিয়াছি, অন্য সভ্যেরা মধ্যে মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িতেন, কিন্তু দত্তের চক্ষে একবারও ঘুম বসিত না। বিজনী-ষ্টেটের যে সকল কাজ তিনি করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, সকলেই অবাক্ হইয়া ভাবিয়াছেন, এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা কি মানুষে সম্ভব? যখন অবসর পাইয়াছেন, তখনই তিনি পরোপকার করিয়াছেন। অবসর পাইয়াও অন্যের উপকার করেন নাই, এরূপ দৃষ্টান্ত দত্তের জীবনে ঘটে নাই। আসামের অনেক ষ্টেট তাঁহার নিকট ঋণী।

তিনি জীবনে সহস্র সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু একটী টাকাও রাখিয়া যান নাই, লোকে বলে, ইহা তাঁহার বড় কলঙ্ক! তিনি দান করিতেন, লোকে জানিত না; তিনি লোককে খাইতে দিতেন, কিন্তু সংবাদ পত্রে সে কাহিনী উঠিত না। তিনি নিজে খাইতে যেমন ভালবাসিতেন, অন্যকে খাওয়াইতে তেমনি ভালবাসিতেন। যে লোক কখনও মদ্যপান বা ব্যভিচার করে নাই, তিনি সহস্র সহস্র টাকা পরোপকার করিয়া খাইয়া এবং খাওয়াইয়া উড়াইতেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,—"যে ভাবে আসিয়াছি, সেই ভাবেই চলিয়া যাইব, দিন বসিয়া থাকিবে না।"

বাল্যকাল হইতে দত্ত ধর্ম্মপিপাসু। কলিকাতা আগমনের কিয়দ্দিবস পরই কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মনিকেতনে আশ্রয় লন। সেই সময় হইতে আমাদের সহিত পরিচয়। সেই সময় হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি একেশ্বরবাদী। নিজে কখনও পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করেন নাই, উপাসনা করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তবুও হিন্দু সমাজের লোকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। যাহার সহিত দত্তের একবার দেখা হইত, তাহাকেই এমন মুগ্ধ করিতেন যে, সে কখনও দত্তকে পরিত্যাগ করিতে পারিত না। গালাগালি দেও, প্রহার কর, নির্যাতন কর, নিন্দা কর—সে মহাযোগা

নির্ব্বিকার চিত্ত; তিনি বলিতেন, "নিন্দার কোন কথা আমার গায়ে লাগে না।" কেহ কোন রূপ তিক্ত ব্যবহার করিয়া কখনও তাঁহাকে রাগাইতে পারে নাই। ক্রোধ দত্তকে দেখিয়া যেন ভয় পাইত। তিনি সদা নির্ব্বিকার-চিত্ত থাকিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ কথা—"চিন্তা আমার কি, চিন্তা তোমাদের।" মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বে তাঁহাকে "চিন্তা করিও না"—বলা হইয়াছিল, তদুত্তরে দত্ত ঐ উত্তর দিয়াছিলেন। ঐ কয়েকটী কথার মধ্যে দত্তের সকল জীবনের বিশেষত্ব ও মূল মন্ত্র নিহিত। তাঁহার মস্তিষ্কের ন্যায় পরিষ্কার মস্তিষ্ক আর দেখি নাই। যে ব্যক্তি দিবারাত্রি নানা চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, তিনি শেষ সময়ে বলিলেন—"চিন্তা আমার কি, চিন্তা তোমা-দের।" বাস্তবিকও তিনি মহাযোগী ছিলেন, সংসারের অসার চিন্তা করি-তেন না, মনটা তাঁহার অনেক উপরে ছিল, কল্য কি খাইবেন, কি পরিবেন, সে ভাবনায় অধীর হইতেন না, সদানন্দে বিভোর থাকিতেন। সকল চিন্তা যেন কোন্ চিন্তামণিকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্ব হইতেই যেন মহাযোগী তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এবার আষাঢ় মাসে জন্মদিনে প্রার্থনা করিলেন—"গত জীবনে কত ভুলভ্রান্তি করিয়াছি, আর যেন ভুলভ্রান্তি না করি।" আর তাঁহাকে ভুলে মজিতে হয় নাই। তাঁহার কন্যাকে অগ্রহায়ণ মাসে সিবসাগর পাঠাইতে কার্ত্তিক মাসে পত্র আসিল, তিনি বলিলেন, 'সে অনেক বিলম্ব, ইহার মধ্যে কে মরে, কে বাঁচে, কে জানে?" ইহার মধ্যেই কোন সময়ে তাঁহার কোন বন্ধুকে লিখিলেনঃ—"যদি আমি হিসাব দিয়া না উঠিতে পারি, আমি ষ্টেটের যে সেবা করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া যেন আমাকে ক্ষমা করা হয়।' এবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া'র দিন তাঁহাকে উপাসনা করিতে দেওয়া হইল, তিনি যে অহেতুকী প্রেমের ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা পরকাল সম্বন্ধীয় প্রেমের কথা। পীড়ার আক্রমণের পরই বলিলেন, "এ যাত্রা আর রক্ষা নাই।" আর একটু পরে বলিলেন, 'আজ হইতে পান খাওয়া ছাড়িলাম।" তিনি আর বাঁচিলেন না, আর পান খাইলেন না। তিনি পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়াছিলেন, ইহাই জীবনের শেষ, কিন্তু একটীবারও বলিলেন না, স্ত্রী বা মেয়েদের কি উপায় হইবে! কেবল পীড়া সম্বন্ধে বলিলেন, "চিন্তা আমার কি, চিন্তা তোমাদের।" জীবন্মুক্ত মহাযোগীর মহাযোগের কথা। এককথায় বলিতে গেলে, প্রেমে এবং প্রতিভায়, সেবায় এবং বুদ্ধিতে তিনি রাজা ছিলেন। যাহাকে একবার

প্রেমে বাঁধিয়াছেন, এক দিনের জন্যও তাহাকে ছাড়েন নাই। কত লোক কত জনকে ভালবাসেন, আবার স্বার্থে ব্যাঘাত পড়িলে, ভালবাসা ভুলিয়া যাইয়া শত্রু হন, কিন্তু দত্ত ভালবাসার চির গোলাম ; ভালবাসিয়া কাহাকেও একদিনের জন্যও পর ভাবেন নাই। হৃদয়াংশে তিনি দেবতা ছিলেন। আর বুদ্ধিতে, প্রতিভায়, তিনি অনিন্দিত রাজসম্মানে ভূষিত ছিলেন। হাইকোর্টের বড় বড় ব্যারিষ্টার ও উকীলগণ, আসামের হাকিমগণ, চিফ্ কমিসনর পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি ও প্রতিভার প্রাখর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইতেন। বড়রাণী কর্ত্তৃক তাড়িতা এবং লাঞ্ছিতা, পথের ভিখারিণী তুল্যা রাণীকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া গিয়াছে যে ব্যক্তির বুদ্ধি ও প্রতিভা, সে ব্যক্তির বুদ্ধি ও প্রতিভার অলিখিত ইতিহাস আসামের অগণ্য প্রজামণ্ডলী, এবং কর্ম্মচারীর হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত। যাও আসামে, ঘরে ঘরে পরিচয় পাইবে, এমন প্রজাহিতৈষী, দরিদ্রের বন্ধু, বিপন্নের সহায়, বন্ধুবৎসল কৃতজ্ঞ কর্ম্মবীর এবং প্রেমিক দেবতা আর সে দেশে কখনও যায় নাই। বাস্তবিকই, আমারা বন্ধু বলিয়া বলিতেছি না, তিনি যেন এক স্বর্গীয় রাজ্যের দূত ছিলেন। তাঁহার পুস্তক এবং প্রবন্ধ পাঠ করিতে সহস্র সহস্র লোক উৎকণ্ঠিত হইত, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে শত শত লোক ছুটিত, খেলা দেখিতে শত শত লোক ধাইত। তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার ধারে বসিতে, তাঁহার পরামর্শ লইতে দিবারাত্রি শত শত লোক সম্মিলিত হইত। বাস্তবিকই তিনি যেন কি এক অমৃতময় রাজ্যের দেবশিশু ছিলেন। তাঁহার ন্যায় আড়ম্বরহীন ধার্ম্মিক, আস্ফালনহীন কর্ম্মবীর, আসক্তি ও কামনাহীন সেবক, নিষ্কাম, ও নিঃস্বার্থ পরোপকারী, দীনতাপূর্ণ উপদেষ্টা, বিনয়পূর্ণ পরামর্শদাতা, এ জীবনে বুঝি বা আর একটীও দেখি নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার পুস্তক এবং প্রবন্ধের স্থান অতি উচ্চ। নব্যভারতের পাঠকগণকে আর সে পরিচয় দিতে হইবে না। বুয়রযুদ্ধ প্রবন্ধেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছেন। সুখের বিষয়, এই বিষয়টী তিনি শেষ করিয়া গিয়াছেন। ইহাই যেন জীবনের শেষ কার্য্য ছিল। তিনি যেন কি এক স্বর্গীয় আদর্শ দেখাইতে এই ধরায় আসিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া, ধীরে ধীরে, আড়ম্বরহীন ভাবে, ঘুমাইতে, ঘুমাইতে, শেষে মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন ; অলক্ষিতভাবে কোন্ অদৃশ্যরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। চলিয়া যাওয়ার পর ভাবিলাম, আত্মীয়তার বাজারে কি দেখিলাম, কি দেখিলাম! যাহা দেখিলাম, তাহা বুঝি বা এ

জীবনে আর দেখিব না, যাহা হারাইলাম, তাহা বুঝি আর এ জীবনে আর পাইব না। সে যে কি বস্তু, আমি, অধম, আমি কি তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারি ?*

শ্রাবণ, ১৩০৯।

মৃত্যুর দ্বারে।

যে দেহ এবং যে সংসারে আত্মা বাস করে, সে দেহ এবং সে সংসার রোগ-কীটে এবং পাপ-বিষে ভরা, সুস্থ এবং সবল থাকিয়া অবিরাম উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া বড়ই কঠিন। একেত গণা কয়েকটী দিন মাত্র এই পৃথিবীতে আত্মার অবস্থিতি, তাহারও অধিকাংশ রোগ-সেবায়, পাপ-সংগ্রামে অযথা ব্যয়িত হইয়া যায়, পারত্রিক মঙ্গলের পথে চলিতে এবং অনাবিল পুণ্যশান্তির কথা ভাবিতে অবসর বড় কম। কত, কত রকমে মানব-জীবনের অধিকাংশ সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহা ভাবিলে প্রাণ ও মন অবসন্ন হয়। আমি দেখিতেছি, সর্ব্বদা যেন সপ্তরথী মানব-অভিমন্যুকে অকালে বধ করার জন্য বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সে সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও ঘুরিতে, ফিরিতে বা আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না। মৃত্যু—পতন, যেন মানবের অনিবার্য্য পরিণাম।

দিন দিন জড়বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতেছে, মানবের শরীরকে ধ্বংস করিবার জন্য কত কোটী কোটী কীট অবিরাম চেষ্টা করিতেছে, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান কত উজ্জ্বল রূপে প্রমাণ করিয়াছে, আত্মাকে বিনাশ করিবার জন্য কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য কতরূপে কত চেষ্টা করিতেছে। শত শত শত্রুর আবেষ্টনে মানুষ প্রতিনিয়ত প্রকম্পিত। একের হাত ছাড়াইলে দশ, দশের হাত ছাড়াইলে শত শত শত্রু আসিয়া প্রতিনিয়ত ঘিরিতেছে। মানবকে রক্ষা করার জন্য এক বিবেক শক্তি সদা বাধা দিতেছে, কিন্তু সে যখন পরাস্ত হইতেছে, তখন, মৃত্যু, পতন ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই।

দেহের বিচরণ-ক্ষেত্র এই সংসার, সেখানকার দূষিত বায়ু সদা দেহকে

---

* এই সংক্ষিপ্ত কথা কয়েকটী ৮ই পৌষ, ১৩০৮, তাঁহার শ্রাদ্ধের দিনে পঠিত হইয়াছিল।

এবং তৎসহ আত্মাকে আক্রমণ করিতেছে। দেহের ভিতরে বিবেক শক্তি রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট, কিন্তু সংসারে মানবকে কে রক্ষা করিবে? চতুর্দ্দিকে কুদৃষ্টান্ত কিলবিল করিতেছে; সুয়ের রাজত্ব দিন দিন যেন সংসার হইতে তিরোহিত হইতেছে। সংসারে ধর্ম্মরূপী বিবেক এক সময়ে রাজা ছিল, সে মানবকে রক্ষা করিত, কিন্তু কালবশে সেও পরাস্ত ও পরিম্লান হইয়া যাইতেছে,—সুয়ের পরিবর্ত্তে কেবল কুয়ের দৃষ্টান্ত বাড়িতেছে,—যে ধারে আসে, সে-ই কেবল কুদৃষ্টান্ত দেখায়। কুয়ের আধিপত্যে, হায়, হায়, সংসার দিন দিন যেন পিশাচের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে।

পরিত্রাণার্থী মানব-আত্মা এখন যায় কোথা? কাহাকে ধরিবে? কাহাকে ধরিয়া অনন্ত উন্নতির পথে চলিবে? দিন দিন যেন পথ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। সংসারে কাম-বাবু, লোভ-বাবু, মোহ-বাবু, মদ-বাবু ও মাৎসর্য্য-বাবুর আধিপত্য দিন দিনই বাড়িতেছে। কেহ বলিতেছে, ঋণ করিয়া মদ্য মাংস খাও, কখনও ঋণ শোধ করিও না, তাগাদায় আসিলে মহাজনকে কটুবাক্যে বা প্রহারে জর্জ্জরিত করিবে, না হয়, দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাইবে, ভয় কি, সুখে আহার বিহার কর। কেহ বলিতেছে, জগতে সুন্দরী স্ত্রী কেবল পুরুষের উপভোগের জন্য রহিয়াছে, স্বেচ্ছা-বিহার কর, শিক্ষা দীক্ষা, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ভাসাইয়া দেও; যে ধর্ম্মকথা বলিবে, তাহাকে ঘৃণা এবং উপহাসের জ্বলন্ত কটাহে নিক্ষেপ কর। এইরূপে, কত কত বাবু, কত কতরূপে তর্কজাল বিস্তার করিয়া মানুষকে আক্রমণ করিতেছে। সংসারে তাহাদেরই প্রাধান্য, সুতরাং তাহাদিগকে কে কি বলিবে? কেহ কিছু বলিলে তাহার সর্ব্বনাশের পথ মুক্ত হইবে, সুতরাং কেহ কিছু বলে না। ভাল যাহা ছিল, তাহা একালে, এইরূপে, অপ্রতিবাদে, একেবারে যে লোপ পাইতে বসিয়াছে। ধর্ম্ম, পুণ্য, পবিত্রতা,—শান্তি, আরাম, আনন্দ, একালে সব যেন অপ্রতিবাদে লোপ পাইতেছে; মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ব্যভিচার, মদ্যপান, পরনিন্দা পরগ্লানি, হিংসা, বিদ্বেষ, কুকথা, কুভাব; অত্যাচার, মামলা, মোকদ্দমা; যুদ্ধ, নির্যাতন, নির্ম্মম ব্যবহার—অপ্রতিহত ভাবে বাড়িতেছে,—এই সকলই এখনকার দিনে সকলের প্রধান সাধনার বিষয়। এইরূপ যুগে, এইরূপ সর্ব্বধর্ম্ম-সংহারকারী বাবু-যুগে, বল, ধর্ম্মার্থী মানব কাহার আশ্রয়ে যাইয়া দাঁড়াইবে? কত কত উপদেষ্টা উপেক্ষিত, কত কত গুরু পুরোহিত পরিত্যক্ত, কত কত প্রচারক সর্ব্বত্র নিন্দিত। উপদেশ, কুসংস্কার, ধর্ম্ম-

কথা বাতুলের প্রলাপ, পুণ্য শাস্তি, অলসেরই যেন উপভোগ্য। এইরূপ যুগমাহাত্ম্য-পূজায়, সর্ব্বত্র, সকলে মাতোয়ারা। মানবকে কে রক্ষা করিবে?

নিরাশ্রয় হইয়া, নিরাশায় ডুবিয়া, উন্নতিকামী মানব-আত্মা-শিশু এখন কেবল মৃত্যুর অন্বেষণ করিতেছে। বাঁচিয়া থাকিয়া যদি কেবল পাপ পথেই চলিতে হইল, তবে আর বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ কি? এইরূপ ভাবিয়া, ধর্ম্মকামী মানব-শিশু প্রতিনিয়ত মরণেরই অন্বেষণ করিতেছে! দেখিতেছি, এই জন্যই যেন বহ্নিপ্রলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায়, দিন দিন কত মৃত্যু-প্রলুব্ধ বন্ধু অসময়ে দেহবিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। লোকে বলে, কলিযুগে আয়ুক্ষীণ, দেহ দুর্ব্বল, তাই চতুর্দ্দিকে অকালমৃত্যু ঘটিতেছে। আমি বলি, তাহা নয়, দুরতিক্রম্য পাপবিষে মানুষ জর্জ্জরিত; পাপপথে দীর্ঘকাল মানব আত্মা চলিতে পারে না, চলিতে চায় না বলিয়াই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে সুসন্তানদিগের তিরোধান হইতেছে। যাঁহাদের এই দেহে বা এই সংসারে ধর্ম্মলাভের আশা নাই, তাঁহারা বৃথা খাটিয়া খাটিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পরিম্লান হইবে কেন? দেহ বা সংসার লীলাধাম, তাই বুঝি, আজ কাল ক্ষণস্থায়ী হইয়া আসিতেছে। যাই, যাই, যাই, তবে যাই। আয় মৃত্যু তুই কাছে আয়, তোকে চুম্বন করিয়া স্বর্গে যাই। মানব-অভিমন্যু সহস্র রথীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে, মহা পরাক্রান্ত ধর্ম্ম-ভীমেরও সাধ্য নাই যে, তাহাকে রক্ষা করিবে, অর্জ্জুনধর্ম্মসখা শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বাক্ ও নিশ্চেষ্ট, অভিমন্যুবধের আর অধিক বাকী নাই। পরাজিত হইয়া, মানবগতি ও মানব পরিণতি দেখিয়া দেখিয়া সকলে অবাক্।

যে দেহে পাপের রাজত্ব, যে সংসারে অধর্ম্মের রাজত্ব, সে দেহ ও সে সংসারের আর মায়া কি? এমন দেহ ও সংসার-মায়া পরিত্যাগ করিয়া অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে নীরবপুরে, সংযম-গুহায়, ইন্দ্রিয়াতীত তিমির গর্ভে প্রবেশ করিবার বাসনা দিন দিন প্রাণে বলবতী হইতেছে। দিন যায়, যায়,—আর পরাজিত হইতে আমি পারি না, মৃত্যু, তুই ঐ দেবধামের দেবদূত, আমাকে দেহাতীত এবং সংসারাতীত নিত্যধামে লয়ে যাবি ত শীঘ্র কাছে আয়। আমি—আর মোটেই পারি না।

শ্রাবণ, ১৩০৯।

মায়া।

মায়া, নববর্ষে প্রথম দিনে তুই একটু দাঁড়া, আমি তোর ভোলা দাস, আজি তোর সুধা মাখা স্বর্গীয় কান্তি একবার দেখি, একবার পূজি, একবার নমি। তুই একবার দাঁড়া, আমি বুঝিয়া লই, তুই কে, এবং তুই কি?

কোথা হইতে তোর আগমন, কোথায় তোর স্থিতি, কোথায় তোর পরিসমাপ্তি, আমি জানি না। কেন তুই আসিস্, কেন তুই থাকিস্, কে জানে? আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, নদীতে তরঙ্গ খেলে, সমুদ্র বুদ্বুদ উঠে,— ফুল হাসে; পাখী গায়, রমণী সৌন্দর্য্যে জগৎ মাতায়, আমি কার ইঙ্গিতে এসব দেখিয়া, শুনিয়া স্তম্ভিত হই? দেখিয়া দেখিয়া আত্মহারা হই? তুই কেন দরিদ্রের হৃদয়ঘরে আগমন করিয়া এমনই করিয়া আমাকে মাতাস, বল্ত?

পৃথিবীর আদান-প্রদান, মাথামাথি, কোলাকুলি বড়তে বড়তে। আমি দরিদ্র, নিঝুমে ঘুমাই, নির্জ্জনে মাতি, নীরবে জাগি, জাগিয়া জাগিয়া কেবল স্বপ্ন দেখি। কিসের স্বপ্ন? স্বপ্ন—কোথা হইতে আসিয়াছি, কেন আছি, কি করিতেছি, কোথায় চলিয়াছি? তুই বড় ঘরের সন্তান, কেন দরিদ্রের কাছে আসিস? বড় আশ্চর্য্য, তুই এক দিনও আমাকে পরিত্যাগ করিলি না! তুই প্রাণের ঘরে আজীবন এমনই ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছিস্ যে, আমি সর্ব্বক্ষণই তোর উত্তেজনায় অস্থির। দরিদ্র ও নরাধম পাপী বলিয়া সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিল, তুই কেন ছাড়িলি না?

আহা, এই বঙ্গদেশের কত ঘরে হাহাকার,—কত ঘরে অনশন, উৎপীড়ন, অত্যাচার, অবিচার। তুই কেন আমাকে সঙ্গে করিয়া সে সকল স্থানে লইয়া যা'স্। বালবিধবার চক্ষের জল এ বঙ্গে কত যুগ ধরিয়া পড়িতেছে, বিদ্যাসাগর গিয়াছেন, আর কেহ সে দিকে তাকায় না। কত কুলীনকুমারী কত কষ্টে যৌবন যাপন করিতেছেন, রাসবিহারী গিয়াছেন, আর কেহ সে কথা ভাবে না। আসামের কুলীগণ পেটের দায়ে কত অত্যাচার সহ্য করিতেছে; হায়, মহামতি কটন যাইতেছেন, কে আর তাহাদের কথা ভাবিবে? কৃষক সারাদিন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে খাটিয়া খাটিয়াও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। তাতে আবার জমীদারের অত্যাচারে নিষ্পেষিত। দরিদ্র ব্যবসা বাণিজ্য করিতে চায়, মহাজনের এবং ইনকমটেকস্ হাকিমের

তাড়নায় অবসন্ন। শেষে সংগ্রামে পরাজিত হইয়া, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে আত্মসমর্পণ করিতেছে। ভারতসভা এখন বড়লোকের সভা হওয়ার জন্য লালায়িত, কেহ আর দুঃখীর জন্য অশ্রু ফেলে না। তুই কেন দিবারাত্রি আমাকে এই সকল চিত্র দেখিতে উত্তেজিত করিস, বল্ত? কত কত পরিবার অনশনে অবসন্ন, কত কত মহিলা পাষণ্ড-হস্তে নিগৃহীত, কত কত লোক রোগে শোকে জর্জ্জরিত, তুই কেন আমাকে এ সকল দেখিতে মাতাইয়া তুলিস্? মরণের পথে চলিয়াছি,—সংগ্রামে পরাজিত, অবসন্ন, ক্লান্ত, শ্রান্ত; নিতাই বুঝিতেছি, আমার শক্তিতে আর কুলায় না, তবুও, কেন আমাকে এমন করিয়া নিত্য ধরিস? আমি সকলের হাত এড়াইয়া শেষে, অবশেষে বুঝি বা তোর নিকট পরাজিত হইলাম।

আমি, জীবনের এই শেষাংশে কাহারও দুঃখের কথা ভাবিব না মনে করি, তুই প্রাণে কেবল সেই সব কথা জাগাইয়া দিস্। আমি জন্মভূমির দুঃখের কথা, ভারতের জাতি সংগঠনের কথা, মানবের ধর্ম্মলাভের কথা, জাতীয় ভাষার উন্নতির কথা ভুলিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছি, তুই কিছুতেই ভুলিতে দি'ল না। আমার শক্তিতে কুলায় না, আমি এখন করি কি বল্? লোকের নিকট সাহায্য চাই, দয়া দুর্ঘট, সাহায্য পাই না, সহানুভূতি চাই, ঘোর ব্যবসাদারির রাজত্ব, সহানুভূতি পাই না, ভালবাসা চাই, লোক বড় কৃপণ, অথবা আমি নিতান্ত অযোগ্য, ভালবাসা পাই না, এখন করি কি বল্? সম্মিলিত চেষ্টা ভিন্ন এদেশ জাগিবে কি?—কিন্তু সম্মিলন এখন ঝগড়া বিবাদের আগুণে দগ্ধীভূত,—পরনিন্দা, বিদ্বেষ, এখন মিলনের ঘোর অন্তরায়। এখন করি কি? মায়া, তুই, প্রাণে আগুন জ্বালিলি যদি, তবে উপায় বলিয়া দে, এখন করি কি?

বুঝিয়াছি, তুই কোন কথাই শুনিবি না। বুঝিয়াছি, যত দিন দেহে প্রাণ এবং প্রাণে শক্তি আছে, ততদিনই তুই কামনার আগুন প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমাকে দগ্ধ করিবি। তোর কঠোর ইঙ্গিত, বড় কঠিন আদেশ। আমি বড় দুর্ব্বল, আমি বড় অসহায়, আমি ঐ আদেশ প্রতিপালনে প্রতিনিয়ত অসমর্থ। তুই নিত্য বলিতেছিস্, "সে তোকে ভালবাসে না, তাতে তোর কি, তুই তাকে ভালবাসিতে অকুণ্ঠিত থাক্,—সে তোর সেবা চায় না, তাতে কি, তুই অম্লানচিত্তে খাটিয়া খাটিয়া তার জন্য মরিতে প্রস্তুত থাক্,—তুই কিছুই করিতে পারিলি না, তাতে তোর কি, আমার আদেশ এই, তুই সকল কামনা বিস-

র্জ্জন দিয়া কেবল অন্তের জন্য খাটিতে, অন্তের জন্য ভাবিতে শিক্ষা কর, এবং যে তোকে তুচ্ছ করে, ঘৃণা করে, দূরে যাইতে বলে, তাহারও ধারে ঘেসিয়া সেবা কর, এবং স্বর্গীয় প্রেমে আলিঙ্গন কর। ইহাতে তোর বৈকুণ্ঠ এবং স্বর্গ মিলিবে।" আমি তোর এই আদেশ প্রতিনিয়ত শুনিতেছি, কিন্তু আদেশ প্রতিপালন করিতে পারি কই? দিনে দিনে গণা দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, কবে ভবের লীলা সমাপ্ত হইবে, কে জানে, কিন্তু ঐ আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলাম কই? কর্ত্তব্যের অনন্ত ভাণ্ডার চিরদিন অফুরান্ত রহিয়া গেল। দেখি দেখি, ধরি, ধরি, করি করি করিতেই দিন ফুরাইয়া গেল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত খাটি, এক কাজের পর আর এক কাজ, এক ব্রতের পর এক ব্রত, এক সাধনার পর আর এক সাধনা, এক সত্যের পর আর এক সত্য—এইরূপ ক্রমাগত অফুরান্ত শ্রেণীর পর শ্রেণী আসিতেছে। কে কবে অনন্ত কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারিয়াছে? কেহ কর্ত্তব্য শেষ করিয়া নিবৃত্তিতে পৌছিয়াছে কি না, জানি না, কিন্তু আমার বাসনার আরম্ভ আছে, শেষ নাই,—কর্ত্তব্য-দিনের ঊষা দেখিয়াছি, কিন্তু সন্ধ্যা দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। আমি, ক্ষুদ্র বস্তু, সামান্য জিনিস ধরিতে যাই, ধরিয়াই দেখি, সে ক্ষুদ্র নয়, খুব বড়। একটী বালুকণারও পরিমাণ করিতে আমার শক্তিতে কুলাইল না। দূর হইতে অত্যুচ্চ পর্ব্বতকে অতি কাছে দেখায়, কিন্তু হাটিতে হাটিতে প্রাণান্ত হইলেও, পর্ব্বতের দূরত্ব ঘুচে না, সে যেন আরো দূরে, আরো দূরে সরিয়া যায়। সামান্য কর্ত্তব্য, সামান্যত্ব দেখাইয়া, ঐ পর্ব্বতের ন্যায় আমাকে আকর্ষণ করিল, কিন্তু কত দিন খাটিলাম, আমার কর্ত্তব্য যেন চির অসমাপ্ত। জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম—সকল—সাধনাই অসমাপ্ত।

কেহ বলেন, তিনি খুব প্রেমিক, প্রেমের অকূলে তিনি ডুবিয়াছেন। কেহ বলেন, তিনি বড় জ্ঞানী, জ্ঞানের অতল গর্ভ স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছেন; কেহ বলেন, তিনি বড় কর্ম্মী, সকল কর্ত্তব্য শেষ করিয়া তিনি এখন কৃতিত্বে পৌছিয়াছেন। তাঁহারা এখন সর্ব্বপূজ্য,—মহা সম্মানে ভূষিত। তাঁহারা এখন জীবজগতের উপরে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম। কিন্তু আমি হায়, আমি আমিত্বের মূলেই ডুবিতে পারিলাম না, তোমার প্রেম, জ্ঞান ও কর্ম্মের মর্য্যাদা আমি কি বুঝিব? আমি রূপ অকূল সাগরের পরপারে যদি পৌছিতে পারিতাম, অথবা, আমি সর্ব্বস্ব-সাধনা যদি ভুলিতে পারিতাম, তবে

হয়ত, জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারিতাম, পর-তত্ত্ব কি, জানিতে পারিতাম। আমার সকল। সাধন, সকল কথা কেবল "আমি-ত্বেই" যেন নিবদ্ধ। "আমিত্বের" বোঝা বহিতে বহিতে, আমিত্বের খাটুনি খাটিতে খাটিতে আমার দিন গেল। আমিত্বকে জগত্বে বিসর্জ্জন দিতে পারিলাম কই?

লোকে বলে, তাঁহার কত কৃতিত্ব,—তাঁহার লেখা ভাল, কথা ভাল, গান ভাল, তাঁহার চেহারা ভাল, আকৃতি ভাল, তাঁহার সেবা ভাল, তাঁহার কর্ম্ম ভাল। ইত্যাদি ইত্যাদি রূপ লোকে তাঁহার কত প্রশংসা করে। ভালোর প্রশংসা করিবে না ত কাহার প্রশংসা করিবে? মায়া আমাকে কিন্তু ভালো-রও কি এক আভাস দেয়, মন্দের ভিতরেও কি এক শোভা দেখায়। মায়া দেখাইয়াছে, পরিত্যক্তা, নিবিতা ভিখারিণী পথে পড়িয়া অনাহারে কাঁদিতে কাঁদিতেও আবার অন্য ক্ষুধিতকে খাওয়াইবার জন্য অস্থির। দেখাইয়াছে, কুৎসিৎ কদাকার নারী অম্লান চিত্তে অপরাধীর শত অপরাধ ভুলিয়াও কোল দিতেছে,—প্রাণের মমতা ছাড়িয়া কত রোগীর শুশ্রূষা করিতেছে। যখন এ সকল দেখি, তখন, তুমি যাহাকে ভাল বল, কেবল তাহার প্রশংসা-কীর্ত্তনে মায়া আমাকে মত্ত থাকিতে দেয় না, ঐ কুৎসিতের গুণকীর্ত্তন না করিলে ছাড়ে না। মায়া বলে, চক্ষে বিশ্বাসের অঞ্জন লেপিয়া দেখিলে, দেখিতে দেখিতে সব যে ভাল হইয়া যায়, মন্দ বা কুৎসিত কোন বস্তু থাকে না, সব সুন্দর দেখায়। বন্ধু, তুমি কি বল? ভালও যাঁহার, মন্দও তাঁহারই নয় কি? মন্দ ভালোরই রূপান্তরিত অবস্থা,—এক প্রকৃতির দুই দিক। বন্ধু তুমি কি বল?

সে বলে, আমি তাহাকে ভালবাসি না,—ইহাকে, তাহাকে, উহাকে ভাল-বাসি। সে জানে না যে, যাঁহাকে দেখি, তাহার সহিত তুলনা করিয়াই তাঁহাকে কম বেশী আদর করি। তুলনার বস্তু যে আমার "সে", সে তাহা বুঝে না। মন্দকে বুঝিলে ভালোর গৌরব করা, ও ভালোকে বুঝিতে পারিলে মন্দের নিন্দা করা সম্ভব। কিন্তু সে এ কথা বুঝেনা, সে বড় অবোধ। সে মনে করে, আমি তাহাপেক্ষা অন্যকে অধিক ভালবাসি। এই সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা প্রকৃতি যে আমার নিকট 'সে' ময় হইয়া গিয়াছে, সে ইহা বুঝি-য়াও বুঝিল না। জীবনের শেষাংশে এ কথা আর তাহাকে বুঝাইয়া কাজই বা কি? মায়া, তবুও তাহাকে বুঝাইতে বলে। কি কঠোর

আদেশ। কত কোটী কোটী "সে" এই জগতে আছে, সে কে মনের কথা বুঝাইব?

মায়ার আদেশে তবু আমি দ্বারে দ্বারে বুঝাইতে যাই, কিন্তু ভাষা সরে না, বুঝাইতে পারি না। অবাক্ হইয়া কেবল চাহিয়া থাকি। জানিই বা কি, বুঝাইবই বা কি? সে যদি না বুঝিয়া অবিচার করে, তাহাতেই বা আমার কি? সে না বুঝিয়াও যদি আমাকে প্রহার করে তাহতেই বা আমার কি? আমি কিছু প্রত্যাশা না করিয়াও যদি তাহাকে ভালবাসিতে পারিতাম, তবে বুঝি বা প্রতিদান না পাইলেও আমার কষ্ট হইত না। আমার প্রার্থনা যদি সে পূর্ণ না করে, তাহাতে কি, আমি অবিরত তার মঙ্গল প্রার্থনা করি না কেন? রোগের দিনে বা শোকের দিনে, দুঃখের দিনে, সে যদি কাছে নাও আসে, তবুও আমি কেন কাতর হই? জানি না কি যে, "সে" আমারি,—জানি না কি সে, অনন্ত "সে"ময় জগৎকে "আমার" জ্ঞান করিবার জন্যই আমার সৃষ্টি।

কঠোর সাধন, আমি আজ সরল ভাবে বলিতেছি, মায়া-প্রদর্শিত এই কঠোর সাধনায় আমি অসিদ্ধ। অন্যান্য সাধন সহজ, যশ নিন্দার অতীত হওয়া রূপ সাধন যেরূপ কঠিন, প্রতিদানের প্রত্যাশা না রাখিয়া, অবিভেদে সকলকে আত্মদান করা তেমনি কঠিন। আত্মদান করি নাই, তবুও কেন জগতে আছি? আমার জয়, না মায়ার জয়?—সে বিচারের দিন আসিতেছে।

প্রতি মুহূর্ত্ত সংগ্রাম চলিয়াছে,—ভালবাসা না পাইয়াও কখন ভালবাসি, আবার কখনও ভালবাসিয়া প্রতিদান না পাইয়া বিরক্ত হই। এইরূপ আসক্তি এবং বিরক্তির ভিতর দিয়া, অনন্ত সংগ্রাম করিতে করিতে অনন্তের পথে চলিয়াছি। কত দিন ধরিয়া এইরূপ ভাবে হর্ষ বিষাদ, আশা নিরাশা, আসক্তি বিরক্তি, পুণ্য পাপ, ভাল মন্দের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহা কেন জানে? শ্রান্ত এবং ক্লান্ত হইয়া ছাড়িতে চাই, কিন্তু প্রকৃতি ছাড়ে না। ইহা মহামায়ার জয় ভিন্ন আর কি? স্ত্রী পুত্র, পরিবার পরিজন কেহই আমার নয়, তবুও তাহাদিগের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির। এই সংসার মানবের পরিণাম নয়, তবুও এই সংসারের জন্য খাটিয়া খাটিয়া আত্মদানে অসমর্থ মানব অবসন্ন। চক্ষু মুদ্রিত করিলে সব ফাঁকি, তবুও তাহার জন্য মানুষ দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত।" ইহা মায়া নয় ত আর কি? মায়া, দেবধামের দেবদূত,

সংসার শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষক। কে ইহার হাতে পরাজয় স্বীকার করে নাই ?

মায়ার হস্তে ভারার্পণ করিয়া মহা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবকে মহামায়া এই সংসারে পাঠাইয়াছেন,—এই মায়ার বন্ধন বা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন না হইলে ভবলীলা শেষ হয় না। যিনি যতই চেষ্টা করুন, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার অতীত হইতে কেহই পারিবেন না। দুঃখ এই,—সময় থাকিতে থাকিতে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা ডুবাইতে পারিলাম না। যখন পারিব, বুঝি বা তখনই, মায়ার জাল এবং কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইবে, ভবলীলা সাঙ্গ হইবে। কিন্তু তাহা কবে হইবে, কে জানে ?

বৈশাখ, ১৩০৯।

মিলনের কথা।

ভারতবর্ষে অসংখ্য সম্প্রদায়। অসংখ্য সম্প্রদায়ের অসংখ্য প্রকার মত। মতের ধর্ম্মসাধনে অধিকতর মনোযোগী হওয়ায়, ধর্ম্মের অন্তরঙ্গের প্রতি লোকের দৃষ্টি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মত সংঘর্ষণে নানারূপ পঙ্কিল বাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিলাসিতার প্রতি আসক্ত হইলে যেমন সাত্ত্বিকতার দিকে দৃষ্টি কমে, ধর্ম্মের বহিরঙ্গ, অর্থাৎ মত সাধনে আসক্ত হইলে, প্রেম, পুণ্য, ও ভক্তির দিকে, তেমনই, লোকের দৃষ্টি কমিতে থাকে। যখন এদেশে সাম্প্রদায়িক কলহ-বিবাদে ঘোরতর অশান্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, সেই সময়ে এদেশে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। সে অতি পবিত্র দিন গিয়াছে।

৭২ বৎসরে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা সংস্কার সম্বন্ধে ভারতবর্ষের যে সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের যে অবস্থা ছিল, বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের অবস্থা, প্রায় সেইরূপ হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন, বহু-বিবাহ-নিবারণ, বয়স্থা মেয়ের বিবাহ, জাতিভেদ-নাশ, অসবর্ণবিবাহ ও বিধবা-বিবাহ প্রচলন, জাতিনির্ব্বিশেষে শাস্ত্র প্রচার, ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তিত এ সকল সংস্কার অল্পে অল্পে হিন্দু সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মহিলাগণের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের

আবশ্যকতা ছিল, তাহাও ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে। বিলাত-প্রত্যাগত যুবকদিগকে এখন হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা হইতেছে। ঘরে ঘরে এখন বয়স্থা মেয়ে দেখা যায়। পৌত্তলিকতার দুর্গভেদ করা হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে এদেশে পৌত্তলিকতার প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মিতেছে। এবার জাতীয় মহাসমিতির অঙ্গীভূত সামাজিক সমিতিতে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা যে ব্রাহ্মসমাজেরই অঙ্গীভূত কাজ, তাহাতে আর সংশয় নাই। এ সকল দেখিলে সকলের মনেই আনন্দ হয়। জাতীয় ভাষার উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, ব্রাহ্মসমাজ সে সম্বন্ধেও নেতা। বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য ব্রাহ্মসমাজ যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। মহাত্মা রামমোহন রায় আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। মহাত্মা অক্ষয় কুমার এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষার মূল সোপান। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'আধুনিক বাঙ্গালার সৃষ্টিকর্তা, প্যারী চাঁদ মিত্র', তিনিও একেশ্বরবাদী ছিলেন। তৎপর বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন,—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ভক্ত কেশবচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, গৌরগোবিন্দ, শিবনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, রবীন্দ্রনাথ, এবং তাঁহাদের সহচরগণ অম্লানচিত্তে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া আসিয়াছেন। ইহা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয় যে, বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালা ভাষার প্রধান প্রধান মাসিক পত্রগুলি প্রায় সকলই ব্রাহ্মসমাজের লোক দ্বারা সম্পাদিত। এ সকলই ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, ইহা হওয়া সত্বেও, এদেশে প্রকৃত ধর্ম্মভাব ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা বদ্ধমূল হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ বাহিরের কাজ লইয়া যেন ব্যস্ত ছিলেন,—নিজ সমাজে বা দেশের কোথাও প্রকৃত ধর্ম্ম বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই। পারিলে এত ঝগড়া বিবাদ দেখা যাইত না। বাহিরের ব্যাপার কোন সমাজকে চিরকাল ধর্ম্ম-পথে দৃঢ় এবং অটল রাখিতে পারে না, অন্তরঙ্গ সাধন ভিন্ন কখনও কোন ধর্ম্ম-সমাজ এজগতে দীর্ঘকাল নরনারীর কল্যাণ সাধন করিতে পারে নাই। অন্তরঙ্গ সাধন ভিন্ন মানুষের চরিত্র ধন লাভ হয় না, চরিত্র ভিন্ন মানুষকে এই পাপপ্রলোভন তরঙ্গময় ভবসংসারে কিছুতেই ঠিক রাখিতে পারে না। চরিত্রের মূলে বিশ্বাস এবং ভক্তি। বিশ্বাসে অটল এবং ভক্তিতে সুদৃঢ়

না হইলে কে ধর্ম্মজগতে টিকিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, অন্যান্য বহির্বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, সাধারণের চরিত্র লাভে তেমন কিছু সাফল্য দেখাইতে পারেন নাই। ইহা যারপরনাই পরিতাপের বিষয়। কেবল পরিতাপের বিষয় নয়, গভীর হইতে গভীরতর শোচনীয় অবস্থা।

সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রচারিত সত্য সকল অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্ম কি নূতন কথা এজগতে ঘোষণা করিয়াছেন? নূতন কথা এই, আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ সংস্থাপন,—মধ্যবর্ত্তী নাই গুরু নাই, অভ্রান্ত শাস্ত্র নাই,—মানবাত্মা ও ঈশ্বরে মহাযোগ সম্ভব। এই সার কথা এমন সুন্দর ভাবে ব্রাহ্মসমাজ প্রচার করিয়াছেন যে, পাপী তাপী, দুঃখী নগণ্য,—কাহাকেও আর নিরাশ হইতে হইবে না,—"ডাকো তবেই তাঁহাকে পাইবে।" "ডাকো, তবেই তাঁহাকে পাইবে,"—ইহা অতি সুন্দর কথা, কিন্তু মতেই যদি ইহা পালন করি, কখনও যদি তাঁহাকে না ডাকি, বা তিনি হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেও তাঁহাকে যদি না দেখি, দেখিয়া তাঁহাতে যদি অনুরক্ত না হই, অনুরক্ত হইয়া যদি তাঁহার অনুগত না হই, অনুগত হইয়া যদি তাঁহাকে আত্মস্থ না করিয়া লই, শুধু কেবল মতে, তাঁহাকে ডাকিলেই পাওয়া যাইবে, ইহা মানিয়া চলিলে কি হইবে? সন্দেশ না খাইলে সন্দেশের মিষ্টত্ব কেহ অন্যের উপদেশে যেমন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, ধর্ম্মের আদেশ বা মতকেও আত্মস্থ না করিয়া, কেবল তোতাপাখীর ন্যায় কণ্ঠস্থ বা মুখস্থ করিলেই, সেই প্রকার, ধর্ম্মের মিষ্টত্ব হৃদ্‌বোধ হয় না। ধর্ম্ম আত্মস্থ বা জীবনগত না হইলে চরিত্রের উদয় হয় না। ধর্ম্ম যখন জীবনগত হয়, তখনই চরিত্রের উদয় হয়। চরিত্রের উদয় হইলেই "ভক্তি" যে কি বস্তু, মানুষ বুঝিতে পারে। ভক্তির আস্বাদন একবার পাইলে আর মানুষ সংসারের নরকে পচিয়া মরিতে চায় না।

আমি কি করি?—আমি ভক্তিতত্ত্ব বুঝি না, ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া বাহিরে ধর্ম্মের নাম কিনিয়া কেবল বাহিরেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কাহারও নিন্দা আমার সহ্য হয় না, প্রহারে প্রহার, চতুরতায় চতুরতা, নিন্দায় নিন্দা—ব্যবহারিক জীবনে আমার ধর্ম্মশাস্ত্র এইরূপ রূপান্তরিত। আমি আশা করিয়াছিলাম, দলাদলি ভাঙ্গিয়া, ব্রাহ্মসমাজ হিংসা-বিদ্বেষ-বর্জ্জিত এক অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসমাজ সংস্থাপনে সমর্থ হইবে, কিন্তু

তায়, ১২ বৎসর পরে আজ কি দেখিতেছি? দেখিতেছি, কেবল দলাদলিই বৃদ্ধি হইতেছে, ক "খ"য়ের নিন্দা করে, খ "ক"য়ের নিন্দা করে। চতুর্দ্দিকে কেবল নিন্দার বাজার বসিয়া গিয়াছে। এক মায়ের সন্তান সকল, এক ধর্ম্ম, এক প্রেম, এক পরিবারের অধীন হইয়াও, ব্যক্তিগত ঝগড়া বিবাদে মাতিয়া বেড়ায়। আমি কি এই কথার অতীত? না—তাহা মোটেই নই। আমি যদি চরিত্র পাইতাম, তবে তোমার চরিত্রের আদর্শ অন্বেষণ করিতাম, এবং তখন বুঝিতে পারিতাম, তোমার চরিত্র আর কিছুই নয়, উহা তোমাতে বিশ্বেশ্বরের বিশেষত্বের প্রতিষ্ঠা মাত্র। আমি সেই বিশেষত্ব দেখিতাম, এবং তাহাতে মজিতাম। মজিতাম এবং তোমার অনুগত হইতাম। এইরূপে, তোমার চরিত্রে, তাহার চরিত্রে, উহার চরিত্রে—সকলের মনে মূলে লইয়া, সকলের চরণের রেণু হইয়া লাগিয়া থাকিতাম, কেহ পা ঝাড়িলেও ছাড়িতাম না। মণ্ডলের চিন্ময়ের অনিন্দিত বিমলরূপে এমন ভাবে নিমগ্ন রহিতাম, পর কি, আপন কি, বিভব কি, জানিতাম না—সকলের বিশেষত্বে আমার জাতিত্ব বিলাইয়া দিতাম। সকলে অতল কালো আমাকে আর খুঁজিয়া পাইত না, আমি এই অগাধ মানব-পরিবারে সেবাদাস রূপে মিলাইয়া যাইতাম। আমার ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যাইত,—একটা অনামা, অপরিচিত চরিত্র কেবল বিদ্যমান থাকিত। অণু সকল মিলিয়া মিশিয়া সাগরের উৎপত্তি হইত,—মানবে মানবে মিলিয়া মহা-মানব বা অ-মানবের সৃষ্টি করিত। তিনি কে, বন্ধু, বলত? তিনি আর কেহই নহেন, তিনিই বিশ্বপাণ।

বন্ধু, তুমি কি বলিতেছ? সংস্কারের কথা? তাহা ঢের শুনিয়াছি, এখন ও সকল থামাও। জ্ঞান, বিজ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের কথা? ও সকলের ঢের পরিচয় পাইয়াছি, এখন ক্ষণকাল আমাকে বিশ্রাম দেও। আমি আত্মার মূলে প্রবেশ করিয়া, বাহ্যজগতে ঘুমাইয়া পড়িতে চাই, ভাই, আমাকে একটু বিশ্রাম দেও। এ জগতে ধর্ম্মের প্রয়োজন যে জন্য, সেই আত্মশুদ্ধি বা চরিত্র, আত্মায় আত্মায় মিলন বা বিশ্বপ্রেমাহুতি লইয়া যতদিন তুমি উপস্থিত হইতে না পার, ততদিন, তোমার ঐ জ্ঞান বিজ্ঞানের কচ্কচি একটু থামাও, আমি নীরবে ঘুমাইয়া পড়ি। আমি মহামিলন দেখিতে আসিয়াছিলাম, ভূতের কচ্কচি শুনিতে নয়। যদি সেই মিলন-ধামে আমাকে লইয়া যাইতে পার, এস, তোমাকে প্রণাম করি, তোমাকে

আলিঙ্গন করি। নচেৎ তোমার ঐ হিংসা-বিদ্বেষের মূর্ত্তিকে এখন একটু সম্বরণ, ও সংযত কর, পৌনঃপুনিক বক্তৃতার অভিনয় আর দেখাইয়া কাজ নাই; এস, এখন সকলে মহাসাধনারূপ মহানিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়ি। তুমিও আমাকে চিনিলে না, আমিও তোমাকে চিনিলাম না যখন, তখন তুমিই বা আমার কথা কি বুঝিবে, আমিই বা তোমার কথা কি বুঝিব? মানব-প্রাণরাজ্যের বর্ণপরিচয়ই এখনও শিক্ষা করি নাই, কি বুঝিব? তোমারাও, আমার ন্যায়, বুঝিবা, আজও সে রাজ্যের তত্ত্ব পাও নাই; পাইলে মিলনের মর্ম্ম বুঝিতে, দশজন একাত্মক হইলে যে মহাশক্তির উদয় হয়, তাহা জানিতে পারিতে, চরিত্রের মর্ম্ম জানিতে,—ব্রাহ্মধর্ম্মের উদয় যে জন্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতে। বৃথা বকাবকিতে আর কাজ কি? এস, এখন অহং মূর্ত্তি সম্বরণ করি। অহংটা না গেলে বিশ্বপ্রাণের উদয় হইবে না,—কিছুতেই না, কিছুতেই না। অহং-দস্যুর যখন বিনাশ হইবে, তখন থাকিবে কেবল বিমল চরিত্র। আত্মিক জগতে চরিত্ররূপী আত্মা সকল সযত, নত, ভক্ত, এবং সর্ব্বশেষে প্রেমে মত্ত। প্রেমানন্দে যখন সকলে মত্ত, তখন সৎ, চিৎ এবং আনন্দের অরূপ রূপে সকলে নিমগ্ন। সেখানে ব্যক্তিত্বের বড়াই নাই, বিচ্ছেদ নাই, ঝগড়া নাই, পরনিন্দা নাই, বিদ্বেষ নাই, পরশ্রীকাতরতা নাই—রিপুর উত্তেজনা মোটেই নাই। সে দেবধামের দেবলীলা। ব্রাহ্ম, তুমি যদি সে লীলা দেখিতে চাও, অহং-অসুরকে বিনাশ করিয়া সংযত, নত, ভক্ত হইতে শিক্ষা কর, মহামিলনের জন্য মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হও।

মাঘ ১৩০৮।

সমাজ-শক্তি।

ধর্ম্মের দুই প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি, রাজা এবং সমাজ। রাজা এবং সমাজ উভয়ই মানবকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার সোপান। রাজা ব্যক্তিগত পাশব শক্তি, সমাজ সমষ্টিগত বিবেক শক্তি। রাজা পাশব-শাসন বলে এবং সমাজ প্রেম-বিবেক-বলে এ জগতের শাসন সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। রাজশক্তি যেখানে সমষ্টিগত সাধারণ শক্তিতে অভ্যুত্থিত, তথায় শান্তি বিরাজ করে, শাসন, সংরক্ষণ শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হয়। অন্যত্র কঠোর শাসন

থাকিলেও অশান্তি এবং পাপ নির্ম্মূল হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে মানবকে রক্ষা করিবার জন্য একমাত্র সমাজ-শক্তিই দণ্ডায়মান। পাপী, সকলকে তুচ্ছ করিতে পারে, কিন্তু সমাজ-বিবেকের নীরব শাসনকে উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু বিবেক যদি ম্লান হয়, সমাজ যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, স্বেচ্ছাচারিতা যদি তথায় রাজত্ব করে, তবে মানবকে রক্ষা করিবে কে? রক্ষা করিবার বুঝি বা প্রত্যক্ষ আর কেহ নাই।

বিবেক প্রতি মানুষকে অসৎ হইতে সতে, প্রেয় হইতে শ্রেয়ে, অসুরত্ব হইতে দেবত্বে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উত্তেজনায় বা অবহেলায়, অসংযমে বা অনিয়মে অনেক সময় বিবেক পরিম্লান হইয়া যায়। এই কারণে সব সময়ে মানুষকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইতে পারে না। এই সময়ে রাজশক্তি মানুষকে সাহায্য করে। কিন্তু রাজা যদি পতিত হন, কে রক্ষা করিবে? সে অবস্থায় সমাজ মানুষকে রক্ষা করে। সমাজ-বিবেকের তীক্ষ্ণ শাসনে পাপীর অন্তরে অনুতাপ উপস্থিত হয়, পাপী উদ্ধার হয়। কিন্তু সমাজ যদি পতিত হয়, তবে কে রক্ষা করিবে? সে অবস্থায় আর প্রত্যক্ষ রক্ষাকর্ত্তা নাই। যে সমাজের সমষ্টিগত-বিবেক পরিম্লান ও আদর্শ খর্ব্ব, বুঝি বা সে সমাজের প্রয়োজনও নাই।

রাজশক্তি, সব সময়ে বিবেকানুমোদিত নহে। বংশ-পরম্পরায় পাশবশক্তি কত শত শত পাপের অঙ্কুর সকলকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিতেছে। সে শক্তির শাসন মানুষ গ্রাহ্য করে না, অথবা সে শক্তি নিরপেক্ষ ন্যায়ের শাসন দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না।

প্রতি ব্যক্তির বিবেক যে সমাজে উজ্জ্বল, পরিম্লান নহে, সে সমাজ সমষ্টিগত বিবেক-প্রাধান্যে সমুজ্জ্বল। সমবেত লোকের সম্মিলিত সমুজ্জ্বল বিবেক যে সমাজের রাজা, সেই সমাজের পাপের অঙ্কুর উন্মূলিত। সেখানে পাপী সদা অনুতপ্ত, ভয়ে জড়সড়। সম্মিলিত বিবেক-শক্তিই মানবত্ব। মানবত্বই পথভ্রষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মপথের ধ্রুবতারা। কিন্তু যে দেশে মানবত্বের আদর্শ নাই, সকলে স্ব স্ব প্রধান, স্বেচ্ছাচারী, শিথিল-বিবেক, সে দেশ রক্ষার উপায় কোথায়? বিবেক যে দেশে মরিয়া গিয়াছে, বা যে দেশে মরিয়া যাইতেছে, সে দেশও মরণের পথে চলিয়াছে, তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

পরিবারের কর্ত্তা বিবেক-প্রধান লোক হইলে, সে পরিবার পতনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। সমাজে বিবেক প্রধান লোক কর্ত্তা হইলে, সে সমা-

জেরও পতনের ভয় নাই। ডিল্‌কে, পাবনেল অসাধারণ লোক হইয়াও পতনের পর বিবেক-চালিত যে ইংলণ্ড-সমাজে নেতৃত্ব পদ হইতে নমিত হইয়াছিলেন, সে ইংলণ্ড-সমাজ অনেক বার পাপের হস্তে পড়িয়াও মারা যাইতেছে না, এখন পৃথিবীতে প্রধান। আর আমাদের দেশ, তুমি, আমি, সে—কত শত পতিত লোকের নেতৃত্বে উঠিতে চাহিতেছে। তাহা পারিবে কেন? উঠিতে না উঠিতে পড়িয়া যাইতেছে,—অথবা কত কাল ধরিয়া পড়িয়াই রহিয়াছে। অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? পাপী নেতা হইলে সমাজকে মজিতে হয়, সমাজের আদর্শ খর্ব্ব হয়। পতিত ব্যক্তি, সাধারণকে পতনের পথেই লইয়া যায়।

উপরের শ্রেণীর চরিত্রানুপাতে নিম্নশ্রেণীর চরিত্র গঠিত হয়। উপরের শ্রেণী সৎ হইলে নিম্ন শ্রেণীও সৎ হয়, উপরের শ্রেণী খারাপ হইলে নিম্ন-শ্রেণীও খারাপ হয়। আমাদের দেশের উপরের শ্রেণী বিলাসিতায়, ব্যভিচারে, মদ্যপানে যদি ডুবিয়া যায়, নিম্ন শ্রেণীকে কে রক্ষা করিবে?

আমাদের দেশের নেতৃত্ব বংশানুক্রমিক। যে বংশের যে ব্যক্তি উপরে ছিল, সে বা তার বংশধর, যতই অপরাধী বা পতিত হউক না কেন, চির-কালই নাকি উপরে থাকিবে। বংশের উপরে এখন আবার ধনের প্রাধান্য উপস্থিত। ধনী যত অপরাধীই হউন না কেন, নেতৃত্ব পাইবেনই। পতিত লোকের নেতৃত্ব যে সমাজে, সে সমাজ ডুবিবে, তাহার আর কথা কি? উচ্চশ্রেণী ও ধনী শ্রেণীর শিথিল-বিবেক, নিম্ন শ্রেণীতে সংক্রামিত হই-তেছে,—দলে দলে লোক পাপের পথেই চলিতেছে। তুমি বল, বক্তৃতায় দেশ জাগিবে, লেখায় দেশ জাগিবে। হায় রে বুদ্ধি! চরিত্রের আদর্শ ভিন্ন কোন্ দেশ কবে জাগিয়াছে বল ত? তুমি উল্লাসে পাপের সেবা করিবে, এবং অন্যকে জাগাইবার জন্য বক্তৃতা করিবে। নিশ্চয় জানিও, তোমার সে চেষ্টা কখনও সফল হইবে না। অগ্রে নিজে ভাল হও, তৎপর তোমার দৃষ্টান্তে অন্যে ভাল হইবে। নিশ্চয় জানিও, শুধু কথায় মানুষ ভুলিবে না।

নিয়ম, বিধি, সংহিতা সকল যখন বিবেকানুমোদনে রচিত হয়, তখন তাহা ঈশ্বরের প্রেরিত শাস্ত্র। আর সে সকল যখন স্বেচ্ছাচারী প্রধানদিগের উচ্ছৃ-ঙ্খলতার অনুমোদনে রচিত, তখন তাহা ভূতের শাস্ত্র। সব দেশেই নিয়ম, বিধি, সংহিতা কোন না কোন আকারে আছে, অথচ লোক কেন পাপের পথে যাইতেছে? কারণ, উপরের শ্রেণী সে সকল মানে না। অথবা

উপরের শ্রেণীর স্বেচ্ছাচার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই ঐ সকল বিধি ব্যবস্থা সৃজিত, সুতরাং তাহাতে মানুষের মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। দেবাসুর—মানবে দুইয়েরই আবির্ভাব হয়। দেবত্বের প্রাধান্যে যখন মানুষ চলে, ফেরে ও কার্য্য করে, তখন মানুষের দ্বারা নিজের এবং সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়, আর যখন আসুরিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়, তখন কেবল পশুত্বের অভিনয় চলিতে থাকে, তখন তাহা দ্বারা কোন মঙ্গলের আশা থাকে না। দেব-ভাবের আবির্ভাবে যখন বিধি ব্যবস্থা প্রণীত হয়, তখন তাহার দুর্জ্জয় প্রভাবে অসুর সম মানুষও কম্পিত হয় এবং ভয়ে ভয়ে তাহার অনুসরণ করে। কিন্তু আসুরিক ভাবের আবির্ভাব দেখিলেই মানব সাধারণ উচ্ছৃঙ্খল, শিথিল-বিবেক হয়। তাহারা মনে করে, তাহারাই জগতের রাজা। তাহারা যত জঘন্য কাজই করুক, তাহাদের আর শাস্তির ভয় নাই, মরণের ভয় নাই, কিছুই নাই। দুর্জ্জয় প্রভাবে তাহারা ধরাকে পাপে ডুবাইয়া দেয়।

হিন্দু সমাজের বিধি ব্যবস্থার অন্ত নাই। কিন্তু এক সময়ের এক দলের বিধি-ব্যবস্থা অন্য সময়ের অন্য দলের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। দেবত্বের আবির্ভাবের সময় যে সকল সুন্দর সুন্দর বিধি ব্যবস্থা হইয়াছিল, আসুরিক ভাবের আবির্ভাবের সময় তাহা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র বিধবা বিবাহের অনুমোদনও করিয়াছেন, আবার বিরুদ্ধেও বলিয়াছেন। অনেক বিধিরই বিরোধী বিধি বর্ত্তমান। এরূপ অবস্থায় সমাজ কাহার আদেশ, কোন্ অনুশাসন মানিয়া চলিবে? নূতন ভাবে সমাজ গঠনের জন্য সম-য়োপযোগী বিবেকানুমোদিত নূতন বিধি ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কে সে চেষ্টা করিবে। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের একটু চেষ্টা ছিল, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। পুরাতন গলদে গা ঢালিয়া কোনরূপে সমাজ চলিতেছে। মদ্যপান, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহিলা মর্দ্দন, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, জাল জুয়াচুরি, ঘুষ গ্রহণ—দিন দিনই যেন দেশে বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশ ও সমাজকে কে রক্ষা করিবে? রাজা বিদেশী, সমাজ গেল কি থাকিল, তাহাতে তাঁহার কোন স্বার্থ নাই। আর আমারও সমাজ বিধি সম্বন্ধে রাজাকে হস্তক্ষেপ করিতে দিতে নারাজ। রাজা কিছুই করিতেছেন না, সমাজের নেতারা অনেকেই স্ব স্ব লইয়া ব্যতিব্যস্ত, অন্যদিকে অনেকেই পতিত, সুতরাং কে বা সমাজের কথা ভাবিবে, কে বা দেশ রক্ষা করিবে?

গত সেন্সস্ রিপোর্টে প্রকাশ, বঙ্গের বৈদ্য, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের সংখ্যা দিন দিনই কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? সমাজের অশেষ দুর্গতিই ইহার কারণ নয় কি? বিবাহের দোষেই দুর্নীতি, ব্যভিচার সমাজে প্রশ্রয় পাইতেছে, বিবাহের অসমতার দরুণই অশেষবিধ পাপ প্রশ্রয় পাইতেছে, দুর্ব্বলতা ও রোগ বাড়িয়া লোক সংহার করিতেছে। বিবাহের ক্ষেত্র প্রশস্ত না হইলে বাঙ্গালার সমাজ রক্ষার আর উপায় নাই। কিন্তু কে সে সকল কথা ভাবিবে?*

এদেশ রক্ষার পক্ষে ব্রাহ্মসমাজকে এক সময়ে প্রধান সহায় মনে করিতাম। মনে করিতাম, ব্রাহ্মসমাজ আদর্শের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া অগ্রসর হইলে এদেশের সকল সমাজ সেই আদর্শে অগ্রসর হইবে। কিন্তু এতকাল পরেও, সমাজরক্ষার জন্য, নববিধান সমাজ ছাড়া, এ সমাজের অন্যান্য বিভাগে বিবেকানুমোদিত বিধি ব্যবস্থা প্রণীত হয় নাই। তাহার ফল এই হইতেছে, দিন দিন যেন স্বেচ্ছাচারিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার দিকেই সমাজের গতি হইতেছে। অনুতপ্ত পতিত লোকদিগকে আশ্রয় দিয়া সমাজ

---

* উন্নতির পথে কি ধ্বংসের পথে— বাঙ্গালী জাতি এখন কোন্ পথে অগ্রসর? একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়—বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উন্নত শ্রেণী, ক্রমেই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। কয়েক বৎসরের আদমসুমারীর আলোচনা করিলেই ইহা প্রতিপন্ন হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৯ বৎসরের হিসাব আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই—বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোহর প্রভৃতি জেলায়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতির সংখ্যা কিরূপ হ্রাস হইয়াছে। প্রথমতঃ নিম্নলিখিত তালিকায় ব্রাহ্মণের অবস্থান্তর দৃষ্টি করুনঃ—

জেলা	১৮৭২	১৮৮১
বর্দ্ধমান—	১৬০৮২৬	১০৭৬৮৪
২৪ পরগণা—	১২০১০১	১১৪৯১১
নদীয়া—	৬০০২৪	৫৯৮৯৪
যশোহর—	৫১৯৯৯	৩৭৭৫২

ব্রাহ্মণের বংশ, বৎসরে বৎসরে এই অনুপাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। কায়স্থের সংখ্যাও এইরূপভাবে হ্রাস প্রাপ্ত,—বর্দ্ধমান জেলায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কায়স্থের সংখ্যা ছিল ৫৩ হাজার ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে হয় ৩৩ হাজার। কায়স্থের কেন্দ্রক্ষেত্র যশোহর-জেলায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কায়স্থের সংখ্যা ছিল ৯০ হাজার, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে হয় ৬০ হাজার। বৈদ্য এবং নবশাখ শ্রেণীও প্রায় এই অনুপাতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। জানিনা—এইরূপ ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিলে এ জাতির অস্তিত্ব আর কতকাল বিরাজমান থাকিবে? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম— উন্নতির পথে কি ধ্বংসের পথে? "অনুসন্ধান, ১২ই আষাঢ়, ১৩০৮।

মহত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু যাহারা অন্যায় করিয়া তাহা সমর্থন করে, অনুতপ্ত হয় না, এমন লোকদিগকে প্রশ্রয় দিয়া সমাজ কি ভাল করিতেছেন? সমাজের উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মভাব অনেকটা শিথিল, নিম্নশ্রেণী টাকার খাতিরে উচ্চ-শ্রেণীর বশীভূত,—উচ্চশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খলতা অবাধে প্রশ্রয় পাইয়া চলিয়াছে, প্রচারক বল, নেতা বল, সকলে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ! কোন্ পথে সমাজ চলিয়াছে, ভাবিয়া দেখিবারও বুঝি বা কাহারও অবসর নাই। ব্রাহ্ম-সমাজে যদি বিবেকশক্তি জাগরিত থাকিত, তবে পাপীরা ভয়ে সংত্রস্ত হইত—কিন্তু বিবেক শক্তির স্থলে আসুরিক শক্তির প্রাধান্য;—টাকা, টাকা, টাকা—এই রব চতুর্দ্দিকে;—ধনী লোকের শত সহস্র দোষ উপক্ষিত হইতেছে। সুতরাং দরিদ্রদিগেরও সাহস বাড়িয়া যাইতেছে। কে কার দোষের বিরুদ্ধে কথা বলিবে? কি জানি কেন, অনেকেই নিশ্চিন্ত এবং নির্ব্বাক্।

আমরা বুঝিয়াছি, বিবেক শক্তি ব্রাহ্ম-সমাজে না জাগিলে, দেশের সকল আশা সুদূর পরাহত। ক্রমে ক্রমে ঋষিতুল্য ব্যক্তিগণ স্বর্গে গমন করিতেছেন, কেহ বা সংসার হইতে বিদায় লইতেছেন। যাঁহাদের হাতে সমাজের ভার পড়িয়াছে, তাঁহাদের চরণে নিবেদন, একবার ভাবিয়া দেখুন, সমাজের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে। দোহাই ধর্ম্মের, সমাজ রক্ষার জন্য সকল বদ্ধ-পরিকর হউন।

এই দুর্দ্দিনে, চতুর্দ্দিক যখন পাপের ঘনান্ধকারে পূর্ণ, তখন আর কাহাকে ডাকিব, কাহাকে ধরিব? বিবেক, তুই আজ কোথায়? মানবত্ব, তুই আজ কোথায়? দেব বাঞ্ছিত সংহিতা, তুই আজ কোথায়? তোরা একবার এই পতিত দেশের পতিত সমাজের উদ্ধারের পথে সহায় হইয়া না দাঁড়াইলে আর রক্ষা নাই। কাতরে ডাকিতেছি, তোরা একবার জাগিয়া সমাজশক্তি-রূপে দণ্ডায়মান হ। আমি পাপী, দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া পাপপথ পরিহার করিয়া স্বর্গের দিকে অগ্রসর হই। সমাজশক্তি না জাগিলে আত্মরক্ষার বা এই পরাধীন দেশরক্ষার আর যে উপায় নাই; তাই বিনীত প্রার্থনা, তোরা একবার সহায় হ। তোরা, দেবধামের দেবশিশু, মর্ত্ত্যের অমিয়-ধারা, অথবা তোরাইত বিধাতার বিধাতৃত্ব। দোহাই তোদের, একবার, সহায় হ।

আষাঢ়, ১৩০৯।

দাতা বিপিন বিহারী।

জন্ম—ফরিদপুরের অধীন জগদিয়া, ২রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১২৫৮।

মৃত্যু—দারজিলিং, ৪ঠা আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩০৮।

পিতার নাম বামনারায়ণ পাল। বয়স ৫০ বৎসর ৪ চারি মাস ২ দিন।

১২৮৭ সালে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়া একদিন দক্ষিণের দিকে যাইতে-ছিলাম, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের মোড অতীত হইলে দেখিলাম, পূর্ব্ব ফুটপাথে দাঁড়াইয়া একজন লোক আকুল দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতেছেন। আমি চিনিতাম না, সে লোক কে? আমাকে কেন দেখেন, তাহাও বুঝিলাম না। ঐ বৎসরই আর একদিন ১০৮ কলেজ ষ্ট্রীটের বাসার সম্মুখস্থ ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছি, ঐ লোক আমাকে অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দিকে কতকদূর যাইয়া যখন বুঝিলেন, আমি রাস্তার উপরে আছি, তখন তিনি দাঁড়াইলেন এবং উত্তরমুখী হইয়া ক্রমাগত এই অযোগ্য আমাকে তীব্র দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কেন, সে ইতিহাস কে লিখিবে?

এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই সেই লোকের সহিত বিশেষ পরিচয় হইল। তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি অমন করিয়া কি দেখিতে-ছিলেন?" তিনি বলিয়াছিলেন "একটী সামান্য যুবকের দ্বারা সমাজ তোলপাড হইল কিরূপে, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে আপনাকে দেখিতে-ছিলাম। দেখিয়া মজিয়াছি, আমি আপনার হইয়াছি।" এইরূপে আমার বন্ধুরতালিকায় আর একটী লোক জন্মগ্রহণ করিলেন। ইনিই বাবু বিপিন-বিহারী রায়।

আলাপের পরও আমি বুঝি নাই—এক মহাপুরুষের সঙ্গ পাইয়াছি। এ বৎসর, কয়েক দিন পূর্ব্বে, তাঁহার জামাতার কলিকাতায় থাকার বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমাকে বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; বন্দোবস্তের পর হঠাৎ উঠিয়া আমার পদধূলি লওয়ার চেষ্টা করিলেন, আমি ছুটিয়া পলাইলাম এবং তিরস্কার করিলাম। সে দিন ব্যর্থ মনোরথ হইলেন, কিন্তু তারই ৩।৪ দিন পর, কোন বিষয়ের পরামর্শের জন্য আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, আমি অসতর্ক ভাবে তাঁহার ধারে বসিয়াছিলাম। কথাবার্ত্তা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ আমার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। আমি তিরস্কার করিলাম এবং জোর করিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে রাখিলাম।

তখনও বুঝি নাই, ইহা তাঁহার জীবনের শেষ বিদায়ের চিহ্ন ; বুঝি নাই, এই মহাপুরুষ অতি অল্প দিন মধ্যেই স্বর্গে গমন করিবেন। হায়, কি সর্ব্বনাশই হইয়া গিয়াছে! কত দরিদ্রের ঘরে আজ হাহাকার উঠিয়াছে!!

হঠাৎ এবার তাঁহার পূর্ব্বের পীড়া বৃদ্ধি হয়। এই অবস্থায় অনেক নিষেধ সত্ত্বেও পুত্রের বিবাহ দিতে, ২৪ শে শ্রাবণ, মহেশগঞ্জ গেলেন, আসিয়া এক প্রকার জ্ঞানহারা হইলেন। নিষেধ সত্ত্বেও দারজিলিং যাওয়ার জন্ত ব্যাকুল হইলেন। যাওয়ার সময় কাছে ডাকিয়া কত কথা বলিলেন। তখনও বুঝি নাই, শেষ বিদায়ের আয়োজন! হায়, এখন সকলই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, এখন হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতেছি, জাগিয়া-জাগিয়া কি স্বপ্নই দেখিলাম!!

বিপিন বাবুকে বাল্যে প্রায় কেহই চিনিত না। এখনই কি কেহ ঠিক চিনিয়াছে? তাঁহাকে তাঁহার পরিবারের কেহই বুঝিবা সম্যকরূপে চেনে নাই। সমাজের বা দেশের লোকও সম্যক রূপে বুঝে নাই। যখন বুঝিবে, তখন সকলের মাথায় বজ্রপাত হইবে এবং সকলে একবাক্যে বলিবে, হায় কি অমূল্য রত্ন অবহেলায় দারজিলিং-শৈল-গুহায় ৪ঠা আশ্বিন নিক্ষিপ্ত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে!!—এমন মহাপুরুষের শ্মশানেও স্মারক-স্তম্ভের সম্ভাবনা রহিল না!!

লোকে জানে, মাণিকদহের জমীদার বিপিন বাবু। লোকে জানে, তাঁহার মতির স্থিরতা ছিল না। লোকে জানে, তিনি তেমন শিক্ষিত ছিলেন না। লোকে জানে, পরিবার পরিজনের উপর তাঁহার কোন আধিপত্য ছিল না; থাকিলে তাঁহার স্বর্গারোহণের পরই নানা গোলযোগের কথা শুনা যাইত না। এই সকল কথা সত্য কি মিথ্যা, সে বিচার কালে হইবে। বিপিন বাবু মাণিকদহে জন্মেন নাই, মাণিকদহে মরেনও নাই। মাণিকদহ তাঁহার পতন এবং উত্থানের ইতিহাসের লীলাস্থল। সে এক উপাদেয় অশ্রুতপূর্ব্ব কাহিনী।

মাণিকদহের জমীদার ৬মহিমচন্দ্র রায়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সকলে কম্পিত হইত। হঠাৎ এক দিন সন্ধ্যার পর ঘাতকের অস্ত্রে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। মৃত্যুর পর হঠাৎ যে উইল বাহির হইল, তাহাতে পোষ্যপুত্র রাখার কথা ছিল। কে কিরূপে উইল করিল, মহালমস্তার সে কথা আবৃত। উচ্চ আইন আদালতে আজও তাহা অমীমাংসিত। এই উইল বলে বিপিন বিহারী দরিদ্রের ঘর হইতে ৫ বৎসর বয়সে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আসিলেন। আসিলেন, বড় হইলেন, ফরিদপুর জেলা-স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িলেন, পড়ে নানা ঘটনায় অত্যাচারিত হইলেন, বিব-

প্রয়োগে তাঁহার প্রাণনাশের পর্য্যন্ত আয়োজন হইল, কিন্তু কাহারও ইচ্ছায় তবুও তিনি রহিলেন। রহিলেন, পরে বিষয় পাইলেন,দুইবার বিবাহ করিলেন, এবং বলিতে লজ্জা হয়, শেষে পাপে ডুবিলেন। এ দেশের ঐশ্বর্য্যবান লোকের পরিণাম কি? বিলাতের ন্যায় বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ বা পণ্ডিতের অভ্যুদয় নহে; অবসর এবং সুবিধার সদ্ব্যবহার অতি অল্প লোকে এদেশে করিয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যবান লোকের বন্ধুর অভাব কোথায়? দলে দলে বন্ধু জুটিল; —বিপিন বাবু পাপের ঘোরতর নরকে ডুবিলেন। যখন সাধু হইয়াছেন, তখন একদিন তিনি একটী ছোট শিশুকে বলিতেছিলেন—"আমাকে চিনিস্?" শিশু উত্তর করিল, "তোমাকে চিন্‌ব না কেন, তুমি সে বার মদ খাইয়া নেংটা হইয়া নেচে ছিলে, তোমাকে চিন্‌ব না কেন?" এই উত্তর শুনিয়া বিপিন বাবু বলিয়াছিলেন, "ঠিক চিনিয়াছ, খুব শিক্ষা দিয়াছ।" এইত তাঁহার পরিচয়। কত জঘন্য কাজ বিপিন বাবু এক সময় করিয়াছিলেন! মাণিকদহ, বুঝিবা, সেই দৃষ্টান্তে আজও পাপে টলটল করিতেছে। ব্যভিচার যে আবার দোষের, সাধারণত সে দেশের অধিকাংশ লোকই তাহা মনে করে না। উচ্চ শ্রেণীর লোক যখন কুদৃষ্টান্ত দেখায়, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তখন আর কি অন্যের উপদেশ শুনে? বিপিন বাবুও শেষ জীবনে কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাপে নিমগ্ন মাণিকদহকে আর তুলিয়া যাইতে পারেন নাই। শেষ জীবনে তিনি যেন গোবরে পদ্মফুল ফুটিয়াছিলেন। কতবার অক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মাণিকদহ এবং হাকিমপুরের কিছুতেই উদ্ধার হইবে না।" পাপের ভীষণ পরিণাম না ভাবিয়া যখন বিপিন বাবু প্রমত্ত, তখন সাধু "শ্যামাকান্ত" মাণিকদহের পণ্ডিত। গোপনে শ্যামাকান্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। ঘটনাচক্রে এই সময়ে মাণিকদহে ধাত্রী পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে আমরা কোন ব্রাহ্মিকা ধাত্রীকে ঠিক করিয়া দিয়াছিলাম। তিনিও গোপনে সেখানে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। এই সূত্রে বিপিন বাবুর মনের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগিল। তিনি খারাপ লোক বলিয়াই গোপনে উপাসনা হয়, এই চিন্তা মনে উদিত হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই ঘটনাচক্রে তাঁহার কলিকাতায় আগমন এবং আমাদের সহিত সাক্ষাৎ। তৎপরের ঘটনা প্রহেলিকাময়। তিনি অত্যল্প সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নবজীবনের সঞ্চার হইল। সকল প্রকার পৌত্তলিকতা বিসর্জ্জন দিলেন। কুটুম্ব মহলে

দারুণ আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাঁহার ছোট পত্নীর পিতা প্রথমতঃ, ধর্ম্ম-ত্যাগ করিলে প্রজাবিদ্রোহ হইবে, ভয় দেখাইলেন। আমরা বিপিন বাবুকে বলিলাম, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তিন বৎসর বিনা বেতনে খাটিয়া প্রজা-বিদ্রোহ নিবারণ করিয়া দিব। তৎপর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (তিনি হাকিমপুর পরগণার মালিক, বিপিন বাবু পত্তনীদার) কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র সেন, তাঁহার শ্বশুর বাবু কৈলাসনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তি-বর্গ নানারূপ পরামর্শ করিয়া তাঁহা দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে প্রতি-গ্রহণের আয়োজন করিলেন। সব ঠিক হইল, বিপিন বাবুও সম্মতি দিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্য প্রকার, তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এক দিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তার পর তাঁহার সমস্ত সংশয় দূর হইল, আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আজ হইতে আমার সকল সংশয় গেল, নবজীবন লাভ হইল, ধর্ম্মজীবন দৃঢ় হইল।" জগাই মাধাইর উদ্ধারের কাহিনী যদি জগতের ইতিহাসে যত্নপূর্ব্বক লিখিয়া রাখার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে ভক্ত, বিশ্বাসী, সাধু বিপিন বিহারীর নামও তাহার ধারে লিখিয়া রাখার যোগ্য। বিপিন বাবু মদ ছাড়িলেন, তামাক ছাড়িলেন, কুসঙ্গ ছাড়িলেন, ব্যভিচার, বিলাসিতা, অহঙ্কার সমস্ত চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিলেন। সংসারী বিপিনবিহারী দাতারূপ ধারণ করিলেন। এবং নানা সাধু ভক্তের সংসর্গে ধর্ম্মজীবন লাভ করিলেন। জাতিভেদকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিলেন, মুসলমান ভৃত্য ও পাচক রাখিলেন। তারপরের কাহিনী কে না জানে? নানা সৎকার্য্যের সূত্রপাত হইল, প্রতি কাছারীতে স্কুল স্থাপিত হইল ও ডাক্তার প্রেরিত হইল, কত পুকুর ও কূপ খনিত হইল, কত দরিদ্র পরিবারের তিনি ভারগ্রহণ করিলেন। ক্রমে ফরিদপুরে জলের ফিল্টার স্থাপিত হইল। বাজে আদায় ও নজর তুলিয়া দেওয়া হইল, প্রজা-হিত-ভাণ্ডার স্থাপিত হইল, দান-ভাণ্ডার অবারিত দ্বার হইল। তিনি গোপনে চলিতেন, গোপনে বেড়াইতেন, কিন্তু তবুও ক্রমে ক্রমে তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বিপিন বাবুকে ব্রাহ্ম করার মূল কারণ বলিয়া তাঁহার শ্বশুর এক সময়ে আমাদের উপর ভয়ানক বিরক্ত হইয়াছি লেন, কিন্তু সমস্ত কথা অবগত হওয়ার পর শেষে তিনিও আমাদিগকে পূর্ব্ববৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিপিন বাবু অনেক সময়ে বলিতেন— "আমি গরিবের ছেলে, সব টাকা দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিব, কিছুই রাখিয়া

যাইব না।" আমরা তাঁহাকে অর্থ সম্বন্ধে সংযমের পথে লইয়া যাইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে তিনি কিছুই রাখেন নাই। মহাপুরুষের মহাবাক্যই প্রতিপালিত হইয়াছে। বন্ধুরা চটিবে, বা স্ত্রী চটিবেন, বা কর্ম্মচারীরা আপত্তি করিবে, এজন্য হাট বাজারে যাইয়া অনেক সময় হাওলাত করিয়া গোপনে দান করিয়া আসিতেন। তাঁহার সম্পত্তির সর্ব্বপ্রকার আয় ধরিয়া সমষ্টি করিলে ২০ হইতে ৩০ হাজারের অধিক কোন বৎসরই আয় হইত না, কিন্তু ইহার মধ্যে এক চতুর্থাংশ প্রায় দান করিতেন। অনেক সময় নিজের হাতে বজেট করিয়া দানের ফর্দ করিয়া দিয়াছি; যখন টাকায় কুলায় না শুনিতেন, তখন নিজের খরচ কমাইবার কথা বলিতেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা আর কোথাও দেখি নাই।

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করার পর, ধনী-ব্রাহ্মজীবন সুলভ বিলাসিতার দিকে কিছু যে তাঁহার ঝোঁক না পড়িয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু কঠোর ভর্ৎসনায় তাহা সংযত হইয়াছিল। একবার পত্নীদের জন্য অনেক টাকার পোষাক প্রস্তুত হইয়াছিল, ভর্ৎসনার পর লোকসান দিয়াও তাহা ফেরত দিয়াছিলেন। মদ্যপান ছাড়িয়া শেষে চা-পান তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। আরো তাঁহার কোন কোন দোষ যে ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু চাঁদেও কলঙ্ক থাকে, ফুলেও কণ্টক থাকে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? ভাঙ্গা-জনসাধারণ সভা প্রতিষ্ঠার দিন সেখানে যাইয়া দেখি, রূপার চাপরাশ ধারণ করিয়া, তরবারি হস্তে সজ্জিত আরদালিগণ চতুর্দ্দিকে বেড়াইতেছে। তিরস্কার করার পর আর কখনও সেরূপ সজ্জিত আরদালি সঙ্গে নিতেন না। গাড়ীতে বেড়ানের জন্য অনেকবার ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন, নিতান্ত অসমর্থ না হইলে প্রায়ই গাড়ীতে উঠিতেন না। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর উপর আজীবন বিরক্ত ছিলেন, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণের সহিত কোনরূপে পরিচিত হইতে চাহিতেন না। সদা লজ্জায় এমন ম্রিয়মাণ থাকিতেন যে, নূতন লোকের সহিত ভাল করিয়া আলাপ পরিচয় করিতেও পারিতেন না। বেশী লোকের সহিত এই জন্য তাহার বন্ধুত্ব হয় নাই। কলিকাতার রাস্তা দিয়া তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া কেহ কখনও মনে করিতে পারে নাই যে, তিনি একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। নীরবে, বিনা আড়ম্বরে কেবল পরের উপকার করিয়া যাইবেন, ইহাই যেন তাঁহার জীবনের সঙ্কল্প

ছিল। যখন অবসর পাইতেন, তখনই দান করিতেন। সময়, অসময় ছিল না, সব সময়ে বিচার করিয়াও দান করিতে পারিতেন না। এজন্ত লোকের তাঁহার অশেষ নিন্দাও করিত, কিন্তু তিনি সে দিকে কর্ণপাত করিতেন না। অম্লান চিত্তে, অকাতরে, প্রসন্নতায় উৎফুল্ল হইয়া, দান করিতেন।

বিপিন বাবুর জীবনের তিনটী বিশেষত্ব আমরা সর্ব্বসময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—প্রথম, দয়া; দ্বিতীয়, কষ্টসহিষ্ণুতাও দুঃখ বিপদে অবিচলিত ভাব, তৃতীয়—পরিশ্রমশীলতা। যতদিন জ্ঞান ও শক্তি ছিল, জীবনের সে পর্য্যন্ত অকাতরে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ পরিশ্রমী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিয়াছি। মোকর্দ্দমায় হারিয়াছেন, বা পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, বা নদীতে জমীদারী ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, কোন অবস্থায় তাঁহাকে বিচলিত বা ধৈর্য্যচ্যুত হইতে দেখি নাই। অনেক সময় বলিতেন,—"কিছুতেই আমার অধিকার নাই, বিষয়ের যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারাই দরিদ্রের সেবা করিব।"

আজকাল লোকেরা বলিতেছে, তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই, এবং তিনি শেষ জীবনে উইল করিয়া তিনি দরিদ্র রক্ষা করিবার উপায় করিয়া যান নাই,এ কিরূপ ঘটনা? তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মাবধি হাবা, (Idiot) বাকী ৩টী পুত্র, কন্যা, জামাতা ও ভাগিনেয়ের শিক্ষার জন্ম তিনি এত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন যে, সাধারণত লোকেরা তাহা করে না। দুটী পুত্র বালক, মধ্যমপুত্রের শিক্ষার ফল ভাল কি মন্দ হইয়াছে, কিছু পরেই জানা যাইবে।

তিনি বলিতেন—"দয়া জীবিত কালের জন্য। যতদিন আছি, দেখিয়া শুনিয়া দান করিয়া কৃতার্থ হই, পরে কি হইবে কে জানে?"

উইল* করিলে তাঁহার কীর্ত্তি বজায় থাকিত, কথা সত্য; কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব বিলুপ্ত হইত; খোসামুদে লোকেরা জীবিত কর্ত্তাদের যশই ঘোষণা করিত, তাঁহার নাম কেহ লইত না। পুত্রেরা তাঁহার ন্তায় দাতা হইলেও তাঁহার নাম বিলুপ্ত হইবে। তাঁহার বিশেষত্ব সুরক্ষিত হইবে, ইহাই যেন বিধাতার ইচ্ছা, তজ্জন্ত সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও অন্তপ্রকার বিধান হয় নাই। বিদ্যাসাগরের পর নারায়ণচন্দ্র, স্বর্ণময়ীর পর মণীন্দ্রচন্দ্র,

* ব্রাহ্ম হইবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় বার বিবাহ করার সময় দুর্ব্বলতার চিহ্ন স্বরূপ নূতন স্ত্রীর নামে যে উইল করিয়াছিলেন এবং যাহার কথা উল্লেখ করিয়া নিজেও লজ্জিত হইতেন, তাহা অবিবেচক লোকের পরামর্শে কাছারীতে দাখিল করিয়া এখন সকলে হায় হায় করিতেছেন। বিপিন বাবুর নবজীবন লাভের পূর্ব্বের সে উইলকে আমরা কলঙ্কময় বলিয়া মনে করি।

তারক প্রামাণিকের পর তাঁহার বংশধর ঠিক পূর্ব্ব প্রচলিত দয়াব্রতে অনু প্রাণিত হইলে ঐ সকল মহাজনের নাম জগতে থাকিত কি? রামমোহন বা কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মভাব তাঁহাদের বংশধরেরা পাইলে তাঁহাদের বিশেষত্ব জগতে ঘোষিত হইত কি? আলোর ধারে অন্ধকার না থাকিলে আলোর মর্য্যাদা লোকে বুঝিত না। অসুর গৃহে প্রহলাদের জন্ম না হইলে ভক্ত প্রহলাদের এত আদর হইত না। চিরকাল চিরদিন দেখা গিয়াছে—যিনি যে ব্রত পালনের জন্ত ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের তিরোধানের পর সেই ব্রত পালনের জন্ত অন্য লোকের আর অভ্যুদয় হয় নাই। বিপিন বিহারীর কীর্ত্তিরাশি বিলুপ্ত হইলেই তাঁহার অক্ষয় যশঃরাশি বুঝিবা এই জগতে আরো উজ্জল হইবে। লোকেরা চিরকাল বলিবে—"সেই যুগে, সেই দিনে এমন ছিল, এখন সব গিয়াছে।" এই জন্তই বুঝিবা বিধাতার এইরূপ বিধান হইয়াছে।

মাণিকদহের জমিদারীর পরিণাম কি, কেহ জানে না; কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত, বিধাতা দরিদ্রের সেবার জন্ত দরিদ্রসন্তানকে ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের ভার দিয়া মাণিকদহে কয়েক বৎসর যে লীলা খেলিলেন, তাহা চিরকাল স্মরণের বিষয়। বিপিন বাবুর অতি ভালবাসার মাণিকদহ ব্রাহ্মসমাজের পরিণাম কি, কেহই জানে না, কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে মাণিকদহে যে লীলা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অবিনশ্বর। আমরা যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহাতে পাপীর উদ্ধারের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে, একথা নিশ্চয়ই বলিব। ব্রহ্মকৃপা এবং ব্রাহ্মসমাজের জয়।

আমরা তাঁহার হতভাগ্য বন্ধুবর্গ, তাঁহার শ্মশানের অগ্নি নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সকল কীর্ত্তি বিলোপের আয়োজন করিতেছি, ঝগড়া বিবাদের ইন্ধন জ্বালিয়া অতি শীঘ্রই তাঁহার শ্রাদ্ধের সুবন্দোবস্ত করিতেছি! নরকধামে যাহা হইবার তাহা হউক, দুঃখ নাই; দাতা বিপিন বিহারী বিশ্বাস ও ভক্তি বলে নিত্য দেববেশে আমাদের মধ্যে বিহার করুন, ইহাই বিধাতার নিকট প্রার্থনা। প্রার্থনা এই, তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিরাশি মানব প্রাণে এখন আশার সঞ্চার করুক, যাহাতে দেশকালের অতীত অবিনশ্বর নিত্যধামের দিকে মানব মনের স্থিতি এবং গতি হয়। বিধাতা যে স্বপ্ন দেখাইলেন, প্রার্থনা এই, নিত্য ঘরে ঘরে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাহা বিরাজিত থাকুক।*

কার্ত্তিক, ১৩০৮।

সম্পূর্ণ।

* এই প্রবন্ধটী তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পঠিত হইয়াছিল।